অব্যর্থ

ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চিকিৎসা

ডাঃ মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এ, বি, পাবলিকেশন
পাবলিশার্স এ্যান্ড বুকসেলার্স।
রবীন্দ্রপল্লী, প্রফুল্লকানন, কলিকাতা - ৭০০ ০৫৯

—ঃ প্রকাশক ঃ—

এ, বি, পাবলিকেশন

রবীন্দ্রপল্লী, প্রফুল্লকানন,

কলিকাতা—৭০০০৫৯

—ঃ ডিস্ট্রিবিউটর ঃ—

দি পাল মেডিকেল

২৩৬/এইচ/১৪ মানিকতলা মেইন রোড,

কলিকাতা ৭০০০৫৪

দূরাভাষ ৩৫২-১৬৯৬

তৃতীয় সংস্করণ—২০০৪ইং

দাম ঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র।

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

- রায় বুক স্টল
  কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
- মেডিক্যাল বুক স্টোর
  কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
- প্রিন্স বুক স্টল
  কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
- শ্রীপুস্তকালয়
  হাবরা, ২৪ পরগণা (উঃ)
- রায় বুক প্রেস
  কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
- প্যারাডাইস বুক স্টল
  কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
- কেন্ট হোমিও ল্যাবরেটরী
  রানাঘাট, নদীয়া
- এষ্ট্রোহোমিও সেবাশ্রম
  ১২, প্যামড়ানান্দুর রোড,
  জ্যোৎরাম বর্দ্ধমান।
- নভেল পাবলিশিং
  বাংলা বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ
- আলিগড় লাইব্রেরী
  বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ
- সেপ এন্টারপ্রাইজ
  বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ

মুদ্রক ঃ
সাপ্লেস অফসেট
৩১, মুরারীপুকুর রোড
কলিকাতা - ৭০০ ০৬৭

উৎসর্গ

আমার পরম আরাধ্যা স্নেহময়ী মা স্বর্গীয়া নীহার কনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে আমি গভীর শোকাহত ও মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি কৃপাময়ী জননীর পাদপদ্মে নিবেদিত হল। জগৎজননীর কাছে আমার ময়ের প্রয়াত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

৬০, ছোটনীলপুর, বর্দ্ধমান

প্রণতঃ

মানিক

ব্লাড প্রেসার

ডায়াবেটিস

প্রাথমিক বক্তব্য

হাইব্লাড প্রেসার এবং ব্লাড সুগার বর্তমান ভারতের একটা বিশাল সমস্যা। মোট মৃত্যু সংখ্যার একটা বৃহৎ অংশই এই রোগের শিকার। এই রোগ দুইটি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রথমেই মানুষের (Constitution) বা সংবিধান সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া দরকার, কারণ বিভিন্ন প্রকারের সংবিধানের মানুষের মানসিকতা, কামনা, বাসনা অনুভূতি, রোগ প্রবণতা ইত্যাদিও বিভিন্ন প্রকারের হয়। তাই যদি আগে থাকতেই কারও সংগঠনের (Constitution) ধরণ (Type) কি প্রকার তা জানা যায় তবে উক্ত ব্যক্তির রোগ প্রবণতা, মানসিকতা, ইত্যাদি সম্পর্কেও বহু তথ্যাদি পূর্ব হতেই অবগত হওয়া সম্ভব এই উদ্দেশ্যেই গ্রন্থারম্ভে প্রথম অধ্যায়ে মানুষের ধাতু বা সংগঠন (Constitution) নিয়ে আলোচনা করেছি। এর দ্বারা ব্লাড় প্রেসার ও ব্লাড়সুগার রোগীগণ পূর্ব হতেই অদূরভবিষ্যতে আগত ব্যাধিটি সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন এবং যথাযথ সময়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারলে ঐ ব্যাধিটিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে সমর্থ হবেন।

বিশ্বে যে কোটি কোটি মানুষ রয়েছে তার মধ্যে এমন একটি মানুষকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে সবদিক থেকে অপর একটি মানুষের সমান। সমষ্টিগত ভাবে তাদের মধ্যে যতই মিল থাকুক না কেন ব্যষ্টিগত বিচারে তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রতা ও প্রভেদ থাকবেই। প্রকৃত চিকিৎসকের প্রধানতম উদ্দেশ্যই হল সেই ব্যক্তিগত প্রভেদ বা বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করা যা ঐ মানুষটিকে সমষ্টিগত মানুষ থেকে পৃথক করেছে। গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে সমষ্টিগত স্বাভাবিক ও সুস্থ মানুষ থেকে প্রতি ব্যক্তিগত মানুষকে এই বিশেষ বৈশিষ্টসমূহ বিচ্যুত করে রেখেছে। সুতরাং এই বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির বিজ্ঞানসম্মত সমাধান করতে পারলেই ব্যষ্টিগত প্রতিটি মানুষ সমষ্টিগত মানুষের স্বাভাবিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিরোগ ও সুস্থ শরীরের অধিকারী হতে পারবে।

আবার প্রতিটি ব্যষ্টিগত মানুষের মধ্যে তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকায় তাদের যথাযথ চিকিৎসা ও সুষ্ঠু পরিচালনার নির্দেশাবলীও ঐ বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্টের উপর ভিত্তি করে এক একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এক একরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাদের খাদ্য, পানীয় পথ্য ও ওষুধ নির্বাচন ইত্যাদি সমস্ত ব্যবস্থাই ঐ বিশেষ বৈশিষ্টকে কেন্দ্র করে রচিত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ব্যবস্থাও হবে ভিন্ন ভিন্ন। চিকিৎসা ও নিয়ম পালনাদির ক্ষেত্রে বৈশিষ্টের বিভিন্নতা থাকা সত্বেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির একই প্রকার ব্যবস্থা অবৈজ্ঞানিক ও অজ্ঞতাপ্রসূত।

রোগীর হৃত স্বাস্থ্যের পুনঃস্থাপন ও নির্দোষরূপে রোগ আরোগ্য করাই চিকিৎসকের মহান ও একমাত্র ব্রত হওয়া উচিৎ। এই মহান ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক চিকিৎসকের একবার ভেবে দেখা উচিৎ যে তিনি যে পদ্ধতিতে রোগীর চিকিৎসা করবেন উক্ত পদ্ধতি দ্বারা তার এই মহান উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা! চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের বিশেষ কোন পদ্ধতির উপর মোহ বা অন্ধ অনুরাগ থাকা উচিৎ নয়।

সুচিকিৎসকের প্রধানতম কর্তব্যই হল সংস্কারশূন্য মানসিকতার অধিকারী হওয়া। আদর্শবান চিকিৎসকের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পদ্ধতির উপর অন্ধঅনুরাগ অহিতকর। যেখানে চিকিৎসকের উপর নির্ভর করছে হাজার হাজার আর্তপীড়িত মানুষের অমূল্য জীবন ও ভবিষ্যৎ, সেখানে চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনরূপ কর্তব্যে অবহেলা বা অসতর্কতা শুধু পাপই নয় একটি ঘৃন্যতম অপরাধও বটে। তাই প্রত্যেক চিকিৎসকেরই উচিৎ বিচার বিবেচনা করে সর্বাধিক বিজ্ঞান সম্মত প্রকৃতি নির্দিষ্ট নির্দোষ ও সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি বাছাই করে উক্ত পদ্ধতিতে রোগীর চিকিৎসা কার্যে আত্মনিয়োগ করা। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে চিকিৎসকের প্রধান উদ্দেশ্য কেবলমাত্র রোগীর শরীরকে ব্যাধিমুক্ত করাই নয়, রোগীকে মানসিক শারীরিক আত্মীক ইত্যাদি সার্বিক স্তরের সর্বপ্রকার বিকৃত অবস্থা থেকে নির্দোষরূপে মুক্ত করে তাদের হৃত স্বাস্থ্য পুরুদ্ধার করা চিকিৎসকের প্রধানতম এবং একমাত্র কর্তব্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিৎ। সুতরাং সমস্ত চিকিৎসা পদ্ধতিতে এই উদ্দেশ্য সফল হয় সংস্কার শূন্যমন নিয়ে মানুষকে সেই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করার জন্য আদর্শবান চিকিৎসককে এগিয়ে আসতে হবে। জীবের জড় দেহটিই যে একমাত্র চরম এবং শেষ কথা নয়, শারীরিক কষ্টকর উপসর্গগুলি যে জড়দেহের অন্তরালে অবস্থিত সূক্ষশক্তির বিশৃঙ্খলতার স্থূলশরীরে বহিঃপ্রকাশ মাত্র,রোগ শক্তি দ্বারা প্রথমে এই শক্তিই আক্রান্ত হয়, জীবের যখন রোগ মুক্তি ঘটে তখন চিকিৎসা দ্বারা প্রথমে এই শক্তিই আরোগ্যলাভ করে, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে রোগ আরোগ্য করতে হলে কেবলমাত্র শরীরেরই নয় শরীরস্থ এই শক্তিরই সাম্যতা চিকিৎসা দ্বারা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। প্রকৃতির রোগ আরোগ্যের এই সমস্ত সূক্ষাতি সূক্ষ তত্বসমূহ বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে একমাত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিতেই অবগত ও পালনীয়।

জীবের অন্তরস্থ সক্রিয়শক্তি সূক্ষশক্তি স্থূল ভেষজের মধ্যেও অনুরূপ সূক্ষশক্তি সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান। দুই বিপরীতধর্মী বস্তুর পারস্পরিক সংঘর্ষ বা মন্থনের সাহায্যে বস্তুর অনুপরমানুকে ক্রমশঃ বিভক্তি করনের দ্বারা ভেষজের অন্তর্নিহিত এই সুপ্ত সূক্ষ শক্তিকে সক্রিয় করা সম্ভব। সূক্ষ শক্তিকে একমাত্র সূক্ষ শক্তি দ্বারাই প্রভাবিত হতে পারে না। একমাত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে বস্তুর সূক্ষশক্তিকে সক্রিয় করে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে প্রকৃতপক্ষে জড়পদার্থের অন্তর্নিহিত এই সূক্ষ সক্রিয় শক্তিই জড় দেহের

অন্তর্গত সূক্ষ্ম সক্রিয় শক্তির ত্রুটি বিচ্যুতি প্রতিবিধান করে হৃতস্বাস্থ্যের—সার্ব্বিকভাবে পুনরুদ্ধারে সক্ষম। অপর কোন চিকিৎসা পদ্ধতিতে এই সক্রিয় শক্তি সম্পর্কে অবহিতও নয়, পালনীয়ও নয়। তারা কেবল স্থূল ভেষজ দ্বারা স্থূল শরীরের বিকৃতি মেরামতেই ব্যস্ত। ফলে গাছের পাতায় জলঢালার মত সাময়িকভাবে স্থূল শরীরের বিকৃতির উপশম হলেও রোগের মূল কারণ কিন্তু অচিকিৎসিত রয়েই যায়, পরবর্তীকালে এর ফল হয় আরও ভয়ানক। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে রোগ আরোগ্য ও ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির নির্দেশাবলী সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও যুক্তি সংগত।

বর্তমান বিশ্বে যে সমস্ত চিকিৎসা পদ্ধতি চালু রয়েছে বা আজ পর্যন্ত আবিস্কৃত চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে সর্বাধুনিক সর্বাধিক বিজ্ঞানসম্মত এবং সর্বশেষ আবিস্কৃত পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা পদ্ধতি হল হোমিওপ্যাথি। বিজ্ঞানও প্রযুক্তির চরম বিকাশ ঘটেছে এই পদ্ধতিতে। তাই হাইপ্রেসার ও সুগার এই দুটি ধাতুদোষঘ্ন (Constitutional) রোগের মত ধ্বংসাত্মক ব্যাধির চিকিৎসা ক্ষেত্রে অন্তত চিকিৎসা বিজ্ঞানীকে হোমিওপ্যাথিক চিন্তাধারা মাথায় রেখে অগ্রসর হতে হবে নচেৎ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা কার্য্য চলতে থাকলে রোগীর তো বটেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও বিশাল অনিষ্ট সাধন করা হবে।

ছোট নীলপুর, বর্দ্ধমান — ডাঃ মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম খণ্ড

ব্লাড প্রেসার

প্রথম অধ্যায়

রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া (Blood Circulation)

ব্লাড প্রেসার হল রক্তের চাপ। রক্তের এই চাপের ফলেই রক্ত সারা শরীরে সর্বদা প্রবাহিত হচ্ছে, অন্যথায় রক্ত স্থির থাকত। ব্যষ্টিগত ভাবে প্রত্যেকেরই রক্তের এই চাপের নিজস্ব একটা স্বাভাবিক সীমা আছে। এই সীমা অতিক্রম করলে তাকে High Pressure বা উচ্চরক্তচাপ এবং যদি স্বাভাবিক সীমার থেকে রক্তের চাপ কম থাকে তবে তাকে লোপ্রেসার বা নিম্নচাপ বলে। হাই প্রেসারে কি ক্ষতি হয় বা লো প্রেসারে কি ক্ষতি হয় ইত্যাদি ব্লাড প্রেসার জনিত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে (Blood Circulatory System) রক্ত সঞ্চালন তন্ত্র ক্রিয়ার মাধ্যম স্বরূপ অঙ্গসংস্থান (Anatomy) এবং শারীরবৃত্তিয় কার্যাবলী (Physiology) সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার বলে এখানে এই সম্পর্কে একটু আলোচনা করব। কিছুদিন আগে সারা ভারতব্যাপী একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার ২৫% শতকরা পঁচিশ ভাগ মানুষই এখন উচ্চরক্তচাপ রোগে আক্রান্ত। আরও জানা গেছে যে এই হারের দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে। জগৎবিখ্যাত মনিষীবৃন্দ যথা স্বামী বিবেকানন্দ, বৈজ্ঞানিক এড্ওয়ার্ড জেনার, লুইস পাস্তুর, বিখ্যাত নেতা উড্রো উইলসন, ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট, যোসেফ স্ট্যালিন, পণ্ডিৎ জওহরলাল নেহেরু ইত্যাদি বহুসংখ্যক উচ্চশ্রেণীর মানুষকেই এই রোগের শিকার হয়ে অকালে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছে। কিন্তু পূর্ব্ব থেকে এই রোগ সম্পর্কে সচেতন থাকলে এবং যথাসময়ে উপযুক্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাদের আর অকালে প্রাণত্যাগ করতে হত না। উচ্চশ্রেণীর মহামানবগণের অকালমৃত্যুতে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয় তা আর কস্মিনকালেও পূরণ হয় না। তাই দেশ তথা জাতিকে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে হলে, এই রোগটি সম্পর্কে পূর্ব হতেই জনসাধারণকে সচেতন করা এবং উপযুক্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান বিতরন করা প্রত্যেক সুচিকিৎসক এবং উচ্চশিক্ষিত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের একটি নৈতিক দায়িত্ব বলে বিবেচিত হওয়া উচিৎ।

রক্ত সঞ্চালন তন্ত্রের অঙ্গসংস্থান ও শারীরবৃত্তিয় কার্য্য (Anatomy and Physiology of Blood Circulatory System)

রক্ত সঞ্চালন তন্ত্র (Blood Circulatory System) যে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে গঠিত তা হল —

১) রক্ত পাম্পিং যন্ত্র হৃৎপিণ্ড (Heart)

২) রক্ত চলাচলের মাধ্যম স্বরূপ—

ক) ধমনী (Artery)

খ) শিরা (Veins)

গ) কৈশিক নালী (Capilaris)

৩) প্রবহমান রক্ত (Blood)

৪) লসিকা প্রণালী (Lymphatic System) (এরা টিসুরস সংগ্রহ করে রক্তে ঢেলে দেয়)

হৃৎপিণ্ড অহরহ রক্ত পাম্প করে চলেছে। সেই রক্ত বিভিন্ন ছোট বড় ধমনী ও কৈশিক নালীর মধ্য দিয়ে শরীরের সকল টিসুকে খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করতে করতে এগোচ্ছে। কৈশিক জালে পৌঁছে রক্ত কার্বনডাই অক্সাইড় তৈরী করে ছোট মাঝারী বড় শিরার মধ্য দিয়ে বয়ে নিয়ে হৃৎপিণ্ডে ফেরৎ পাঠায়। সেখান থেকে রক্ত ফুসফুসে পরিশুদ্ধ হয়ে পুনরায় হার্টে ফিরে আসে। এই ক্রিয়া মিনিটে ৭০ থেকে ৭২ বার হয়।

হৃৎপিণ্ডই হল রক্তের ভাণ্ডার। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ধমনী শিরা ও লসিকা এদের নিয়েই রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া চলছে। হৃৎপিণ্ড থেকে শোধিত রক্ত আর্টারী বা ধমনী দিয়ে শরীরের সর্বস্থানে পরিচালিত হচ্ছে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানের দূষিত রক্ত শিরা (Vein) দ্বারা প্রবাহিত হয়ে আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসছে। এখান থেকে দূষিত রক্ত ফুসফুসে গিয়ে শোধিত হয়। সেই বিশুদ্ধ রক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডে এসে আবার ধমনী দ্বারা দেহের সর্বত্র চালিত হয়। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ায় ফুসফুস দূষিত রক্ত শোধন করে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে বায়ুর মাধ্যমে ফুসফুস অক্সিজেন গ্যাস সংগ্রহ করে। সেই অক্সিজেন দ্বারাই দূষিত রক্ত পরিস্কৃত হয়। সুতরাং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ায় ফুসফুস দূষিত রক্ত শোধন করে আর হৃৎপিণ্ড সারা শরীরে সেই শোধিত রক্ত রসদরূপে যোগান দেয়।

হৃৎপিণ্ড (Heart)

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া (Functions of Heart) ঃ—

শরীরের প্রতিটি কোষাণু, প্রত্যেক তন্তু এবং সমস্ত যন্ত্রে খাদ্য পানীয় এবং অক্সিজেন অবিরত যোগান দেওয়া ও ক্ষয়প্রাপ্ত আবর্জনা শরীর থেকে বের করে দেওয়া—শরীর রক্ষার্থে এই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সর্বক্ষণের জন্য পালন করে চলেছে হৃৎপিণ্ড। দিবারাত্রি, বিপদে আপদে রোগে শোকে আজীবন এই পাম্পিং যন্ত্রটি একই ছন্দে একই তালে সমানে কাজ করে চলেছে। একবার কুঞ্চন পরক্ষণেই প্রসারণ, আবার কুঞ্চন ও প্রসারণ—এই ক্রিয়া অহরহই চলছে। এই কারণেই হৃৎযন্ত্রের গঠনভঙ্গিও অনুপম ও বিচিত্র।

হৃৎযন্ত্রের অবস্থান (Anatomical Position of Heart)

বুকের বাম দিক ঘেষে পুরু পেরিকার্ডিয়াম থলীর মধ্যে মাংসল হৃৎপিণ্ডটি, স্টার্নামের পেছনের মিডিয়া স্টাইনামে (ইসোফেগাস) এবং বড় এওর্টা ধমনীর বুকের (থোরাসিক) ভাগ আছে। হার্টের নীচের সূঁচালো অংশকে এপেক্স বলে। বাম বুকের ষষ্ঠ পাঁজরের হাড়ের পাড় বরাবর এবং ডায়াফ্রামের উপরে ওর মধ্য টেণ্ডনের সাথে যুক্ত হয়ে অবস্থিত। হার্টের উপর অংশকে বেস বলে। এটি স্টার্নাম বক্ষাস্থির বাঁদিকে তৃতীয় পঞ্জরাস্থির নীচের পাড় বরাবর অবস্থিত।

বাইরে থেকে হার্টের অবস্থান নির্ণয়

বুকের উপরে হৃৎপিণ্ডের অবস্থান নির্ণয় করতে হলে কয়েকটি কাল্পনিক রেখা টানতে হবে। এই রেখাগুলোর সাহায্যে সহজেই বাইরে থেকে হার্টের অবস্থান অনুমান করা যেতে পারে। বাম কণ্ঠাস্থির মধ্যবিন্দু থেকে নীচে বাম স্তন পর্যন্ত একটি রেখা টানতে হবে। সুস্থ ও সবল হার্ট সর্বদা ঐ রেখার ভেতরদিকে থাকবে। এই লাইনটি হৃৎপিণ্ডের অবস্থানের বাম সীমারেখা। এবার ডান বক্ষের তৃতীয় পঞ্জরাস্থি যেখানে স্টার্নামে সংযুক্ত হয়েছে তার কোয়ার্টার ইঞ্চি ডানদিকে একটি বিন্দু অঙ্কন করতে হবে। আর ঐ দক্ষিণ বুকের নীচে ষষ্ঠ পঞ্জরাস্থির এক ইঞ্চি দূরে একটি বিন্দু একে একটি রেখা টানতে হবে। এখন যে লাইনটি পাওয়া গেল সেটি হার্টের দক্ষিণ দিকের অবস্থান সীমারেখা। এখন দুইদিকের দুইটি লাইনের প্রান্তবিন্দু যোগ করলে হার্টের বেস ও এপেক্সের অবস্থান সীমাও কতকটা অনুমান করা যাবে।

হৃৎযন্ত্রের শারীরবৃত্তিয় কার্য্য (Physiological function of Heart)

হার্টের চারটি কক্ষ রয়েছে, বামদিকে দুটি ও ডানদিকে দুটি। বামদিকের কামরা দুটির সঙ্গে ডানদিকের কামরাদ্বয়ের যোগাযোগ নাই। দুটি এট্রিয়াম (অলিন্দ) ও দুইটি ভেন্ট্রিকেল (নিলয়) এই চারটি কামরা নিয়ে হৃৎপিণ্ডটি গঠিত। দক্ষিণ এট্রিয়াম থেকে দক্ষিণ ভেন্ট্রিকেলে যাবার দরজাকে ট্রাইকাস্পিড্ ভালভ্ বলে, কারণ ওতে তিনটি কপাট আছে। বাঁদিকের এট্রিয়াম থেকে বাম ভেন্ট্রিকেলে যাবার দরজাকে মাইট্রাল ভালভ্ বলে; এর দুটি ভালভ্ বা কপাট। দুইটি এট্রিয়ামই পাতলা, ভেন্ট্রিকেল অপেক্ষা আকারে ছোট, নীচের দিকটা কিছুটা স্থূল ও মাংসল (এদের বাইরের দেয়ালে কানের মত একটা করে ছোট থলি (পাউচ) আছে তাকে অরিকল বলে। জন্মাবার আগে পর্যন্ত দুই এট্রিয়ামে যোগাযোগ থাকে, কিন্তু জন্মের পরে তা বন্ধ হয়ে যায়, একটা গর্তের চিহ্ন শুধু বর্তমান থাকে তাকে বলে ফসা ওভালিস।

ভেন্ট্রিকেল বা নিলয় দুটিই খুব পুরু মাংসপেশীর দ্বারা গঠিত। বাম ভেন্ট্রিকেল ডানদিকের চেয়েও আরও অধিক শক্তিশালী ও পোক্ত, কারণ ওখান থেকে বিরাট এওর্টা ধমনী বেরিয়েছে, যার ভেতর দিয়ে হার্টকে পাম্প করে সারা দেহে রক্ত পাঠাতে হয়। দক্ষিণ ভেন্ট্রিকেল থেকে পাল্মনারি ধমনী বের হয়ে দুই ফুসফুসে গেছে। এই দুই ধমনীর মুখে যে কপাট আছে, তাতে তিনটি করে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাট আছে তাদের বলা হয় সেমিলুনার ভালভ্।
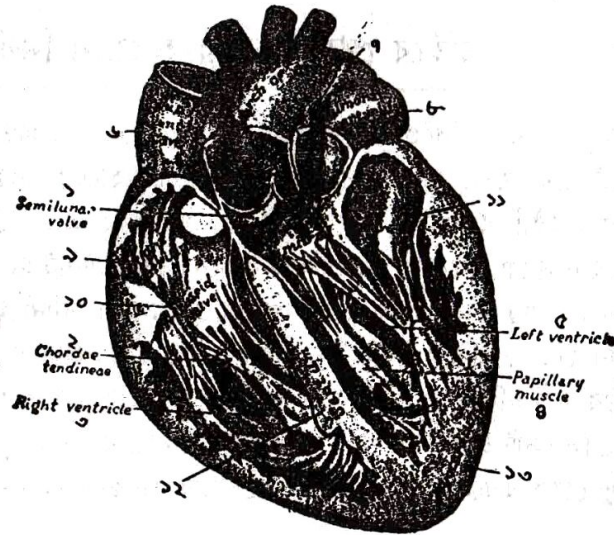
চিত্র-১৭২। হার্টের অভ্যন্তর, সম্মুখ দৃশ্য।
১। সেমিলুনার ভাল্ভ, ২। কর্ডি টেন্ডিনি, ৩। দক্ষিণ ভেন্ট্রিকেল, ৪। প্যাপিলারি মাস্ল, ৫। বাম ভেন্ট্রিকেল, ৬। সুপিরিয়র ভেনাকাভা, ৭। এওর্টার আর্চ, ৮। পাল্মনারি ধমনী, ৯। দক্ষিণ এট্রিয়াম, ১০। ট্রাইকাস্পিড ভাল্ভ, ১১। মাইট্রাল ভাল্ভ ১২। সেপ্টাম, ১৩। মায়োকার্ডিয়াম।

অলিন্দ অপেক্ষা নিলয়ের কামরা বড়। অলিন্দে প্রায় দুই আউন্স এবং নিলয়ে চার থেকে ছয় আউন্স পরিমান রক্ত ধরে। ডান অলিন্দ থেকে একটি বড় শিরা বেরিয়েছে এর নাম মহাশিরা বা ভেনা কেভা (Vena Cava)। ওপরের দিকে যে অংশ গেছে তাকে সুপিরিয়র ভেনাকেভা এবং নীচের দিকের অংশকে ইনফিরিয়র ভেনাকেভা বলে। শরীরের যাবতীয় দূষিত রক্ত এই ভেনাকেভা দিয়ে হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে এসে পড়ে। শরীরের উর্দ্ধদিকের দূষিত রক্ত সুপিরিয়র ভেনাকেভা দ্বারা এবং নিম্নদিকের রক্ত ইনফিরিয়র ভেনাকেভা দ্বারা ডান অলিন্দে এসে পড়েছে। ডান অলিন্দ থেকে দূষিত রক্ত আবার ডান নিলয়ে যাচ্ছে। এইজন্য অলিন্দ এবং নিলয়ের মধ্যে একটা দরজা আছে। এই দরজার নাম দক্ষিণ অরিকুলো ভেন্ট্রিকুলার দ্বার। এই দ্বারটি ট্রাইকাসপিত ভালভ্ নামক পর্দা বা কপাট ত্রয় দ্বারা রক্ষিত হচ্ছে। নিলয় যখন রক্তপূর্ণ হয় তখন ঐ কপাট বন্ধ হয়ে যায় যাতে রক্ত আবার অলিন্দে ফিরে যেতে না পারে। ডান নিলয় থেকে অপরিশুদ্ধ রক্ত পালমোনারী আর্টারী বা ফুসফুসীয় ধমনী দ্বারা দুইটি ফুসফুসে গিয়ে শোধিত হয়। ঐ রক্ত ফুসফুসে অক্সিজেন দ্বারা শোধিত হলে দুইটি ফুসফুস থেকে উদ্ভূত পালমোনারী ভেন সেই রক্ত বহন করে হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে ঢেলে দেয়। অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যে যে কপাট দ্বার রয়েছে ঐ দরজা দিয়ে বাম অলিন্দ থেকে শোধিত রক্ত বাম নিলয়ে পৌঁছলে কপাট বন্ধ হয়ে যায় এবং বাম নিলয় থেকে শোধিত রক্ত বৃহৎ ধমনী বা এওর্টা নামক বড় ধমনী দিয়ে শরীরের সর্বত্র তা পরিচালিত হয়। বাদিকের অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যস্থ দ্বারকে বাম অরিকুলো ভেন্ট্রিকুলার দ্বার বলে—মাইট্রাল ভালভ্ নামক পর্দা বা কপাটদ্বয় দ্বারা এটি রক্ষিত হয়। যখন ডানদিকের নিলয়ের সঙ্কোচন ঘটে তখন ঐ একই সময়ে সঙ্গে সঙ্গে পালমোনারী আর্টারীর কপাটত্রয় খুলে যায় এবং এদের মধ্য দিয়েই ফুসফুসে রক্ত প্রবেশ করে, আর ঠিক এই সময়ে বাম নিলয়ও সঙ্কুচিত হয়। মাইট্রাল ভালভ্ তাদের নিজ দ্বার বন্ধ করে দেওয়াতে এবং এওর্টার ভালভ্ খুলে যাওয়ায় এওর্টার মধ্যে শোধিত রক্ত প্রবেশ করে দেহের বিভিন্ন অংশে চলে যায়। এরপর আবার নিলয় দুইটি প্রসারিত হতে আরম্ভ করলে এওর্টা ও পালমোনারী আর্টারী উভয়েই তাদের নিজ নিজ দ্বার বন্ধ করে দেয় এবং মাইট্রাল ট্রাইকাসপিড় দ্বার এই একই সময়ে খুলে যায় ও দুইদিকের নিলয় একই সময়ে প্রসারিত এবং একই সময়ে সঙ্কুচিত হয়। এই সঙ্গে দুইদিকের নিলয়ের দ্বারও অর্থাৎ ট্রাইকাসপিড ও মাইট্রাল ভালভের দ্বার একই সময়ে বন্ধ হয় এবং পালমোনারী আর্টারী ও এওর্টার দ্বার খুলে যায়। একই সময়ে এই দ্বার দুটি বন্ধ হলে পুনরায় অলিন্দ-নিলয় দ্বার খুলে নিলয় দুটি প্রসারিত হতে থাকে। কোন এক অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে এই কার্য সুচারুরূপে ও সুশৃঙ্খলভাবে অহর্নিশি চলছে। যখন এই সুশৃঙ্খলতার ব্যাঘাত ঘটে তখন অনুমান করতে হবে যে হৃৎপিণ্ডের কোন ক্রিয়া ব্যাঘাত উপস্থিত হয়েছে।

হৃৎপিণ্ডের অন্তর্নিহিত শক্তি (Internal power of Heart)

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে দেখা গেছে যে একটি জীবন্ত পশুদেহ থেকে হার্ট কেটে নিয়ে যদি ৯৮° তাপের লবন জলে ডুবিয়ে অক্সিজেন গ্যাস সরবরাহ করে রাখা হয় তবে কয়েক ঘন্টা তার কুঞ্চন প্রসারণ ক্রিয়া অব্যাহত থাকে। রাশিয়ার এক দেহ তত্ত্ববিদ হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া একটি মানুষের হার্টকে ঐভাবে রক্ত ও টিসুরস সরবরাহ করে কয়েকমাস পর্যন্ত ক্রিয়াশীল রেখেছিলেন। এর থেকে জানা গেছে যে হার্টের চলার বেগ ও প্রেরণা ঐ যন্ত্রের মধ্যেও নিহিত রয়েছে। এর জন্যই বর্তমানে সদ্য মৃত কোন ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড নিয়ে অন্য ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের পরিবর্তে স্থাপন করা সাফল্যের সঙ্গে সম্ভব হচ্ছে।

হৃৎপিণ্ডের শব্দ (Heart Sound)

হার্টের দুই অংশের মধ্য ব্যবধানকে সেপ্টাম বলে। ঐ স্থানে মাংসের একগোছা ফাইবার রয়েছে, যা দেখতে মাংস হলেও নার্ভটিসুর কাজ করে, অর্থাৎ এদের ভেতর দিয়েই হার্টের প্রেরণা চলাচল করে।

দক্ষিণ এট্রিয়ামের কক্ষে যেখানে সুপিরিয়র ভেনাকেভার মুখ, তার নীচে সাইনো এট্রিয়াল নোড (কড়া মত) রয়েছে **S. A. Node**. এইটি করোনারী সাইনাসের স্থান, যা থেকে বাণ্ডল অফ্‌হিস বেরিয়েছে। এই বাণ্ডল (গোছা) কতক এট্রিয়াম কক্ষের, আর বাকি ভেন্ট্রিকেল কক্ষের সেপ্টামে প্রবেশ করে দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে এবং সেখান থেকে ওরা সারা হৃৎপিণ্ডে জালের মত সূক্ষ্ম নার্ভগুচ্ছ পার্কিঞ্জি ফাইবার্স হয়ে ছড়িয়ে গেছে।

S. A. Node অর্থাৎ সাইনো এট্রিয়াম নোড থেকে হৃৎস্পন্দন শুরু হয় ঃ—হৃৎ ব্যাটারীর প্রথম স্পার্ক (প্রেরণা) এইখানে জন্মে। এই নোডের আদেশে স্পন্দন সহজ, মন্দ বা দ্রুত হয়। এই নোড় যদি উবড়ে ফেলা হয়, তবে কিছুক্ষণের জন্য স্পন্দন থেমে গিয়ে আবার চলে, তখন এট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোড স্পন্দন ক্রিয়া চালাতে থাকে। প্রতি হৃৎস্পন্দন আরম্ভ হওয়ার আগে এই সাইনো এট্রিয়াম নোড কুঁচকায়, সঙ্গে সঙ্গে ঐ কুঞ্চনক্রিয়া দুই ভেনাকেভার মুখ ও এট্রিয়াম কক্ষের পেশীসমূহে ছড়িয়ে এট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোডে পৌঁছায়। সেখান থেকে পার্কিঞ্জি ফাইবার্স দিয়ে দুই ভেন্ট্রিকেল পেশীতে ছড়িয়ে যুগপৎ সমস্ত মাংসপেশী কুঁচকিয়ে দেয়। যদি S. A. Node ঠিক থাকে, কিন্তু A. V. Node (এট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার) বিগড়ে যায়, তবে হার্ট ব্লক জন্মে। এই অবস্থায় যদিও এস. এ. নোড় থেকে প্রেরণা ভেন্ট্রিকেলে যায় না, তবু ভেন্ট্রিকেলের সহজাত শক্তির সাহায্যে সে কুঞ্চিত হয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত মন্দগতিতে স্পন্দন ক্রিয়া চলে।

হৃৎস্পন্দন (Cardiac Cycle) ঃ আমাদের বিশ্রামকালে প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দন গড়ে ৭৫ বার হয়। কুঞ্চন এট্রিয়ামে আরম্ভ হয়ে ১/১০ সেকেণ্ড থাকে। কুঞ্চনের ফলে সমস্ত

এট্রিয়াম কক্ষ রক্তশূন্য হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভেন্ট্রিকেলদ্বয় কুঁচকায়, তা থাকে ৩/১০ সেকেণ্ড, একে সিষ্টোল বলে। এরপর সমস্ত হৃৎপিণ্ড প্রসারিত হয়ে ৪/১০ সেকেণ্ড থাকে, একে বলে ডায়াষ্টোল। মোট একটি হার্টবিট ৮/১০ সেকেণ্ড সময় নেয়।

সিষ্টোল-ডায়াষ্টোল অর্থাৎ কুঞ্চন প্রসারণ অবস্থায় হার্টের কক্ষে কি ক্রিয়া চলে? সিষ্টোল অবস্থায় ডানদিকের এট্রিয়াম কক্ষে, দুই ভেনাকেভা দিয়ে যত কাল রক্ত আসে, তা সব চলে যায় দক্ষিণ ভেন্ট্রিকেলে, এবং সেখান থেকে পাল্মনারি আর্টারি দিয়ে ফুসফুসে যায়। এই সময় বাম এট্রিয়াম থেকে যে তাজা রক্ত পাল্মনারি ভেন দিয়ে বাম ভেন্ট্রিকেলে আসে, তা বৃহৎ এওর্টা ধমনী দিয়ে সারা দেহে প্রেরিত হয়। দুই ভেন্ট্রিকেলের কুঞ্চনক্রিয়া বিদ্যুৎগতিতে হয়। এট্রিয়াম থেকে রক্ত এসে দুই ভেন্ট্রিকেলের কক্ষে চাপ খুব বাড়িয়ে দেয়। মাইট্রাল ও ট্রাইকাস্পিড (এট্রিয়ামে যাবার পথ) দরজা এটে বন্ধ থাকে। যখন এট্রিয়াম দুটি সঙ্কুচিত হয় ঠিক সেই মুহূর্তে ভেন্ট্রিকেল দুটি শিথিল থাকে। আর ভেন্ট্রিকেল যখন সঙ্কুচিত হয় তখন এট্রিয়ামরা শিথিল হয়। ডায়াষ্টোলের সময় চার কামরাই রক্তে ভরে যায়। ভালভ থাকার জন্য ঐ রক্ত পেছনে যেতে পারে না। এট্রিয়াম শিরামুখে কপাট নাই। শিরাতে রক্ত ভর্তি থাকে এবং সেই রক্ত পেছনে যেতে পারে না, শিরা মধ্যে যে ভালভ্ আছে সেখানে আটকে যায়।

এখন চাপের কথায় আসা যাক। যেই মুহূর্তে এক হার্ট বিট শেষ হল, ভেন্ট্রিকেল দুটি প্রসারিত হয়ে রয়েছে, ওদের কক্ষে মাত্র ২/৩ মিলিমিটার চাপ আছে, তাই এট্রিয়াম থেকে টুপিয়ে টুপিয়ে রক্ত এসে পড়ছে। এওর্টা ও পাল্মনারী ধমনীর দরজা বন্ধ আছে। ওদের মধ্যে ৭০ মিলিমিটারের অধিক চাপ বর্তমান। অতএব যতক্ষণ দুই ভেন্ট্রিকেলেও ৭০/৮০ মি.মি. চাপ না জন্মে ততক্ষণ ধমনী দুটির কপাট খোলে না। সেইজন্য ভেন্ট্রিকেলে রক্ত জমে জমে, সিষ্টোল প্রায় শেষ সময়ে, যখন চাপ খুব বেশী হয়, তখনি ধমনীদ্বয়ের কপাট খুলে রক্ত বেগের সঙ্গে ঢুকে পড়ে। রক্ত বেরিয়ে গেলে ভেন্ট্রিকেলের চাপ কমে যায়, ধমনীর কপাটও বন্ধ হয়ে যায়। তাই দুই ভেন্ট্রিকেল, এট্রিয়ামের ন্যায়, একেবারে রক্তশূন্য হয়ে চুপসে যায় না, কিছু রক্ত ওদের কক্ষে সর্বদা থাকেই। সিষ্টোলের সময়ে বাম এট্রিয়াম কক্ষের চাপ কিছু বেশী থাকে, কিন্তু দক্ষিণ এট্রিয়ামের মধ্যে চাপ কখনও বেশী হয় না। কারণ দুই ভেনাকেভার ভাণ্ডারে রক্ত সর্বদা ভর্তিই থাকে।

হার্টের লাবডাব শব্দের উৎস

বুকে স্টেথোস্কোপ বসালে কিংবা কান পাতলে পরপর দুটি শব্দ ও তারপর একটু বিরাম, আবার ঐ রকম লাবডাব শব্দ ও বিরাম বেশ ভালভাবেই অনুভব করা যায়। সিষ্টোল কালে লাবডাব, এবং ডায়াষ্টোল কালে বিরাম এই ক্রিয়া অহরহ চলছে। লাব শব্দের উৎপত্তির কারণ, হঠাৎ মাইট্রাল ও ট্রাইকাস্পিড্ দুই দরজা বন্ধ হওয়া, এট্রিয়াম ও

ভেন্ট্রিকেলের মধ্যের ভালভ এঁটে গেলে, ভেন্ট্রিকেল কক্ষের চাপ বাড়ে, কক্ষ কেঁপে ওঠে। রি ডুপ্লিকেশন অর্থাৎ লাবব্ এইরকম দ্বিত্ব শব্দ হলে বুঝতে হবে যে দুই ভেন্ট্রিকেল কক্ষ, একতালে বন্ধ না হয়ে সামান্য আগে পড়ে বন্ধ হচ্ছে।

ডাব্, দ্বিতীয় শব্দ বেশ জোরে শোনা যায়, বিশেষ করে এওর্টিক স্থানে, অর্থাৎ দক্ষিণ বক্ষের দ্বিতীয় পঞ্জরাস্থির উপরে। যখন ভেন্ট্রিকেল কক্ষের কুঞ্চন সম্পূর্ণ হয়েছে, এওর্টাও পাল্মনারি ধমনীর দরজা জোরে বন্ধ হল এবং এওর্টার গাত্র কেঁপে ওঠে, তখনই ডাব্ শব্দ শোনা যায়।

ইলেক্টোকার্ডিওগ্রাফ ও কার্ডিওগ্রাম

হৃৎপিণ্ডের পেশীর আকুঞ্চন ও প্রসারণকালে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তা মাপার যন্ত্রকে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ্ বলে। দেহস্থ টিসুরসে সোডিয়াম-পটাসিয়াম ক্যালসিয়াম-ক্লোরাইড প্রভৃতি ইলেকট্রোলাইটস (যার মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ যায়) যথেষ্ট আছে। প্রত্যেকবার হৃৎস্পন্দনে যে তড়িৎশক্তি জন্মে, তা ঐ টিসুরস দিয়ে সারা শরীরে, আঙুলের ডগায় ডগায় প্রবাহিত হয়। এইজন্যই দেহের যে কোন দুই অঙ্গের চর্মে যদি কোন ধাতব প্লেট বেঁধে (সীসার পাত হলে ভাল হয়) লবন জলে সিক্ত করে, তা দিয়ে স্প্রিং গালভানোমিটারের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তবে সম্পূর্ণ একটি বিজলী চক্র হবে এবং যন্ত্রে তা প্রকাশ পাবে। কার্ডিওগ্রাম যন্ত্রে, নির্দেশক এক হ্যাণ্ডেল ও ঘূর্ণমান ড্রামে আঁকা বাঁকা ছবির দ্বারা হৃৎস্পন্দনের প্রকৃতি (বিকৃত বা সুস্থ) জানিয়ে দেয়।

হৃৎপিণ্ডের শব্দ (Heart Sound)

বুকে স্টেথিস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে এই যে লাবডাব শব্দ শোনা যায় এদের সঙ্গে রক্তচাপের একটা বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। প্রথম যে শব্দটি উৎপন্ন হয় তাকে বলে (Systolic Sound) প্রসারণ শব্দ। এই দুইটি শব্দের সাহায্যেই ব্লাড প্রেসার নির্ণীত হয়। প্রথম শব্দটি হৃৎপিণ্ডের শিরোদেশে বা নিম্নদিকে এবং দ্বিতীয় শব্দটি পাদদেশে বা উর্দ্ধদিকে শোনা যায়। আমরা আগেও দেখেছি যে হৃৎপিণ্ডের ডানদিকের ও বামদিকের বৃহৎ কোটর বা নিলয় একই সময়ে সঙ্কুচিত হয়, ঠিক সেই সময়েই এট্রিয়াম ভেন্ট্রিকুলার ভালভ্ তাদের নিজ নিজ দ্বার রুদ্ধ করে দেয় আর তখনই এওর্টিক ও পাল্মনারি ভালভের দ্বার খুলে যায়। এই কয়টি ব্যাপার একসঙ্গে জড়িত হয়েই প্রথম শব্দ (First Sound) উৎপন্ন করে। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন অবস্থায় এটা ঘটে বলেই এর নামকরণ করা হয়েছে Systolic Sound বা আকুঞ্চক শব্দ। এই শব্দ হার্ট শব্দের মধ্যে স্থূল ও দীর্ঘ এবং এর স্থায়িত্ব কাল এক সেকেণ্ডের দশভাগের চারভাগ। এর উচ্চারণ ঠিক 'লাব' শব্দের ন্যায়। হৃৎপিণ্ডের এপেক্স বা শিরোদেশে বাম স্তনের এক ইঞ্চি নিম্নে এবং মিডস্টার্নাল লাইন বা বক্ষাস্থির মধ্যরেখা

থেকে বামদিকে ৯ সেন্টিমিটার দূরে এই শব্দ বেশ ভালোভাবেই শোনা যায়। এই শব্দের পরে সিস্টোলিক পজ (Systolic Pause) বা সঙ্কোচন শব্দের বিরামকাল।

হার্টের দ্বিতীয় শব্দ (Second Sound) ঃ হার্টের দ্বিতীয় শব্দকে diastolic sound বলে। হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ অবস্থায় এই শব্দ শোনা যায় বলে এর নামকরণ করা হয়েছে প্রসারণ শব্দ বা diastolic sound. ডান এবং বাম নিলয় বা বৃহৎ কুঠরির প্রসারণ সময়ে এওর্টার ভালভ্ বা বৃহৎ ধমনীর কপাট এবং পালমোনারী ভালভ্ বা ফুসফুসের ধমনীর কপাট বন্ধ হয়ে এই শব্দ উৎপাদন করে। এই শব্দ প্রথম শব্দের চেয়ে তীক্ষ্ম ও স্বল্পকাল স্থায়ী (Sharp and short)। এর উচ্চারণ 'ডাব' শব্দের ন্যায়। এর স্থায়িত্ব এক সেকেণ্ডের দশভাগের দুইভাগ। সঙ্কোচনের বিরামের ন্যায় প্রসারণ শব্দেরও বিরামকাল আছে। একেই বলা হয় diastolic pause, এরপর পুনরায় প্রথম শব্দ আরম্ভ হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দ এবং তাদের বিরামকাল একত্রে প্রায় এক সেকেণ্ডে শেষ হয়। এদের যদি দশভাগে ভাগ করা যায় তবে ফল যা দাঁড়ায় তা হল প্রথম শব্দের স্থায়িত্ব ৪ ভাগ, প্রথম শব্দের বিরাম ১ ভাগ, দ্বিতীয় শব্দের স্থায়িত্ব ২ ভাগ, দ্বিতীয় শব্দের বিরামকাল ৩ ভাগ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের হৃৎপিণ্ড এইভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে অবিরাম গতিতে কাজ করে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রক্তচাপ (Blood Pressure)

যে শক্তিবলে রক্তবহী নাড়িগুলিতে রক্ত চলাচল করে সেই শক্তিকে মোটামুটিভাবে ব্লাডপ্রেসার বা রক্তের চাপ বলা যেতে পারে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্বারা যে যে শক্তি চালিত হয় তাই ব্লাড প্রেসার। শরীরের মধ্যে রক্তের স্বাভাবিক প্রবাহ যখন তীব্রতর হয়, তখন কতকগুলি কষ্টদায়ক লক্ষণ প্রকাশ পায়। একেই সাধারণত আমরা রক্তের চাপ বলি। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন শক্তি, হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয় থেকে বৃহৎ ধমনীতে চালিত রক্তের পরিমান, রক্তবহানাড়ীর গাত্রাবরনের প্রতিরোধ শক্তি এবং ধমনীগাত্রের স্থিতিস্থাপকতার উপর রক্তচাপ নির্ভর করে। আমাদের হৃৎপিণ্ডটি প্রতিনিয়তই ধমনী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে রক্তকে পাম্প করে দেহের দূর দূর অংশে প্রেরণ করছে। ধমনীর গায়ের স্থিতিস্থাপকতা গুণ আছে। রক্ত ধমনীর মধ্যে প্রবেশ করলে এই স্থিতিস্থাপকতার জন্যই তা ক্রমশঃ দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। যদি কোন কারণে ধমনীগাত্রের স্থিতিস্থাপকতা গুণ নষ্ট হয়, তবে ধমনীগাত্রও স্থূল হয়ে যায়। তখন একমাত্র হৃৎপিণ্ডকেই অত্যাধিক চাপ দিয়ে রক্তকে ভেতরে পাঠাতে হয়। হৃৎপিণ্ড রক্তকে ভেতরে পাঠাতে যে পরিমান চাপ দেয় সেটাই ব্লাড প্রেসার। ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হলে ধমনীর কাজও হৃৎপিণ্ডকেই করতে হয় বলে অত্যধিক চাপের ফলে হৃৎপিণ্ডটি ধীরে ধীরে বড় হয়ে যায় একেই বলা হয় Hypertrophy of Heart।

আমরা যে ব্লাড প্রেসারকে একটি রোগ বলে মনে করি সেই ধারণা অবশ্য সর্বাংশে সত্য নয়। ব্লাড প্রেসার নিজে কোন রোগ নয়। রক্ত চলাচলের মাধ্যম স্বরূপ রক্তবাহিকা নালীর মধ্যস্থ রক্তের একটি অবস্থাকেই রক্তের চাপ বলা যেতে পারে। প্রত্যেকেরই স্বাভাবিক একটা রক্তের চাপ থাকবেই। সুতরাং Blood Pressure কে কখনই একটি রোগ আখ্যায় ভূষিত করা ঠিক নয়। তবে হ্যাঁ যখন কোন কারণে এই চাপ স্বাভাবিকতার সীমারেখা অতিক্রম করে উর্দ্ধে উঠে যায় বা নিম্নে অবতরণ করে তখনই তাকে ব্যাধিরূপে কল্পনা করা উচিৎ হবে।

রক্তের চাপের এই যে স্বাভাবিকতার সীমারেখা অতিক্রম, অর্থাৎ হাইপ্রেসার বা লো-প্রেসার, যথাযথভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এর আড়ালে প্রকৃতিদেবীর অসীম করুণা ও মঙ্গল বিধান গভীরভাবে নিহিত রয়েছে। উচ্চরক্তচাপ আসলে প্রকৃতিমাতার রক্ষণশীল ক্ষতিপূরক প্রক্রিয়া (Conservative Compensative Process) বলা যেতে পারে। কারণ রক্তের প্রবাহ, বর্দ্ধিত প্রতিরোধ বা প্রতিবন্ধকতায় রক্তের এই চাপ শরীরের তন্তু মধ্যে রক্ত সঞ্চালনে সমতা বিধান করে। রক্ত চলাচলের প্রতিবন্ধকতায় রক্তচাপ বৃদ্ধি যদি না হত তবে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে হঠাৎ রোগীর মৃত্যু ঘটত। কিন্তু এরও একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করাও আবার বিপদের কারণ। আবার উচ্চরক্তচাপ স্বাভাবিক উপায়ে জোর করে কমালেও বিপজ্জনক। রক্তের চাপ যখন স্বাভাবিক থেকে কম হয় অর্থাৎ নিম্নে অবতরণ করে তখন তাকে বলে লো-প্রেসার বা নিম্নরক্তচাপ। হাই এবং লো উভয় প্রকারের প্রেসারের ক্ষেত্রেই কতগুলি অসুস্থকর ও কষ্টপ্রদ উপসর্গ প্রকাশ পায়। সুতরাং সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের উচিৎ রক্তের চাপের সাম্যতা বিধানের দিকে প্রথম থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করা।

Blood Pressure (রক্তের চাপ) এর পরিমান কোথায় কতটা?

মানব শরীরের সর্বত্র এবং সর্বস্থানেই রক্তের চাপ একপ্রকার থাকে না। হার্টের কক্ষে ১২০ মিলিমিটার, এওর্টায় ১১০, মাঝারি ধমনীতে ৭৫/৮০, ক্ষুদ্র ধমনী যেখানে কৈশিক জালে পরিণত হয়েছে সেখানে চাপ কমে কমে, —ধমনী জালে ৩০, ছোট শিরায় আরও কমে, বড় বড় ভেনে ১/২ মিলিমিটার মাত্র থাকে। শেষে বুকের ভেতরে (থোরাক্স) রক্তের চাপ নেগেটিভ হয়ে যায়।

এক মিলিমিটার প্রায় ১ ইঞ্চির ২৫ ভাগের ১ ভাগ বা ১০০০ মিলিমিটার = ৩৯.৩০ ইঞ্চি। এই মিলিমিটারকেই রক্তের প্রেসার পরিমাপের একক ধরা হয়ে থাকে। ধমনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক চাপকে সিষ্টোলিক, আর নিম্নতম চাপকে ডায়াষ্টোলিক বলে। (স্রোতের ঢেউ এর মাথা, আর ঢেউ গড়িয়ে নেমে গেলে তার তলা—এই দুই চাপ মাপা হয়।) আর এই দুই এর বিয়োগফলকে বলা হয় পালস প্রেসার। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন কালে সিষ্টোলিকই সর্বাপেক্ষা উচ্চতম চাপ। ডায়াষ্টোলিক সর্বনিম্ন চাপ—হৃৎপিণ্ড সঙ্কোচনের একেবারে শুরুতেই অথবা প্রসারণের শেষে এই চাপ সংঘটিত হয়ে থাকে। এই সময়ে লসিকা থেকে প্রায়

সমস্ত রক্তই শিরা মধ্যে প্রবেশ করে। এই দুইটি চাপ থেকেই আমরা নাড়ির চাপ (Pulse Pressure) অবগত হয়ে থাকি। এই নাড়ি চাপ হল উপযুক্ত চাপের প্রভেদ ফল। সিষ্টোলিক এবং ডায়াষ্টোলিক প্রেসারের অনুপাত সাধারণত ৩ ঃ ২ হয়ে থাকে। যেমন যদি কারও সিষ্টোলিক প্রেসার হয় ১২০ তবে ডায়াষ্টোলিক হবে ৮০ এবং পালস প্রেসার হবে ৪০ মিলিমিটার।

চারটি প্রধান কার্যকরী অঙ্গের উপর ব্লাড প্রেসার নির্ভর করে। যেমন—

১) হৃৎপিণ্ডের সবলতা বা শক্তি,

২) ধমনীর পেরিফেরাল রেজিষ্ট্যান্স,

৩) ধমনীগাত্রের স্থিতিস্থাপকতা এবং

৪) রক্তের আয়তন (Volume)

ব্লাড প্রেসার পরিচালিত হওয়ার টেকনিকটা একটু আলোচনা করা যাক। আমাদের হৃৎপিণ্ডের বামদিকের পাম্পিং এবং ধমনী ও কৈশিকাগুলির রক্তস্রোতে প্রতিরোধের উপর এই ব্লাড প্রেসার পরিচালনা নির্ভর করে। ধমনী, কৈশিকা, শিরা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যখন রক্তের স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে তখন ঐ স্রোত ধমনীগাত্র থেকে একটা বাধা পায়, আবার ধমনীগাত্রের স্থিতিস্থাপকতা গুণ থাকায় বাধার পরিমান আরও অধিক হয়। স্রোত বাধা পেলে যেমন তার বেগ বেড়ে যায়—অনুরূপ ধমনী প্রভৃতি রক্ত বওয়া নাড়ির স্বাভাবিক বাধা এবং তার স্থিতিস্থাপকতা গুণের জন্য বাধা এই উভয় প্রকারের বাধা বা প্রতিরোধের ফলে রক্তস্রোতের বেগ বৃদ্ধি পায়। এই প্রতিরোধকেই সীমান্ত প্রতিরোধ বা পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স (Peripheral resistance) বলে। এইরূপ বাধা পেতে পেতেই রক্তস্রোত ধমনী, ক্ষুদ্র ধমনী এবং কৈশিকা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে শরীরের দূর দূরান্তরে চলে যাচ্ছে। Peripheral resistance এবং ধমনীগাত্রের স্থিতিস্থাপকতা যদি না থাকত তবে রক্তবাহী নাড়িসমূহ একটা চোঙের আকার ধারণ করত। তার ফলে যে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া অসম্ভব হয়ে উঠত তা সহজেই অনুমেয়। এই পেরিফেরাল রেজিষ্ট্যান্স, যাকে আমরা সীমান্ত প্রতিরোধ বলতে পারি তা হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ চাপের (Diastolic Pressure) সমান। যখন হৃৎপিণ্ড প্রসারিত হয় তখন এওর্টা বা বৃহৎ ধমনীর মুখের ভালভ বা অর্ধচন্দ্রাকৃতি পর্দাত্রয় বন্ধ হয়ে যায়। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর নিজস্ব একটা সঙ্কোচক শক্তি রয়েছে। সেই শক্তি নিজস্ব বেগ সৃষ্টি করে এওর্টাও বৃহৎ ধমনীর পর্দাগুলোকে খোলা বন্ধ করতে সাহায্য করে। এওর্টার ভালভ্ বন্ধ হয় বলেই তার মধ্যে রক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডে আসতে পারে না।

ধমনী ও শিরার সংযোগস্থল থেকে শিরা দূষিত রক্ত বহন করে সংশোধনের জন্য হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসছে। এর একটা বেগ ও তার আয়তন বা পরিমান আছে। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্তস্রোত যে বেগের সঙ্গে সীমান্ত (Periphery) পর্যন্ত চালিত হচ্ছে তার আয়তনও পরিমানকে যেমন Pulse Pressure বলে। অনুরূপ এই প্রকার ধমনী ও শিরার সংযোগস্থল থেকে শিরা যে দূষিত রক্ত বহন করে সংশোধনের জন্য হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসছে তারও

একটা বেগ আয়তন এবং পরিমান আছে। একেই বলা হয় ভেনাস প্রেসার বা শৈরিক চাপ। ধমনীর বেগ থেকে সাধারণত শৈরিক চাপ নিম্ন হয়ে থাকে। একে বলে হৃৎপিণ্ডের Diastolic Pressure বা প্রসারণ চাপ।

আমাদের শরীরে রক্ত চলাচলের বেগ ধমনী, শিরা, কৈশিকা ইত্যাদির স্থিতিস্থাপকতা গুণের সহায়তায় প্রধানতঃ হৃৎপিণ্ড দ্বারাই পরিচালিত হয়। দৈবাৎ যদি নিমেষের জন্যও এই রক্ত চলাচল ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় তবেই কিন্তু আমাদের মৃত্যু হতে বাধ্য কিন্তু তা হয় না কারণ ধমনী, শিরা, কৈশিকা, লসিকা প্রভৃতি রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলীকে ভ্যাসোমোটর নার্ভ (অর্থাৎ যে সকল স্নায়ুর দ্বারা ধমনী ও শিরাদের সঙ্কোচন ও প্রসারণ কার্য সম্পন্ন হয়।) সুকৌশলে নিয়মাধীনে রেখে পরিচালনা করে চলেছে। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনকালে এওর্টা বা বৃহৎ ধমনীতে চাপ সব থেকে অধিক হয় এবং এর ক্ষণপরেই উক্ত বৃহৎ ধমনীর দ্বার সকল বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে চাপ পরবর্তী সিষ্টোল পর্যন্ত রক্তবাহী নাড়ির গাত্রের স্থিতিস্থাপকতা গুণে রক্ষিত হয়। রক্ত কৈশিকাসমূহে সজোরে প্রেরিত হলে চাপ অত্যন্ত আস্তে আস্তে নেমে যায় এবং ডায়াষ্টোলের বা হৃৎপিণ্ডের প্রসারণের শেষে সর্বনিম্ন স্থানে এসে উপস্থিত হয়। রক্তের গতি বা বেগ চাপের ন্যায় ধমনী থেকে কৈশিকায় পৌঁছায় কিন্তু এর বিপরীত ধর্মানুসারে পুনরায় উত্থিত হয়।

নাড়ীজ্ঞান (Pulse feelings experience)

ব্লাড প্রেসারের সঙ্গে নাড়ীর সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, তাই রোগীর ব্লাড প্রেসারের চিকিৎসা করতে হলে নাড়ী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় অত্যন্ত জরুরী। হৃৎপিণ্ডের গতি এবং শক্তি, রক্তবাহিকা ধমনীর অবস্থা ইত্যাদি বহু তথ্য নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা অনায়াসে অবগত হওয়া যায়। এইজন্যই এখানে নাড়িজ্ঞান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

নাড়ী সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে হলে নাড়ীর চারটি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে হবে। বিষয়গুলো হল ১) নাড়ীর স্পন্দন (Pulse beat) সম্বন্ধে, ২) নাড়ীর গতির তাল (Rhythm) সম্বন্ধে, ৩) নাড়ীর বল (Force) সম্বন্ধে এবং ৪) নাড়ীর আয়তন (Volume) সম্বন্ধে। সুস্থ ব্যক্তির নাড়ী সাধারণতঃ পূর্ণ থাকে। একে ইংরাজীতে বলা হয় Moderately full। এই অবস্থায় একটা সম ছন্দ বা তাল থাকে এবং সমগতি সম্পন্ন হয়, এতে কোমল বা ধীরগতি লক্ষ্য করা যায়। নাড়ী পরীক্ষাকালে এই অবস্থায় পরীক্ষকের আঙুলে নাড়ীতে ধীরস্পন্দন অনুভূত হয়—তাতে জড়তা থাকে না। সুস্থ মানুষেরও অবশ্য সবসময়ে একইভাবে থাকে না সময় বিশেষে অন্যভাব ধারণ করে। সকালে নাড়ী স্নিগ্ধ থাকে, দুপুরবেলা উষ্ণ হয় এবং বিকেলে নাড়ীর গতি কিছুটা দ্রুত হয়। এছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে নাড়ী সুস্থ মানুষেরও বিকৃত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। ঐ সময়ে নাড়ী পরীক্ষা করলে অজ্ঞতা বশতঃ নিরোগ মানুষকেও রোগাক্রান্ত বলে মন্তব্য করলে ভুল হবে। তাই চিকিৎসা শাস্ত্রে আর্য্য ঋষিগণ নাড়ী পরীক্ষার

যে নিষিদ্ধ সময় নির্দেশ করেছেন উক্ত সময়ে নাড়ী পরীক্ষা না করাই যুক্তিসঙ্গত। সময়গুলো হল—গায়ে তেল মাখার পর, ভোজনের সময়ে বা ভোজনের ঠিক পরেই, নিদ্রিতাবস্থায় ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত অবস্থায়, আগুনে বা রোদে উত্তপ্ত হওয়ার পর, পরিশ্রমের পর।

নাড়ী পরীক্ষার সময় তর্জনী মধ্যমা এবং অনামিকা এই তিনটি আঙুল দ্বারা নাড়ী পরীক্ষা করতে হয়। তর্জনীর নিচের স্পন্দনে বায়ু মধ্যমার নিচে পিত্ত এবং অনামিকার নিচের স্পন্দনে কফ এর সাম্যতা বা বিকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে হয়। বায়ুর আধিক্যে নাড়ী বক্রভাবে, আর পিত্তের বিকৃতিতে চঞ্চলভাবে এবং কফের আধিক্যে স্থিরভাবে স্পন্দিত হয়ে থাকে। জ্বরের সময় নাড়ি গরমবোধযুক্ত এবং দ্রুতগামী হয়। কিছু খাবার বা পান করার সময় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নাড়ীর স্পন্দনও বৃদ্ধি পায়। পুরুষের তুলনায় মেয়েদের নাড়ী প্রতি মিনিটে ১০ বার অধিক স্পন্দিত হয়—এই তারতম্য ৭ বছরের পর থেকেই লক্ষ্য করা যায়। ৭ বছর বয়স পর্যন্ত বালক বালিকার নাড়ির স্পন্দন প্রায় একরূপ থাকে। স্বাভাবিক অপেক্ষা নাড়ী মন্দগতি বিশিষ্ট হলে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের উপক্রম বা দুর্বলতা অনুমান করতে হবে। মৃদুগতি এবং পুষ্ট বোধ নাড়ী স্নায়বিক দুর্বলতার লক্ষণ। যদি কখনও পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির নাড়ী ১২০ বারের অধিক হয় তবে তা কঠিন ব্যধির লক্ষণ। আবার কোন প্রদাহ অবস্থায় নাড়ীর স্পন্দন ১২০ বারের অধিক হলেও তা কঠিন পীড়ারই পরিচায়ক, যদি কারও নাড়ী ১৫০ বারের অধিক স্পন্দিত হয় তবে তা আসন্ন মৃত্যুরই আশঙ্কা করতে হবে, এখন নাড়ীর চারটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

(১) Pulse beat বা নাড়ীর স্পন্দন ঃ নাড়ির স্পন্দন সকল বয়সে একই প্রকার হয় না, এক এক বয়সে স্পন্দনের মাত্রারও তারতম্য ঘটে। যেমন - সদ্যজাত শিশুর ১৪০ বার শৈশবাবস্থায় ১২০ বার বাল্যাবস্থায় ১০০ বার তরুনাবস্থায় ৯০ বার যৌবনাবস্থায় ৭২ বার প্রৌঢ়াবস্থায় ৭৮ বার বৃদ্ধাবস্থায় ৭০ বার অত্যাধিক বার্দ্ধক্যে ৮০ বার।

শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে নাড়ির একটা ছান্দিক সম্পর্ক আছে। একজন সুস্থ ব্যক্তির একবার নিঃশ্বাস নিতে এঁভং প্রশ্বাস ত্যাগ করতে যতটা সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যে নাড়ি ৪ বার স্পন্দিত হয়ে থাকে। যেমন সুস্থ বয়স্ক লোকের শ্বাস প্রশ্বাস ১৮ বার হলে তার নাড়ির স্পন্দন ৭২ বার হয়, কিন্তু বুকে সর্দিবসে গিয়ে নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিস হলে শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা যখন বেড়ে যায় তখন কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে নাড়ীর এই ছান্দিক সম্পর্ক আর বজায় থাকে না। তখন শ্বাস প্রশ্বাস বৃদ্ধির অনুপাতে কিন্তু নাড়ির স্পন্দন বাড়ে না। এস্থলে লক্ষ্য করা যায় যে নাড়ির স্পন্দন শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যার মাত্রায় দ্বিগুন বৃদ্ধি পায়।

গায়ের তাপ (Temperature) এর সঙ্গেও নাড়ির বিশেষ একটা সম্বন্ধ আছে, শরীরের উত্তাপ ১° ডিগ্রি বাড়লে নাড়ি ১০ বারের মত বেশী স্পন্দিত হয় কিন্তু নাড়ির স্পন্দনের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি শরীরের তাপ না বাড়ে তবে হৃৎপিণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ছে বলে

কল্পনা করতে হবে। অনেকদিন ধরে কোন অসুখে ভোগার পর কিংবা খুব দুর্বলতা কিংবা ইনফ্লুয়েঞ্জা, মূত্র-বিকার, সর্দ্দিগর্মী, ইত্যাদি কতগুলি রোগে নাড়ির স্পন্দনের সংখ্যা কমে যায়।

(২) নাড়ির তাল বা ছন্দ (Rhythm) ঃ নাড়ির গতি স্বাভাবিক অবস্থায় সমান তালে বা একটা নিজস্ব ছন্দে বয়ে চলে হার্টের প্রথম শব্দের পরে নাড়ির স্পন্দন হয়, তারপর নাড়ির বিরাম এরূপক্রমে ক্রমাগত নাড়ির ক্রিয়া চলতে থাকে। নাড়ীর এই স্বাভাবিক তাল বা ছন্দের যখন ব্যতিক্রম ঘটে তখন কোন ব্যাধি আক্রমন করছে বলে মনে করতে হবে। নাড়ির এই স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক স্পন্দন হাত দিয়ে পরীক্ষা করে বোঝা যায়।

(৩) নাড়ির আয়তন (Volume of Pulse) ঃ নাড়ির আয়তন সাধারণতঃ নির্ভর করে, হৃৎপিণ্ড যখন সঙ্কুচিত হয় তখন তার বামদিকের নিলয় থেকে এওর্টা বা বৃহৎ ধমনীর মধ্যে যে রক্ত প্রবেশ করে তার উপর। এতে নাড়ির কয়েকটা অবস্থা অনুভব করা যায়। যেমন পূর্ণনাড়ি, স্থূল নাড়ি, সূক্ষ্মনাড়ি, ও সূত্রবৎ নাড়ি। পূর্ণনাড়ি (Full Pulse) ঃ একে ইংরাজীতে Full Pulse বলে। আঙ্গুল দ্বারা পরীক্ষায় এরূপ নাড়ী মোটা বলে অনুভূত হয়। এটা হৃৎপিণ্ড জোরে জোরে স্পন্দিত হওয়ার ফল। হৃৎপিণ্ড যদি এর থেকেও জোরে চলতে থাকে তবে নাড়ি আগের থেকে আরও মোটা হয়। নাড়ির তখনকার এরূপ অবস্থাকে বলা হয় স্থূল নাড়ি (Large Pulse)। আবার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যখন হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তখন নাড়ি সূক্ষ্ম হয়, নাড়ির এরূপ সূক্ষ্ম অবস্থাকে সূক্ষ্মনাড়ী (Small Pulse) বলে, এই সময় যদি নাড়ি আঙুলদ্বারা পরীক্ষা করা যায় তবে পাতলা অনুভূত হয়। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যখন এর থেকেও আরও বেশি কমে যায় তখন পরীক্ষায় নাড়ি সূতার ন্যায় অনুভূত হয়। এই অবস্থাকে সূত্রবৎ নাড়ি (Thready Pulse) বলে।

রক্তবাহী নাড়িগুলিতে রক্তচাপের পরিমান (Total Preassure of Blood on Blood Vessels)

রক্তবহা নাড়িগুলির মধ্যে রক্তের চাপের পরিমান সর্বত্র এক থাকে না। এইসব নাড়ির ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রক্তচাপের পরিমানও বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে,

Halliburton's Hand book of Physiology তে বিভিন্ন নাড়িতে রক্তচাপের গড়পড়তা সর্বোচ্চ চাপের তালিকায় যেরূপৈ দেখানো হয়েছে তা নিচে দেওয়া হল —

বড় ধমনী = + ১৪০ মিলি মিটার

মধ্য ধমনী = + ১১০ মিলি মিটার

কৈশিকা = + ১৫ থেকে + ২০ মিলি মিটার

বাহুর ক্ষুদ্র শিরা = +, ৯ মিলি মিটার

পোর্টাল ভেন বা লিভার ধমনী = + ১০ মিলি মিটার

নিম্ন মহাশিরা (ইনফিরিয়র ভেনাকেভা) = + ৩ মিলি মিটার

গলদেশের বৃহৎশিরা সমূহ = ০ থেকে + ৮ মিলি মিটার।

তৃতীয় অধ্যায়

রক্তের চাপ নির্ণয় (Measurement of Blood Pressure)

হৃৎযন্ত্র প্রতি মুহূর্তে রক্ত পাম্প করে চলেছে। রক্ত পাম্পিং এর জন্য এই যন্ত্রটিকে প্রতিমিনিটে ৭২ বার স্পন্দিত হতে হয়। এই স্পন্দন (Beat) সংখ্যা কে বলা হয় 'Heart Rate'। প্রতিবার স্পন্দনের সময় হার্ট প্রায় ৭০ মিলি মিটার (অর্দ্ধকাপ) রক্ত পাম্পিং করে আর্টারীতে পাঠায়। রক্তের এই পরিমানকে বলে ষ্ট্রোক ভলিউম্। আর প্রতি মিনিটে হার্ট ৫ লিটারের মত রক্ত পাম্প করে, রক্তের এই পরিমানকে বলা হয় কার্ডিয়্যাক আউটপুট। সুতরাং কার্ডিয়্যাক আউটপুট = ষ্ট্রোক ভলিউম × হার্টরেট।

প্রধান আর্টারী, ও এওর্টা হার্ট থেকে বেড়িয়ে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়েছে। এই শাখা সমূহ আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্টারীতে বিন্যস্ত হয়েছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্টারী সমূহ আবার অতি সূক্ষ্মতম আর্টারীতে বিন্যস্ত হয়েছে যাকে আর্টিরিওল বলে। এই আর্টিরিওল সমূহের গায়ে ফাইভার মাসলস রয়েছে। এই জন্যই আর্টিরিওল শরীরে প্রয়োজন মত সঙ্কুচিত প্রসারিত হতে ও দেহের উপযোগি ক্রিয়াকলাপে সহায়তা করতে পারে, বস্তুতঃ এই আর্টিওল সমূহ রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রন করে, এরা রক্তের স্রোতকে সরাসরিভাবে বাধাদান করতে পারে অর্থাৎ রক্ত যখন বেগবতী হয় সরাসরি এদের মুখোমুখী হতে হয় বলে রক্তের বেগের চাপ এদের ক্রিয়াকলাপে বিঘ্নপ্রাপ্ত হয় বা সুশৃঙ্খলভাবে বইতে পারে। রক্তের স্রোতকে আর্টিরিওলদের এরূপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাই Peripheral registance।

সুতরাং বলা যায় রক্তের চাপ বা Blood Pressure হল Cardiac output এবং Peripheral resistance এর পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল। তাই প্রেসারকে সমীকরণের সাহায্যে এইভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে Blood Preassure = Cardiac output x Peripheral registance। শারীরিক বিধানে রক্তচাপের উপস্থিতি মানব সৃষ্টির প্রথম থেকেই রয়েছে। ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ এই ব্যাপারে সতর্ক ও সচেতন ছিলেন। তারা নাড়ীর গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণের মাধ্যমেই রক্তচাপের স্বাভাবিকতা বা অস্বাভাবিকতা উপলব্ধি করতে এবং পূর্ব হতেই রোগীকে সচেতন করে দিতে পারতেন। কিন্তু প্রেসার মাপার কোন যন্ত্রপাতি প্রাচীনকালে ছিল বলে জানা যায়নি।

১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে Stephan Hales নামক এক ইংরাজ সর্বপ্রথম ব্লাড প্রেসার মাপার যন্ত্র আবিষ্কারে সচেষ্ট হন। তিনি একটি ঘোড়ার প্রধান আর্টারীতে একটি লম্বা কাঁচের টিউব

বসিয়ে পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ করেন। তিনি দেখতে পান যে রক্তের চাপের কারণে কাচের নলটিতে রক্ত প্রবেশ করে প্রায় নয় ফুট পর্যন্ত উপরে উঠে গেছে।

এরপর প্রায় ১০০ বছর পর ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক ফরাসী মেডিকেল ছাত্র Jean Leonard Poisenille (জন লিওনার্ড পয়সিনিলী) চিন্তা করেন যে যেহেতু পারদ রক্ত বা জলের তুলনায় ১৩ গুণ বেশী ভারী সুতরাং যদি টিউবে পারদপূর্ণ করে ধমনীর রক্তের চাপের উপর ধরা হয় তবে আরও কম পরিসরে রক্তের চাপের একক নির্ধারণ করা যাবে। তখন তিনি ইউ টিউব (U-Tube) পারদ ম্যানোমিটার যন্ত্র আবিষ্কার দ্বারা রক্তের চাপ নির্ধারণে সমর্থ হন। কিন্তু তখন মানুষের রক্তের চাপ ঐ যন্ত্র দ্বারা নির্ধারণ করা সম্ভব হত না কারণ এই পদ্ধতিতে আর্টারী বা এওর্টা ফুটো করে তার চাপ নেওয়া হত, তবে এটা ঠিক যে আধুনিক প্রেসার মাপার যন্ত্র আবিষ্কার তারই অবদান। এর কিছুকাল পর (Ludwig) লুডউইগ আরও একটু উচুমানের প্রেসার মাপার একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। যন্ত্রটির নাম কাইমোগ্রাফিয়ন (Kymographion)। এটির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে উন্মুক্ত ধমনীতে একটি ঘূর্ণায়মান চোঙ (revolving cylinder) সংযুক্ত করে রক্তচাপ নির্ধারণ করতে হত। এরপর ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ ম্যারি (Mary) আরও একটু অগ্রসর হয়ে একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এতে সিষ্টোলিক ও ডায়াষ্টোলিক উভয়বিধ রক্তচাপই নির্ধারণ করা যেত। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে V. Bosch (ভি বস) পারদ ম্যানোমিটারের সঙ্গে একটি জলপূর্ণ রবার বালব্ যুক্ত করে ব্যবহার করেন। বালব্ মনিবন্ধস্থ নাড়ীর উপর চাপ দিলে নাড়ী বসে যায় এবং রক্তচাপ ম্যানোমিটারে নির্দ্ধারিত হয়। এই যন্ত্রটিরই পরবর্তীকালে বহু পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণের দ্বারা বস আরও অধিকতর উন্নতিসাধন করেন। আরও পরে V. Potain (ভি পোটেন) বহু গবেষণা করে এই যন্ত্রটিকে আরও উন্নত করেছিলেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে Riva Rocci সর্বপ্রথম বাহুতে জড়িয়ে প্রেসার নির্ধারণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। বাহুতে যেটি জড়ানো হয় তাকে যন্ত্রের বাহুবন্ধনী বা Cuff বলা হয়। এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে পারদযুক্ত রবার টিউব এবং তার সঙ্গে মিলিমিটার পরিমাপ যন্ত্র। নিচেকার ধমনী বসে না যাওয়া পর্যন্ত বাহুবন্ধনীর মধ্যে হাওয়া পাম্প করা হয়, পরে আস্তে আস্তে হাওয়া বের করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপিলারী নলে পারদের অবস্থান দেখে সর্বোচ্চ চাপ (সিষ্টোলিক প্রেসারের) পরিমাপ করা হয়। বর্তমানের যে সকল আধুনিক প্রেসার মাপা যন্ত্র সর্বত্র প্রচলিত তা এই যন্ত্রটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

রক্তের চাপ মাপার পদ্ধতি (Method to measure the Blood Pressure)

বিভিন্ন প্রকার Blood Pressure মাপা যন্ত্র ঃ—বর্তমানে যে সকল প্রেসার মাপা যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তার অধিকাংশই রিভা রকসির বায়বীয় প্রণালী অনুসারে তৈরী। এই যন্ত্রসমূহের

সহায়তায় কি করে রক্তের চাপ মাপা হয় তা একটু আলোচনা করা যাক, প্রথমে বাহুতে বায়বীয় বন্ধনী খুব বেশী চাপ না দিয়ে আঁটসাঁটভাবে জড়াতে হবে। বাহু বন্ধনীর নীচের চাপে ধমনী বসে না যাওয়া পর্যন্ত বাহু বন্ধনীতে পাম্প করে হাওয়া ভরতে হবে। দুইটি উপায়ে রক্তের চাপ নির্ণয় করতে হবে—১) স্পর্শন (Palpation) এবং ২) আকর্ন্নন (auscultation)।

Palpation উপায়ে প্রেসার নির্ধারণ পদ্ধতি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে করোট কফ (Korot Koff) প্রথম বর্ণনা করেন। বর্তমানে যে সকল যন্ত্র চালু রয়েছে তাকে বলা হয় Sphygmomanometer সর্বাধুনিক এবং নির্দোষ Sphygmomanometer যন্ত্রগুলি ক্রমশঃ Cook (কুক), Stanton (স্ট্যান্টন), janeway নিকলসন (Nicholson) ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক বৃন্দের আবিষ্কার।

সর্বাঙ্গসুন্দর Sphygmomanometer এর প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকা উচিৎ যে গুলো তা হল—

১) সব সময়ে এটি যথাযথ সঙ্কেত জ্ঞাপন করবে,
২) বাহু বন্ধনীর বিস্তৃতি কমপক্ষে ১২ সেন্টিমিটার হবে,
৩) এর নল স্থিতিস্থাপক হবে,
৪) এর ব্যবহার প্রণালী সম্ভব মত সরল ও স্বল্প সময় সাপেক্ষ হবে। এবং
৫) এটি ঘন লঘু অথচ শক্ত হবে।

বর্তমানে চালু Sphygmomanometer গুলির মধ্যে রিভা রকসি আদর্শে কুক প্রবর্তিত পারদ যন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিই বজায় রাখা হয়েছে অর্থাৎ এতে পারদ নির্মিত চাপ পরিমাপন যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত একটি বায়বীয় বাহু বন্ধনী আছে এবং তাতে পাম্প করে বায়ুপূর্ণ করার ব্যবস্থাও আছে। বন্ধনী যখন বাহুমূলে বাহুস্থিত ধমনীর উপর লাগান হয় তখন যতক্ষণ পর্যন্ত না হাতের কবজিতে নাড়ির স্পন্দন বন্ধ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বায়ুপূর্ণ করতে হয়। এই যন্ত্র সিষ্টোলিক চাপ নিরুপন করার পক্ষে বেশ কার্যকরী হলেও যেহেতু এটিতে বায়ু নির্গমনের ভালো ব্যবস্থা নেই সেজন্য এটি দ্বারা ডায়াষ্টোলিক চাপ নিরূপনের কোন সুব্যবস্থা নেই। এছাড়াও এটির আর একটি দোষ হল এতে ৫ সেন্টিমিটার বিস্তৃত বাহু বন্ধনী থাকার জন্য এটি দ্বারা কেবলমাত্র উচ্চ চাপই নিরূপন করা যায়। এটিতে দুইটি নল যুক্ত অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। যুক্ত নলের ব্যবহারের দরুন এটি ঘন হতে পারে বটে কিন্তু পারদ সহজেই উপচিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এবং যন্ত্রটি সহজে ভেঙ্গেও যেতে পারে। পাম্প করার জন্য দুইটি বালব্ থাকার জন্য বায়ুর চাপে বালবের থেকে নলের বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় এটি বড়ই বিরক্তিকর, এইজন্য এইটি ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা হারিয়েছে।

এরপর মূল ষ্ট্যানটন নির্মিত Sphygmomanometer যন্ত্রটি কিছুদিনের জন্য বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে, কিন্তু পরবর্তী কালে দেখা গেল যে এটি ওজনে বেশী ভারী হওয়ায় এবং আরও কিছু দোষত্রুটি থাকায় এটিরও জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়, ক্রমশঃ এটি নির্মান বন্ধ

হয়ে যায়।

এরপর আসে Janeway'র Sphygmomanometer যন্ত্র, এই যন্ত্রটিতে অন্যান্য যন্ত্র অপেক্ষা অনেকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। যেমন এতে যে বাহুবন্ধনীটি ব্যবহার করা হয় তা ১২ সেন্টিমিটার বিস্তৃত যা নির্দোষও ত্রুটিহীন। সুতরাং এর পরিমাপ সঙ্কেত নির্ভুল, তা সত্বেও এটিরও পরবর্তীকালে বেশ কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে এবং এটিও ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা হারায়।

এখন যেটি সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে সেটি হল নিকলসন প্রবর্তিত Sphygmomanometer. এটি পারদীয় যন্ত্রেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। উন্মুক্ত নলের ব্যবস্থার দরুন ব্যবহারের আগে এতে পারদপূর্ণ করতে হয় না। আর এইজন্য পারদ উপচিয়ে পড়ার সম্ভাবনাও নাই। কাচের নল এবং ইস্পাত নির্মিত ষ্টপ কর্ক থাকার দরুন পারদের ক্ষয় বা ব্যয়ও হয় না। যন্ত্রটি মাত্র ৩৩ সেন্টিমিটার লম্বা। ফলে অনায়াসে পরিবহনযোগ্য হওয়ায় এবং অন্যান্য ত্রুটিগুলো মুক্ত থাকায় এই যন্ত্রটিই বর্তমানে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

এছাড়া ইদানীং বাজারে আর একটি প্রেসার মাপা যন্ত্র বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সেটি হল Tyco Sphygmomanometer. অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় এটিতেও বায়ুপূর্ণ করার রবারের নল, রবারের পাম্প এবং বাহু বন্ধনী আছে। কিন্তু পারদীয় চাপ পরিমাপন যন্ত্রের পরিবর্তে এতে সাধারণ দিকদর্শন যন্ত্রের ন্যায় একটি চাপ পরিমাপন যন্ত্র সংযুক্ত থাকে। এই চাপ পরিমাপক যন্ত্রটি একটি বড় পকেট ঘড়ির আকারের এবং তার মধ্যে ঘড়ির ন্যায় ডায়ালের উপরে অঙ্কে সংখ্যা লিখিত রয়েছে। ব্যবহার প্রণালীও অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায়, যেমন বাহুমূলে বন্ধনী বেঁধে পাম্প দ্বারা তাকে বায়ুপূর্ণ করতে হয়। স্টপককের স্ক্রু খুলে বায়ু ছাড়ার পর ঘড়ির নির্দিষ্ট সংখ্যায় রক্তের চাপের অবস্থা জ্ঞাপন করবে।

আমাদের নব আবিষ্কৃত রক্তচাপ নির্ধারক যন্ত্র ঃ এটি সহজলভ্য এবং বাড়িতে বসে সহজেই নির্মান করা যায়। আমরা চাই সকলে নিজ নিজ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হোক। বাড়িতে এই যন্ত্রটি তৈরী করে ঘরে ঘরে স্বীয় রক্তের চাপ নিজেই পর্যবেক্ষণ করে তার যথাসময়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা করলে আর রোগ কখনও জটিল আকার ধারণ করতে পারে না, অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রের ন্যায় এতেও বায়ু পূর্ণ করার রবারের নল, পাম্প ও বাহু বন্ধনী রয়েছে। কিন্তু পারদীয় চাপ পরিমাপন যন্ত্রটির বদলে দুইটি বড় শিশি রয়েছে। প্রথম শিশিটির মুখে দুটি নল রয়েছে। প্রথম নলটির প্রান্তদেশ শিশির মুখের কাছাকাছি রয়েছে এবং দ্বিতীয় নলটির প্রান্তদেশ শিশিটির তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। শিশিটির গলা পর্যন্ত ঠাণ্ডা স্বচ্ছ জলে পূর্ণ। অবশ্য ঐ জলে কোন রঙ মিশিয়ে রাঙিয়ে নিলে আরও দৃষ্টিমধুর হয়। দ্বিতীয় শিশিটিও পূর্ব শিশির ন্যায় দুটি নল দ্বারা আবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু এই শিশিটিতে জল থাকবে না। এবার দ্বিতীয় শিশিটি উল্টে নিয়ে তার প্রথম নলটির সঙ্গে প্রথম শিশির দ্বিতীয় নলটি সংযুক্ত করতে হবে। এখন বাহুবন্ধনীর নলের সঙ্গে প্রথম শিশির প্রথম নল

সংযুক্ত করলে রক্তের চাপ অনুরূপ জল দ্বিতীয় শিশিতে উঠবে। দ্বিতীয় শিশিটির গায়ে রক্তচাপের নির্দেশক মিলিমিটার সংখ্যা আগে থাকতে লিখে নিতে হবে। এতে সুন্দরভাবে রক্তের চাপ মাপা যাবে। যদি বাড়িতে তৈরী করতে অসুবিধা হয় তবে গ্রন্থকারের ঠিকানায় যোগাযোগ করলেও হবে।

প্রেসার মাপার পদ্ধতি (Method of measure the Pressure)

প্রেসার মাপার দুইটি প্রণালী রয়েছে। প্রথমতঃ আকর্নন প্রণালী (Auscultation Method) এবং দ্বিতীয়তঃ সংস্পর্শন প্রণালী বা (Palpation Method) কোন প্রণালীতে কিভাবে Pressure মাপা যাবে তা এখানে একটু আলোচনা করছি।

১) আকর্নন প্রণালী (Auscultation Method) ঃ— এই প্রণালীতে সিষ্টোলিক এবং ডায়াষ্টোলিক এই উভয়বিধ চাপ কিরূপে নিধারণ করা হয় তার বিবরণ দিচ্ছি।

সিষ্টোলিক চাপ ঃ— প্রথমে হাতের উর্দ্ধ বাহুতে প্রেসার যন্ত্রের বাহু বন্ধনীকে এমনভাবে আঁটোসাঁটো করে জড়াতে হবে যেন আবার খুব বেশী টাইটও না হয় বা ঢিলেও না হয়। এখন বাহুবন্ধনীর দুটি নলের মধ্যে যে নলটি প্রেসার নির্ণায়ক যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার কথা সেটিকে ঐ যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করতে হবে। অপরদিকের যে নলটির প্রান্তে পাম্পিং ভালভ রয়েছে ঐ পাম্পটিকে এখন ধীরে ধীরে পাম্প করতে হবে। যতক্ষণ না নাড়ী বসে যায় ততক্ষণ বাহুবন্ধনীতে পাম্প করে বায়ুপূর্ণ করে যেতে হবে। এখন বাহুবন্ধনীর নিচে শিরার উপর একটি স্টেথোস্কোপ বসাতে হবে এবং স্টেথোস্কোপের অপর প্রান্তের নল দুটি কানে লাগাতে হবে। ধীরে ধীরে বায়ুচাপকে স্টপককের স্ক্রু ঢিলে করে মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে স্টেথোস্কোপের শব্দের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। হৃৎপিণ্ডের প্রথম শব্দ যখন বাহুবন্ধনী অতিক্রম করে, একটা পরিষ্কার ভারী বস্তুর পতনের ন্যায় শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে। এই সময়ে চাপ নির্দেশক পারদ, কাঁটা বা জল যে সংখ্যাকে নির্দেশ করবে উক্ত সংখ্যাই সিষ্টোলিক চাপ এর পরিমান মিলিমিটার বলে জানতে হবে।

ডায়াষ্টোলিক চাপ (Diastolic Pressure)

রক্তের ডায়াষ্টোলিক চাপ এর পরিমান জানতে হলে সিষ্টোলিক শব্দ অনুভূত হওয়ার পরও পাম্পিং ভালভের স্টপককের স্ক্রু ধীরে ধীরে আলগা করে বাহুবন্ধনীর বায়ু ক্রমশঃ মুক্ত করতে হবে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে হাতে বাহুবন্ধনীর নিচে শিরায় স্টেথিস্কোপ যন্ত্র বসিয়ে শব্দের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। ভারী কিছু পতনের শব্দের পরেই বায়ু চলাচলের ন্যায় একপ্রকার মার্মার (murmur) শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে। এরপরে আর

একবার ভারী কিছু পতনের শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে একে বলা হয় দ্বিতীয় শব্দ (Second Sound)। এই শব্দ ক্রমশ যখন মিলিয়ে আসবে তখন যে সংখ্যাতে চাপমাপক কম্পাস, পারদ বা জল থাকবে উক্ত সংখ্যা দেখে ডায়াষ্টোলিক প্রেসারের মিলিমিটার সংখ্যা নির্ণয় করতে হয়।

এখন আমাদের নব আবিষ্কৃত প্রেসার মাপা যন্ত্রটির বিবরণ ও ব্যবহার প্রণালী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছি। আমাদের যন্ত্রটির ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলো নিম্নরূপ ঃ—

১) একটি বাহুবন্ধনী। এটি একটি রবারের থলি বিশেষ। থলিটি সিল্ক বা রেশম অথবা কাপড় দ্বারা আবৃত এবং তার থেকে একপ্রস্থ কাপড় ব্যাণ্ডেজের মত ঝুলতে থাকে। থলিটি বাহুমূলে শিরার উপর রেখে ব্যাণ্ডেজের মত নিচের ফালি দ্বারা জড়িয়ে বাঁধতে হয়।

২) বাহুবন্ধনীর সঙ্গে একপ্রান্তে দুইটি রবারের নল বাহুবন্ধনীর সঙ্গে যুক্ত থাকে। এর মধ্যে একটি নলের প্রান্তে একটি রবারের পাম্প করার ভালভ সংযুক্ত থাকে। অন্য নলটি চাপ মাপন যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

৩) পাম্প করার রবারের ভালভটির সঙ্গে একটি স্টপ কক থাকে যার দ্বারা বায়ুকে ইচ্ছামত রুদ্ধ বা মুক্ত করা যায়।

৪) আমাদের চাপ মাপন যন্ত্রটি দুইটি কাচের শিশি বিশেষ। প্রথম শিশিটির মুখে দুইটি নল রয়েছে যার প্রথম নলটির প্রান্তদেশ শিশির তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত আর দ্বিতীয় নলটির প্রান্তদেশ শিশির মুখের গলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। শিশিটিতে গলদেশ থেকে কিছু নীচু পর্যন্ত জল দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে।

৫) অপর একটি শিশিও পূর্বের শিশির ন্যায় দুটি নল দ্বারা সজ্জিত রয়েছে। দ্বিতীয় শিশিটি বায়ুপূর্ণ। প্রথম শিশির প্রথম নলটি (যার এক প্রান্ত শিশির তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত) দ্বিতীয় শিশির দ্বিতীয় নলের (যেটির প্রান্ত দেশ শিশির গলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত) সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। প্রথম শিশির দ্বিতীয় নলটির প্রান্তদেশ সংযুক্ত করতে হবে। দ্বিতীয় শিশিটিকে উল্টে প্রথম শিশির ওপর স্থাপন করতে হবে। দ্বিতীয় শিশিটির প্রথম নলটি (যার প্রান্তদেশ শিশির তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত) উর্দ্ধে তুলে কিছুর সঙ্গে বায়ু নিষ্কাশনের জন্য আটকে রাখতে হবে, এই হল মোটামুটি আমাদের নব আবিষ্কৃত প্রেসার মাপা যন্ত্র। এটি যেমন সহজলভ্য তেমনি এর দ্বারা নির্ণীত প্রেসারও হয় নির্ভুল ও নিখুঁত। এখন এর দ্বারা কি ভাবে প্রেসার মাপা যাবে তা সংক্ষেপে বোঝাচ্ছি।

প্রথমে বাহুবন্ধনীটি বাহুমূলে ভালো করে জড়িয়ে বাঁধতে হবে। স্টপ ককের প্যাঁচ এটে দিতে হবে। অপর নলটি প্রথম শিশির দ্বিতীয় নলের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। এবার পাম্প দ্বারা ধীরে ধীরে পাম্প করে বাহুবন্ধনীর মধ্যস্থিত রবারের থলিটিকে বায়ুপূর্ণ করতে হবে। থলি বায়ুপূর্ণ হলে তার চাপে হস্তস্থ ধমনীর মধ্যেকার রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। সেজন্য কবজীতে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা যাবে না। এরপর স্টেথিস্কোপ কনুইয়ের

সম্মুখের দিকের স্ফীত শিরার উপর বসিয়ে কানে দিলে কোনরকম শব্দ বা আওয়াজ পাওয়া যাবে না। তারপর স্টপককের স্ক্রু খুলে আস্তে আস্তে বায়ু ছাড়তে হবে এবং দ্বিতীয় শিশির জলের লেভেলের দিকে নজর রাখতে হবে। এরপর হঠাৎ একসময় স্টেথোস্কোপের মধ্য দিয়ে হৃৎস্পন্দনের ন্যায় শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে। চাপ পরিমাপক দ্বিতীয় শিশিটির জলের স্তর যে অঙ্কের ওপর এলে প্রথম শব্দ শুনতে পাওয়া গেল, সেই অঙ্কই সিষ্টোলিক চাপের নির্দেশক, আগের মতই স্টপককের স্ক্রু খুলে বায়ু আরও ছাড়তে থাকলে হৃৎস্পন্দনের মত শব্দ এখন পর্যন্তও শুনতে পাওয়া যাবে, তবে বেশ বোঝা যাবে যে শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। ক্রমশঃ বায়ু ছাড়তে থাকলে জলের স্তর নামতে থাকবে এবং এমন অঙ্কের উপর আসবে যখন আর কোন শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে না। এই শব্দ বন্ধ হওয়ার অব্যবহিত পূর্বের অঙ্কই ডায়াষ্টোলিক চাপের নির্দেশক।

কোনরূপ যন্ত্র ছাড়া প্রেসার নির্ণয় প্রণালী

যেখানে কোন প্রকারেরই যন্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব নয় কিংবা হঠাৎ কেউ অসুস্থ হলে কোন চিকিৎসকের কাছে তখন প্রেসার মাপা যন্ত্র না থাকলে যন্ত্র বিনা নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করলে সহজেই ব্লাড প্রেসার নির্ণয় করা যাবে।

প্রেসার নিরূপনের জন্য নাড়ি পরীক্ষা করা প্রয়োজন। মনিবন্ধের নিচে নাড়ি পরীক্ষা করতে হয়। তর্জনীর মধ্যমা এবং অনামিকা এই তিনটি আঙুল দ্বারা নাড়িকে জোরে চেপে এদিক ওদিক সঞ্চালন করলে যখন দেখা যাবে আঙুলের নিচে নাড়ি স্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে না, তখন বুঝতে হবে রক্তের চাপ কম (Low Blood Pressure) আর যদি নাড়ি চাবুকের দড়ির মত শক্ত অনুভূত হয় তবে বুঝতে হবে উচ্চ রক্তচাপ (High Blood Pressure)।

দ্বিতীয় পদ্ধতি

রক্তচাপের একটা মোটামুটি ধারনা অবশ্য রোগীর লক্ষণাদির দ্বারাই পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় আর একটি উপায়েও রক্তচাপের একটা ধারনা সহজভাবে পাওয়া যেতে পারে, পদ্ধতিটি হল নাড়ির স্পন্দনের সময় নাড়ির উপর আঙুল দিয়ে শক্তি প্রয়োগে নাড়ির স্পন্দন রোধ করা যায়। স্পন্দন রোধ করতে যে পরিমান শক্তির প্রয়োজন হয় রক্তের চাপও সেই পরিমান হয়ে থাকে। অর্থাৎ চাপ যত অধিক হবে, স্পন্দন রোধ করতে তত অধিক শক্তির প্রয়োজন হবে। আবার যত অনায়াসে বা কমশক্তিতে স্পন্দন রোধ করা যাবে রক্তের চাপও তত কম বলে বুঝতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সুস্থ ব্যক্তির রক্তের স্বাভাবিক চাপ (Normal Blood Pressure of a Healthy Person)

অনেকে রক্তের চাপকে ব্যাধি বলে নির্দেশ করে থাকে, কিন্তু ব্লাডপ্রেসার নিজে কোন ব্যাধি নয়, এটা আসলে মানবের অন্যান্য লক্ষণাবলীর ন্যায় একটি লক্ষণ বলা যেতে পারে। কিংবা বলা যেতে পারে যে এটা রক্তবাহিকা নালী বা Blood Vessels এর মধ্যস্থ রক্তের একটা অবস্থা বিশেষ। প্রত্যেকেরই স্বাভাবিক একটা রক্তের চাপ আছে সুতরাং একে রোগ আখ্যায় বিভূষিত করা ঠিক যুক্তিসঙ্গত নয়। যেমন শরীরের তাপ, ওজন, উচ্চতা ইত্যাদি একটি বিশেষ অবস্থা বা লক্ষণ, অনুরূপ রক্তের চাপও একটি বিশেষ অবস্থা। যে মানবের যে বয়সে অন্যান্য সব লক্ষণগুলিও স্বাভাবিক রয়েছে তার পক্ষে একটি স্বাভাবিক ব্লাডপ্রেসার থাকে। যেমন মানুষের গায়ের উষ্ণতা স্বাভাবিক থাকার কথা ৯৮.৫° এরূপ বিভিন্ন বয়সে স্বাভাবিক ওজন উচ্চতা ইত্যাদিও নির্দিষ্ট রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে থার্মোমিটার লাগিয়ে দেখুন শতকরা ৫টি মানুষও পাবেন কিনা সন্দেহ যার স্বাভাবিক উষ্ণতা ৯৮.৫°। বেশীরভাগ লোকেরই ঐ উষ্ণতা হল জ্বর। ওজন উচ্চতার ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। অনুরূপ রক্তের চাপও একটি অবস্থা যা অন্যান্য লক্ষণগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে। দেখা গেছে আমাদের দেশে ২০ বছর বয়স্ক একটি যুবকের চেহারা ওদেশের ১৫ বছরের সমান। সুতরাং শুধু বয়স নয় আনুসঙ্গিক অপরাপর লক্ষণগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই রক্তের চাপের স্বাভাবিকতা নির্ণয় করা অধিক যুক্তিসঙ্গত।

দেশ, কাল, পাত্র, অবস্থাভেদে রক্তচাপের তারতম্য ঘটে থাকে। আমাদের দেশে সুস্থ ব্যক্তির সাধারণত বিশ্রাম অবস্থায় রক্তের চাপ গড়ে ১১০ থেকে ১৩৫ পর্যন্ত হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে ৯০ থেকে ১১০ মিলিমিটার হয়।

চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারে ৯০+ বয়স হল সিষ্টোলিক স্বাভাবিক প্রেসার এবং ৬০+ বয়স হল ডায়াষ্টোলিক স্বাভাবিক প্রেসার আবার কারও কারও মতে আমাদের দেশের মানুষের বয়সের সঙ্গে ৮০ যোগ করলে যে যোগফল হবে তাই রক্তের স্বাভাবিক চাপ। আবার একসময় মনে করা হত বয়সের সঙ্গে ১০০ যোগ করলে স্বাভাবিক সিষ্টোলিক রক্তের চাপ পাওয়া যায়। অবশ্য এই মত ঠিক নয় বলে পরবর্তী কালে এটা পরিত্যক্ত হয়, কারণ পরিণত বা বেশী বয়সে এই পদ্ধতিতে যে স্বাভাবিক প্রেসারের মান পাওয়া যায় তা মোটামুটি অস্বাভাবিক। যেমন ৮০ বছর বয়সে স্বাভাবিক রক্তচাপ ১৪০ বা তার কাছাকাছি কোন সংখ্যা হওয়া উচিৎ কিন্তু এই পদ্ধতিতে যে অঙ্ক পাওয়া যায় তা হল ১৮০ এটা কখনই সম্ভব হতে পারে না।

আবার অপর একদলের মতানুযায়ী ২০ বছর বয়সে স্বাভাবিক সিষ্টোলিক রক্তচাপ ১২০ মিলিমিটার ধরা হয়। এর পর প্রতি ২ বছরে ১ মিলিমিটার যোগ করতে হবে। এই মত অনেকটা যথার্থ হলেও ৮০ বছরে সুস্থ ব্যক্তির স্বাভাবিক রক্তের চাপ ১৫০ বা ৯০ বছরে ১৬০ মিলিমিটার দাঁড়ায়, এটাও কিছুটা অস্বাভাবিক বলেই বোধ হয়।

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সামঞ্জস্য করে ডাঃ প্রাইস সম্পাদিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Practice of Medicine এ ডাঃ ওয়ারফিলড (Louis M. Warfield, A. B. M. D, F. R. C. P) একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। এটি অনেকটা কাছাকাছি পৌঁছেছে বলে মনে হয়। তালিকাটি নিম্নে উল্লেখ করছি ঃ—

সিষ্টোলিক চাপ

বয়স	উর্দ্ধ	নিম্ন	গড়
১৫-৩০ বছর	১৪২ মি.মি.	১০৪ মি.	১২৩ মি.
৩০-৪০ "	১৪৫ "	১০৭ "	১২৬ "
৪০-৫০ "	১৪৭ "	১১০ "	১২৮ "
৫০-৬০ "	১৫০ "	১১৭ "	১৩৩ "
৬০-৭০ "	১৫৬ "	১২১ "	১৩৮ "

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে ব্লাড প্রেসার সকলের এবং সকল অবস্থায় সমান হতে পারে না। কেবলমাত্র বয়স বিচার করে কোন পোষাক তৈরী করে সকল মানুষকে পরিধান করতে দিলে যেমন হাস্যকর ব্যাপার সংঘটিত হবে অনুরূপ প্রেসারের ক্ষেত্রেও শুধু বয়স বিচার করে স্বাভাবিক প্রেসার নির্ণয় করতে যাওয়া ঠিক নয়। ১৫ বছরের সমস্ত বালকই যেমন শারীরিক ভাবে এক নয় কেহ শীর্ণকায়, কেহ বা স্থূলকায়, কেহ আবার অতিরিক্ত মেদস্বিনী সুতরাং তাদের স্বাভাবিক পোষাকও যেমন স্বীয় স্বীয় বৈশিষ্টানুযায়ী রচিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, অনুরূপভাবে অন্তত আমার মতে প্রত্যেকের স্বাভাবিক প্রেসার নির্ণীত হওয়া উচিৎ তাদের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে, তবে আমি বিগত ২৫ বছর যাবৎ হাজার হাজার রোগী দেখে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাতে আমার মনে হয় আমাদের দেশে তরুন ও যুবক গণের স্বাভাবিক প্রেসার থাকা উচিৎ ১২০ এবং ডায়াষ্টোলিক ৮০, আর প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে ১৩০ ও ৮০ বা ৮৫, বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে ১২০ এবং ৮০ থাকাই বাঞ্ছনীয়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে ডায়াষ্টোলিক চাপ সিষ্টোলিক চাপের শতকরা ৭০ থেকে ৮০ মিলিমিটার হয়ে থাকে। ডাঃ ফট্ মনে করেন ২০ বছর যুবকের গড় সিষ্টোলিক চাপ ১২০ মিলি মিটার এবং প্রতি ২ বছরে ১ মিলিমিটার বৃদ্ধি পায়। রক্তের সিষ্টোলিক চাপ ২০ মিলিমিটার কমবেশী হলেও তাকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। কিন্তু ডায়াষ্টোলিক চাপ

প্রায় সমান থাকে, সিস্টোলিকের ন্যায় বিশেষ পরিবর্তন হয় না।

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে একই ব্যক্তিতে দিনরাত্রির বিভিন্ন সময়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে মানসিকতার ও দৈহিক কার্য্যাবলীর ভাবান্তর বা ব্যতিক্রম ঘটে। প্রেসার দৈহিক কার্য্যাবলীরই অন্তর্গত একটি ক্রিয়া বিশেষ হওয়ায় বিভিন্ন সময়ে প্রেসারের ও পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। ডায়াষ্টোলিক চাপ প্রায় একরকমই থাকে, সিস্টোলিক চাপের পরিবর্তন ঘটে। দিন ও রাত্রির মধ্যে রক্তচাপের ঘন ঘন পরিবর্তন হয়।

সময় বিশেষ প্রেসারের পরিবর্তন

বহুগবেষণা দ্বারা পরীক্ষণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারা গেছে যে সকাল এবং দিবাভাগ অপেক্ষা সন্ধ্যার দিকে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় রক্তের চাপ সর্বাপেক্ষা নিম্নগতি প্রাপ্ত হয়। সকাল থেকে তা আবার বাড়তে আরম্ভ করে। বসা থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় সিষ্টোলিক চাপ প্রায় ১২০ মিলিমিটার বেড়ে যায়। বসার থেকে হেলান দিয়ে থাকলেও রক্তের চাপ এইরূপে বাড়ে, অনেক স্থলে ডায়াষ্টোলিক চাপ সমানভাবে থাকে। আহারের পরেও রক্তের সিষ্টোলিক চাপ বৃদ্ধি পায়, নাড়ির গতিও কিছুটা বাড়ে কিন্তু ডায়াষ্টোলিক চাপ বাড়ে না। আবার দেখা গেছে যে যত অধিক খাদ্যগ্রহণ এবং গুরুপাক ভোজন করা হয় রক্তচাপও তত বাড়ে। অত্যধিক পরিশ্রম বা শরীর চর্চা, ভারী ব্যায়াম ইত্যাদির পর সিষ্টোলিক প্রেসার ২০ থেকে ৪০ মিলিমিটার বেড়ে যায়। ডায়াষ্টোলিক চাপ কিন্তু প্রায় একই থাকে, কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য হেরফের হতে দেখা যায়। আবার মানসিক উদ্বেগেও চাপ বাড়ে। স্ত্রীলোকদিগের ঋতু প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বেই রক্তের চাপ একটু বৃদ্ধি পায়, যাদের বাধক বেদনা রয়েছে তাদের সর্বাধিক হয়, কিন্তু স্রাব আরম্ভ হলে আবার চাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। রেগে গেলে বা শোক তাপ দুঃখ ক্রোধ ইত্যাদি চাপা থাকলে রক্তের চাপ বর্ধিত হয়।

উচ্চরক্তচাপে রক্তবাহী নাড়িতে পেরিফেরাল রেজিষ্ট্যান্স বর্ধিত হয়। রক্তের বর্ধিত দৃঢ়তা ধমনীগাত্রের পরিবর্তন ঘটায়, তাকে মোটা করে এবং এর স্থিতিস্থাপকতাগুণ নষ্ট করে দেয়। তাদের বিদারনের (Rupture) যথেষ্ট আশঙ্কা উপস্থিত হয়, সাধারণ অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক রক্তচাপ গড়ে ১২০ থেকে ১৩৫ পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু রক্তচাপের আধিক্যে তা ১৬০ থেকে ২৬০ বা ততোধিক মিলিমিটার পর্যন্ত উঠতে পারে। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ স্বাভাবিক রক্তচাপের যে গড় পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা হল —

	সিষ্টোলিক প্রেসার			ডায়াষ্টোলিক প্রেসার			
বয়স	নিম্ন	গড়	উচ্চ	নিম্ন	গড়	উচ্চ	নাড়িচাপ
১৫-১৯	১০৫	১১৭	১২৯	৭৩	৭৭	৮১	৪০
২০-২৪	১০৮	১২০	১৩২	৭৫	৭৯	৮৩	৪১
২৫-২৯	১০৯	১২১	১৩৩	৭৬	৮০	৮৪	৪১
৩০-৩৪	১১০	১২২	১৩৪	৭৭	৮১	৮৫	৪১
৩৫-৩৯	১১০	১২৩	১৩৫	৭৮	৮২	৮৬	৪১
৪০-৪৪	১১২	১২৫	১৩৭	৭৯	৮৩	৮৭	৪২
৪৫-৪৯	১১৫	১২৭	১৩৯	৮০	৮৪	৮৮	৪৩
৫০-৫৪	১১৬	১২৯	১৪২	৮১	৮৫	৮৯	৪৪
৫৫-৫৯	১১৮	১৩১	১৪৪	৮২	৮৬	৯০	৪৫
৬০-৬৪	১২১	১৩৪	১৪৭	৮৩	৮৭	৯১	৪৭

এই তালিকা দেখলে সহজেই অনুমান করা যাবে যে ভারতবর্ষের যুবকবৃন্দের গড় রক্তচাপ ১২০/৮০ থাকাই বাঞ্ছনীয়। তার থেকে সামান্য হেরফের হলে এমন কিছু আসে যায় না। তবে ডায়াষ্টোলিক প্রেসার ৮০ বা ৮৫ মিলিমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই স্বাভাবিক। অবশ্য যৌবন অবস্থায় ডায়াষ্টোলিক চাপই কখনও কখনও ৯০ পর্যন্তও ওঠে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় কোন বয়সেই এই চাপ ১০০ পর্যন্ত ওঠা একটি ভয়ানক চিন্তার ব্যাপার, সাধারণতঃ ওঠেও না। এখই বয়সে নারী ও পুরুষের রক্তচাপ সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা নারীর কিছুটা কম হওয়ায়ই স্বাভাবিক।

রক্তের সিষ্টোলিক চাপ স্বভাবত স্থির থাকে না, বিভিন্ন অবস্থাতে এই চাপের পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু অপরপক্ষে রক্তের ডায়াষ্টোলিক চাপ প্রায়শঃই সমানভাবে থাকে। অবশ্য অবস্থাবিশেষে এই প্রেসার ক্বচিৎ ৫ থেকে ১০ মিলি মিটার পর্য্যন্ত বাড়াকমা করতে পারে। কিন্তু এই সামান্য পরিমান হেরফেরের গুরুত্বও চিকিৎসা বিজ্ঞানে অসীম।

হৃৎপিণ্ডের বাম ভেন্ট্রিকল যে শক্তিতে সঙ্কুচিত হয় তাই হল রক্তের সিষ্টোলিক চাপ। আবার সীমান্ত প্রতিরোধের পরিমান অর্থাৎ যে শক্তিতে কৈশিকা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী সমূহে রক্ত সঞ্চালিত হয় তাকেই ডায়াষ্টোলকি চাপ বলে। ডায়াষ্টোলিক রক্তচাপ দ্বারা এওর্টা বা বৃহৎ ধমনীর মুখ রুদ্ধ করে রাখে, আবার নিলয় প্রত্যেক সঙ্কোচনে বৃহৎধমনীর মুখ খুলে তার মধ্যে রক্ত চালনা করতে সাহায্য করে থাকে। সুতরাং এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে রক্তসঞ্চালন কার্যের প্রকৃত চালক সিষ্টোলিক বা ডায়াষ্টোলিক কোনটিই নয়, আসল পরিচালক হল এদের প্রভেদ বা বিয়োগফল নাড়ি চাপ, যাকে Pulse Pressure বলে। সিষ্টোলিক চাপ যদি ১২০ এবং ডায়াষ্টোলিক চাপ ৮০ হয় তবে নাড়ি চাপ (Pulse Pressure) হবে ৪০।

পঞ্চম অধ্যায়

রক্তচাপে ধাতুদোষের প্রভাব

জগতে যত মানুষ আছে তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রকৃতি রয়েছে, মানুষের স্থূলদেহটাই একমাত্র চরম এবং শেষকথা নয়। এই স্থূলদেহের কারন স্বরূপ মন প্রান সর্বোপরি আত্মার প্রভাব বর্তমান। তাদের মানসিক প্রকৃতি অনুসারে শারীরিক বৈশিষ্টগুলি সংগঠিত হয়। এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে মানসিক প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রন করে দৈহিক কষ্টকর উপসর্গকে অনায়াসে আয়ত্তে আনা সম্ভব। কোন্ প্রকার প্রকৃতির দৈহিক গঠন কিরূপ হয় তা জানা থাকলে স্থূল দেহটা পর্যবেক্ষণ করেও তার অন্তরস্থ সূক্ষ্ম কারন স্বরূপ মানসিকতা, প্রকৃতি, প্রবনতা ইত্যাদি নির্নয় করা সম্ভব।

পরমাত্মা থেকে প্রকৃতি পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত জীবাত্মার নিজস্ব কল্পনাঙ্ক বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। এক এক প্রকার কম্পনাঙ্ক যুক্ত আত্মার আচার, আচরন, স্বভাব, প্রবনতা ইত্যাদি মানসিক লক্ষনাবলী এক এক প্রকার হয়। যেহেতু জীবের বাহ্য শরীরটি তারই অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মমনের ঘনীভূত স্থূল অবস্থা, তাই বিশেষ বিশেষ প্রকারের মানসিক লক্ষনাবলীযুক্ত জীবাত্মার স্থূলদেহগুলির গঠন, আকার, আকৃতি, প্রবনতা ইত্যাদি বৈশিষ্টাবলীও বিশেষ বিশেষ ধরনের হয়। জীব তার পূর্ববর্তী কর্মের দ্বারা যে স্তরে উপনীত হয় উক্ত স্তরের কম্পনাঙ্ক অনুসারে তার মানসিক ও শারীরিক গঠন সংগঠিত হয়। জীবের এই প্রকার সংগঠিত মানসিক ও শারীরিক অবস্থাকেই সংবিধান বা প্রকৃতি (Constitution) বলে।

ভারতীয় আর্য্যঋষিগণ তাদের গভীর ধ্যানলব্ধ গবেষণা দ্বারা প্রথম মানুষের এই সংবিধান সম্পর্কে পরমসত্য জগতে প্রতিষ্ঠা করেন। তারা সারা বিশ্বের বিভিন্ন কম্পনাঙ্কযুক্ত সমগ্র মানুষকে মোট বারোটি বিভাগে বিন্যস্ত করেন। প্রতিটি বিভাগকে তারা রাশি নামে অভিহিত করেন। মোটামুটি কাছাকাছি কম্পানাঙ্কযুক্ত মানুষদের নিয়ে এক একটি রাশি গঠিত। প্রতিটি রাশির মানুষের সংবিধান তারা জ্যোতিষশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এমন কি প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত জন্মকালীন গ্রহাবস্থান, লগ্ন ইত্যাদির সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ পরীক্ষণ দ্বারা প্রতিটি মানুষের স্বতন্ত্র সঠিক ও যথাযথ সংবিধান জানার উপায় তারা এই শাস্ত্রের মাধ্যমে করে গেছেন। তাদের মতে সৃষ্ট চরাচরের পেছনে এর কারন-রূপে নিশ্চিৎই অব্যক্ত কোন শক্তি বিরাজ করছে, এই ব্যক্ত চরাচর ঐ মূলশক্তিরই প্রতীক ও রূপায়ন। সেই অব্যক্ত মূলশক্তিটির কি কি স্বভাব, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম এক একটি বিশেষ জীবদেহে বা মনুষ্যদেহে রূপ নিয়েছে, তার নিদর্শন আছে তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গের গঠনে, কণ্ঠস্বরে চোখ, কান, নাক, মুখ হাত ও পায়ের বৈশিষ্ট্যে, হাতের রেখায়, জন্মকালীন

গ্রহসংযোগে, সবকিছুতে। তারা জন্মকালীন গ্রহাবস্থানের উপর ভিত্তিকরে জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। এই শাস্ত্রের সহায়তায় জন্মকালীন গ্রহাবস্থানের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষন দ্বারা জীবের অন্তর্নিহিত মূল শক্তির কম্পনাঙ্ক নির্ধারণ, ঐ কম্পনাঙ্কবিশিষ্ট অব্যক্ত মূলশক্তির স্বভাব প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য নির্নয় এবং তারই প্রতীক বা রূপায়ন স্বরূপ ব্যক্ত শরীরের গঠন আকৃতি প্রকৃতি প্রবনতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যাবলী অর্থাৎ সংবিধান সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

আবার জীব জন্মানোর পর তার ব্যক্ত শরীরের দৈহিক লক্ষনাবলীর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ পরীক্ষনের উপর ভিত্তি করে তারা সামুদ্রিক বিজ্ঞান শাস্ত্র (Physiognomy) প্রনয়ন করেন। হস্তরেখা বিজ্ঞান, শরীর বিকার বিজ্ঞান বা প্যাথলজি এই বিজ্ঞানেরই অন্তর্ভূক্ত এক একটি অধ্যায়। সামুদ্রিক বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষের দৈহিক লক্ষনাবলীর সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা তার অন্তরস্থিত অব্যক্ত আত্মার, অবস্থান, কম্পনাঙ্ক, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি এবং ব্যক্ত শরীরের প্রকৃতি, প্রবনতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যাবলী অর্থাৎ সংবিধান সঠিকরূপে অবগত হওয়া যায়, যা যথাযথভাবে চিকিৎসার একটি মূল অঙ্গ।

পাশ্চাত্যদেশে মানুষের সংবিধান বা প্রকৃতির উপর সর্বপ্রথম গবেষণা করেন জগৎবিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল। তিনি একটি প্রকৃতি নির্ধারণ শাস্ত্র (Physiognomy) প্রনয়ন করেন। এই শাস্ত্রে তিনি মানুষের বিভিন্ন আকৃতি, বৈশিষ্ট্য, স্বভাব, প্রবনতা এবং বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে তাদের বিভিন্ন রোগ প্রবনতা ও মানসিকতার বৈশিষ্ট্য নির্ধারন করেছেন। তিনি বলেন সঠিকরূপে চিকিৎসা করতে হলে এমন একটি শাস্ত্র অপরিহার্য্য যার দ্বারা মানুষের প্রকৃতির শ্রেনীবিভাগ করা যায়, যে প্রকৃতিতে বিভক্ত করলে তাদের সঠিক রোগ নির্বাচন ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে উপযোগী হবে।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক হিপোক্র্যাট মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সূত্র আবিষ্কার করেন। এই সূত্রটিকে তিনি Naura Medicatrix নামে অভিহিত করেন, এই সূত্রানুসারে জগতে প্রত্যেকটি মানুষেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মেজাজ বর্তমান, এই স্বভাবের বৈশিষ্ট ক্বচিৎ পরিবর্তন হয়, জীবন ব্যাপী প্রায় অপরিবর্তিতই থাকে। সুতরাং মানুষের এই অপরিবর্তিত প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত মানসিকতা, রোগ প্রবনতা, স্বভাব, গঠন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলিও প্রায় অপরিবর্তিতই থাকে। তাই কোন একটি প্রকৃতি বিচার করে তার পরবর্তী প্রবনতা বা অবস্থানগুলির কথা পূর্ব থেকে অবগত হওয়া সম্ভব। অবশ্য এই তথ্য ভারতীয় আর্য ঋষিগণ বহু পূর্বেই আবিষ্কার করে গেছেন। এই প্রকার প্রায় অপরিবর্তিত প্রকৃতিকে তারা দৈব বা ভাগ্য নামে অভিহিত করে গেছেন, তারা এও জানিয়েছেন যে জীবের ইহজন্মের বা পূর্বজন্মের কৃত পূর্বপূর্ব কর্ম পরিনতি লাভ করে ভাগ্য বা দৈব অর্থাৎ প্রকৃতি (Constitution) সংগঠিত হয়। এই দৈব সাধারণতঃ তীব্র হয়ে থাকে যার ফলে সহজে পরিবর্তন হয় না। কর্ম বা পুরুষকার দ্বারা এই দৈবের পরিবর্তন করা সম্ভব। কিন্তু পুরুষকার সাধারনতঃ মৃদু হয়। তীব্র পুরুষকার দ্বারা প্রকৃতিকে পরিবর্তন করা যায়। আর যদি কারও প্রকৃতি পুরুষকারের তুলনায় মৃদু হয় তবে সে অল্প আয়াসে

পুরুষাকারের দ্বারা প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। তীব্র পুরুষকার (কর্ম, সুচিকিৎসা) দ্বারা রোগীর প্রকৃতির যদি পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয় তবেই ভবিষ্যতে তার নিজ প্রকৃতি অনুসারে ভবিষ্যতে আগত অবশ্যম্ভাবী রোগ প্রবনতা বা অসুস্থ অবস্থাগুলোর সঠিক প্রতিকার করা সম্ভব হবে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান সুদীর্ঘকালব্যাপী গবেষণা দ্বারা আবিষ্কার করেন যে প্রকৃতি সৃষ্ট মানুষের স্থূলদেহটিই একমাত্র চরম এবং শেষকথা নয়। এর অন্তরালে লুক্কায়িত মন এবং প্রানের ভূমিকাই ব্যাধির ক্ষেত্রে অধিক। আমরা স্থূলদেহে যে সব বিকৃত এবং কষ্টকর উপসর্গ দেখতে পাই তা আসলে মনেরই বিশৃঙ্খলার স্থূলদেহে প্রকাশিত বাহ্যিক রূপ। স্থূল দেহটি আসলে সূক্ষ্মমনের দ্বারাই পরিচালিত। যে যেমন মানসিকতার অধিকারী তার স্থূলদেহটিও অনুরূপভাবে সংগঠিত হয়। মানুষ যখন প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন পূর্বক উশৃঙ্খল মানসিক বৃত্তি অবলম্বন করে তখন ঐ বিকৃত মানসিকতার পরিনাম স্বরূপ স্থূলদেহটির সাংগঠনিক বিকৃতি ঘটে। হ্যানিম্যান বলেন যে মানুষের এই বিকৃত মানসিকতা তথা দৈহিক বিকৃতি অর্থাৎ ধাতুগত দোষই সকল রোগের কারন। শরীরে এই দোষের বর্তমানতাই মানুষের রোগ নিরাময়ের প্রধান অন্তরায়। এর জন্যই সুনির্বাচিত ওষুধ প্রয়োগেও বিশেষ বিশেষ রোগীর ক্ষেত্রে রোগ সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হয় না। কতকাংশে প্রশমিত হয় মাত্র। তিনি আরও বলেন যে রোগীর রোগ সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করতে হলে এই বিকৃত ধাতুদোষের সমতা ফিরিয়ে আনা দরকার। তার মতে মানুষের এই বিকৃত ধাতুদোষ প্রধানতঃ তিন প্রকারের হয়ে থাকে। সোরা, সাইকোসিস এবং সিফিলিস দোষযুক্ত। প্রতিটি স্তরে মানসিক ও শারীরিক বিকৃতি এক এক প্রকারের হয়ে থাকে, তিনি সুস্থ দৈহিক ভেষজ পরীক্ষাবাদ (Drugs proving) দ্বারা এও প্রমান করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে ভেষজাবলীও প্রধানতঃ এই তিনটি স্তরে বিভক্ত। কোন কোন ভেষজ সুস্থ শরীরকে সোরিক ধাতুতে পরিনত করতে সক্ষম অর্থাৎ শরীরে সোরাদোষের অনুরূপ বিকৃত মানসিক এবং দৈহিক লক্ষনাবলী উৎপাদনে সক্ষম, কোন কোন ভেষজ শরীরকে সাইকোটিক ধাতুতে বিকৃত করতে এবং কোন কোন ভেষজ বা সুস্থ শরীরকে সিফিলিস ধাতুতে পরিনত করতে সক্ষম। তাই তিনি বলেন আগে রোগীর মানসিক ও শারীরিক বিকৃত লক্ষনাবলী সংগ্রহ করে তার ধাতুগত অবস্থা জেনে নিয়ে উক্ত বিকৃত ধাতুদোষ সংশোধনে সক্ষম ভেষজাবলীর মধ্য থেকে সমলক্ষন উৎপাদনক্ষম ভেষজটি নির্বাচন করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করলে রোগীর বিকৃত ধাতুদোষ সংশোধিত হয়ে রোগটি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হবে।

হ্যানিম্যানের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী জার্মান দেশের প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ ভন গ্রভগ্‌ল্ (Dr, Von Gravvogl) জৈব রাসায়নিক প্রকৃতি (Biochemic Constitution) অনুসারে বিশ্বের সমগ্র মানুষকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তার মতে মানুষের স্থূল শরীরটি যে সকল জৈব রাসায়নিক বস্তুতে সংগঠিত ঐ বস্তু সকলের সুশৃঙ্খল অনুপাতই মানুষের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতার কারন। যে শরীরে এই পদার্থসমূহের

অনুপাত স্বাভাবিক থাকে, সেই শরীরের বাহ্যিক গঠন, প্রকৃতি ইত্যাদি লক্ষনাবলীও সুশৃঙ্খল বা স্বাভাবিক থাকে যা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। কিন্তু যদি কোন কারনে শরীরস্থ এই পদার্থ সমূহের সুশৃঙ্খল অনুপাতের তারতম্য ঘটে অর্থাৎ এর মধ্যে কোন পদার্থের যথাযথ অনুপাতের তুলনায় অভাব বা আধিক্য দেখা দেয় তখন উক্ত শরীরটির স্বাভাবিক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এর ফলে ঐ শরীরটিতে কতগুলো অস্বাভাবিক লক্ষন পরিস্ফুট হয় এবং তার সংগঠনিক পরিবর্তন ঘটে। শরীরস্থ এই জৈব রাসায়নিক বস্তুর স্বাভাবিক অনুপাতের বিভিন্ন প্রকার অসমতার ফলে বিভিন্ন দেহের প্রকৃতি, গঠন, প্রবনতা ইত্যাদিও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। এক এক প্রকার বস্তুর অভাব বা আধিক্যে মনুষ্য প্রকৃতি এক এক প্রকারের রূপ পরিগ্রহ করে। যার ফলে বাহ্যিক রূপের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষনের দ্বারা শরীরস্থ জৈবিক রাসায়নিক বস্তুর অনুপাতের ন্যূনাধিকতার পরিমাপ অবগত হওয়া সম্ভব। বিশ্বে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে এই জৈবিক রাসায়নিক পদার্থের অনুপাত কারও ঠিক এক নয়, যার ফলে দৈহিক বা মানসিক গঠনের দিক থেকেও সকলেই বিভিন্ন। ডক্টর ভন্ অবশ্য এতটা সূক্ষ্ম তত্ত্বে না গেলেও তিনি সমগ্র মানুষকে মোটামুটি তিনটি প্রকৃতিতে বিভক্ত করেন। যাদের শরীরে উদযান বা জলীয় পদার্থের আধিক্য বর্তমান তাদের প্রকৃতিকে তিনি Hydrogenoied Constitution বলে অভিহিত করেন। এই প্রকৃতির অধীন মানুষের মানসিকতা, দৈহিক গঠন, প্রকৃতি প্রবনতা ইত্যাদি মোটামুটি কাছাকাছি হতে দেখা যায়। আবার যাদের শরীরে অম্লযানের আধিক্য দেখা যায় তাদের প্রকৃতিকে তিনি Oxygenoied Constitution আখ্যায় বিভূষিত করেন। এই প্রকৃতির অধীনস্থ মানুষদের গঠন, প্রকৃতি, প্রবনতাগুলিও বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে তা মোটামুটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত, আর যাদের শরীরে অঙ্গার ও নেত্রযানের আধিক্য তাদের প্রকৃতিকে তিনি Carbonitrogenoid Constitution নামে অভিহিত করেন। এই Constitution এর অধীন মানুষের আকৃতি প্রকৃতি প্রবনতাগুলি সম্পর্কেও তিনি বিশদভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে এই প্রকৃতির মানুষদের মধ্যে একটা গভীর মিল রয়েছে।

বায়োকেমিক চিকিৎসা শাস্ত্র অনুসারে মানুষের স্বভাবের অভাবই হল রোগ আর এই অভাবের পরিপূরনই হল তার সঠিক প্রতিকার। বিভিন্ন প্রকার ভাবগুলি আবার বিভিন্নপ্রকার জৈব রাসায়নিক পদার্থদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মনুষ্যদেহের দগ্ধাবিশিষ্ট ভস্মরাশি বিশ্লেষণ করে মোট ১২টি জৈব রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এরাই মানুষের স্বভাবের নিয়ন্ত্রক বলে এই শাস্ত্রের ধারনা। যদি কারও স্বভাবে অভাব দেখা দেয় অর্থাৎ মানসিক বা শারীরিক বিকৃত লক্ষনাবলী প্রকাশ পায় তবে বুঝতে হবে যে ভাবটি বিকৃত হয়েছে। ঐ ভাবটির নিয়ন্ত্রক এক বা একাধিক জৈব রাসায়নিক পদার্থের অভাব দেখা দিয়েছে। তখন তার প্রকৃত প্রতিকার হবে উক্ত স্বভাবের অভাবটির নিয়ন্ত্রক জৈব রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা পরিপূরন করা।

ইলেক্‌ট্রো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক কাউন্ট সিজার মেটি আদর্শ রোগারোগ্যের ক্ষেত্রে মানুষের প্রকৃতি নির্নয় করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তার

মতে মানুষের প্রকৃতি প্রধানতঃ তিন ধরনের হয়ে থাকে। (১) রক্ত প্রকৃতি (Sanguine Constitution) (২) শ্লেষ্মা প্রকৃতি (Phelgemetic Constitution) (৩) মিশ্র প্রকৃতি (Mixed Constitution)। তিনি বলেন শরীরকে সুস্থ ও শজীব রাখার পক্ষে বিভিন্ন পদ্ধতি (System) গুলির মধ্যে লসিকাতন্ত্র (Lymphatic System) অর্থাৎ রসবহ স্রোত এবং রক্ত সংবহন তন্ত্র (Blood Circulatory System) এই দুইটি তন্ত্রের গুরুত্বই সর্বাধিক। বিপাক তন্ত্র (Metabolic System) শরীরস্থ প্রানসত্ত্বা স্বরূপ এই দুইটি তন্ত্রকে (System) যথাযথভাবে পরিচালিত করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং দেহস্থ সমস্ত অবয়ব বা সংস্থানগুলিকে সঞ্জীবিত রাখে, রক্ষা, পোষন ও পালন করে। রস ও রক্ত দুষিত হলে বিপাক ক্রিয়াও দুর্বল ও রোগগ্রস্ত হয়। রক্ত প্রকৃতপক্ষে রস থেকে সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ রক্ত হল রসেরই পরিনত অবস্থা। তাই রস দুষিত হলে রক্তও দুষিত হতে বাধ্য। তাই কাউন্ট মেটি মানুষের প্রকৃতিকে তিনটি শ্রেনীতে বিভক্ত করে বলেন যাদের প্রকৃতিতে লসিকাতন্ত্রের গোলযোগ রয়েছে তারা Lymphatic প্রকৃতির মানুষ। এই প্রকৃতির মানুষের গঠন, স্বভাব, প্রবনতা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, আর প্রকৃতিতে যাদের Blood Circulatiry System এর বিশৃঙ্খলা বর্তমান তারা হল Sanguine প্রকৃতির মানুষ। Sanguin প্রকৃতির মানুষের দৈহিক ও মানসিক লক্ষনাবলী, স্বভাব, প্রবনতা ইত্যাদিও তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু এমন এক প্রকৃতির মানুষ দেখা যায় যাদের প্রকৃতিতে এই দুটি প্রকৃতির মধ্যে কোনটিরই সুনির্দিষ্ট একটি প্রকৃতির লক্ষনাবলী পাওয়া যায় না। উভয়বিধ বিশৃঙ্খলযুক্ত তন্ত্রে সম্মিলিত অবস্থায় প্রকৃতি জটিলাকার ধারন করে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়, এই প্রকার প্রকৃতিকে তিনি Mixed বা মিশ্র প্রকৃতি বলে অভিহিত করেন। এই অবস্থার সৃষ্টি হলে বিকৃত কোন কোন লক্ষনাবলীর দ্বারা তা বোঝা যায়। ঐ সম্পর্কে কাউন্ট মেটি আলোচনা করেছেন। এই সব প্রকৃতির মানুষের সংবিধান সঠিকরূপে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে তারা প্রত্যেকেই স্বাভাবিক মানুষের থেকে অনেক ক্ষেত্রেই দৈহিক এবং মানসিক দিক থেকে বিকৃত। এই বিকৃত অবস্থাকে যদি স্বাভাবিক করা যায় তবে তারা প্রত্যেকেই স্বাভাবিক মানুষের দলে অনায়াসে গা ভাসিয়ে দিতে পারে। আবার ভেষজ রাজ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও দেখা যায় যে বিশেষ বিশেষ ভেষজ স্বাভাবিক মানুষের প্রকৃতিকে বিশেষ বিশেষ লক্ষনাবলী সৃষ্টি করে বিশেষ বিশেষ সংবিধানে রূপান্তরিত করতে পারে। সুতরাং এটা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত যে কোন রোগীর সঠিক রোগ আরোগ্য করতে হলে তার সংবিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন অবশ্যই করতে হবে।

শোনিত প্রকৃতির মানুষ
(Man under Sanguin Constitution)

শোনিত প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে রক্তচাপের এক বিশাল সম্পর্ক রয়েছে। যারা এই প্রকৃতির অধীন তারা প্রথম থেকে সতর্কতা অবলম্বন করলে আর সুদুর ভবিষ্যতে আগত

ব্যাধির প্রকোপে কষ্ট পাবেন না। তাই এখানে কেবলমাত্র Sanguin Constitution এর লক্ষনাবলী আলোচনা করছি।

এই প্রকৃতির মানুষের অঙ্গ বেশ গোলগাল নিটোল আর গঠনও বেশ মজবুৎ হয়। গায়ের রঙ বেশ উজ্জ্বল তা সে কালো ফর্সা বা শ্যামবর্ণ যাই হোক না কেন। মাথায় ঘন কৃষ্ণবর্ন স্নিগ্ধ কেশযুক্ত, শরীরের যেখানেই নাড়ীর স্পন্দন থাকবে সেখানেই বেশ জোরের সঙ্গে স্পন্দিত হবে। এদের শরীরে সবসময় একটা চাপা তাপ থাকে।

শোনিত প্রকৃতির লোকের লোহিত কনিকার (R.B.C) আধিক্য থাকে। রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার তীব্রতা বেশী, নাড়ীর গতি বর্ধিত, অতি ক্ষুধা, স্বল্প নিদ্রা, হাতপায়ে ঘর্ম ইত্যাদি লক্ষনগুলো বর্তমান থাকে।

এই প্রকৃতির মানুষের মন সর্বদাই প্রসন্ন, এরা সবসময়ই স্ফূর্তিতে থাকে, কণ্ঠস্বর তেজদীপ্ত। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিক আর নাই দিক রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত জনিত কোন রোগ এদের আক্রমণ করে না। যে কোন পরিশ্রমের কাজই আসুক না কেন এদের উৎসাহে ভাটা পড়ে না।

শোনিত প্রকৃতির লোকদের যে লক্ষনগুলো আসে

এই প্রকৃতির মানুষের রক্তপ্রদাহযুক্ত রোগের প্রবনতা, রক্তস্রাবের বিভিন্ন রোগ, রক্ত অর্শ, পাচনক্রিয়ার অতিক্রিয়তা, ত্বকে ফোঁড়া ও নানা উদ্ভেদের প্রকাশ, হৃৎযন্ত্র, ধমনী শিরা ইত্যাদির বিকার, রক্তচাপ ইত্যাদি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তাছাড়া রক্তপিত্ত রোগ, মাঝে মাঝে অগ্নিমান্দ্য রোগ, শিরঃপীড়া, কণ্ডু, অতিনিদ্রা, ক্রোধের আধিক্য, স্মৃতিভ্রংশ স্বরভঙ্গ ইত্যাদিতে ভুগতে হবে এমনকি একজিমা হাঁপানিও হতে পারে। হাতে পায়ের তলায় ঘাম হওয়া, চোখ ওঠা, বাত রক্তে আক্রান্ত হওয়াটাও এদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়।

এদের শরীরে সর্বাপেক্ষা লক্ষনীয় বিষয় হল সর্বত্র একটা রক্তাভা থাকবে। কষ্ট সহিষ্ণুতা, অমনোপূত কথা শ্রবনমাত্র গম্ভীর হওয়া, আত্মসুখে বেশী তৎপড়তা, উন্নতি করার জন্য বেশী চেষ্টা ইত্যাদি লক্ষনগুলো থাকলে বুঝতে হবে, এদের চেহারার মধ্যে নিশ্চয়ই সর্বাঙ্গে রক্তাভরূপের একটা আভায় আছেই। এরা অর্শ বা নিম্নমার্গের রোগে আক্রান্ত হয় অধিক, এদের নুন ঝালে টান থাকে বেশী। এদের সন্তান সন্ততির মধ্যে ও রক্তজাত ব্যাধির প্রকোপ থাকে। উচ্চরক্তচাপ ব্যাধির সঙ্গে এদের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে।

হাইপ্রেসারে শারীরিক বিকৃতি (Pathology)

দীর্ঘদিন ধরে হাইপ্রেসারে ভুগতে থাকলে বিভিন্ন প্রকারের শারীরিক বিকৃতি আসতে পারে। ধমনীর উচ্চ রক্তচাপ সাময়িক বা দুই একদিনের জন্য অস্থায়ী হলে তার ফল এমন কিছু মারাত্মক হয় না, কিন্তু দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর যদি এরকম

চলতে থাকে বা মাঝে মাঝেই আক্রমন করে তবে তার ফলে দেহযন্ত্রের আময়িক পরিবর্তন (Pathological Change) ঘটে। শারীরবিধানের (Physiology) নিয়মানুসারে অর্থাৎ যন্ত্রের ন্যায় শরীরযন্ত্রকে নিয়মিত চালনা করার জন্য হার্টকে অধিক পরিশ্রম করতে হলেই রক্তবাহী নাড়ীমন্ডলীর পৈশিক কলার কাঠিন্য প্রকাশ পায়, এই অবস্থাই রক্তচাপের সর্বপ্রথম সূত্রপাত বলা যায়।

এইভাবে উচ্চচাপ ক্রমাগত চলতে থাকলে হার্ট এবং ধমনীগাত্রের ডিজেনারেসন নামক এক প্রকার বিকৃতি ঘটে। ধমনীগাত্রের মধ্যকার প্রাচীরের আবরন পুরু হলেই তার স্থিতিস্থাপকতাগুন এবং সঙ্কোচন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, একে ধমনী প্রাচীরের Arterial Sclerosis বা অবপতনিক পরিবর্তন বলে। ধমনীগাত্রের উপর যদি কিছুকাল ধরে এইরূপ চাপ পড়তেই থাকে তবে নালীসমূহের গাত্রাবরনে পরিবর্তন সংগঠিত হয়। বৃহৎধমনীর মত বড় শিরা আক্রান্ত হলে তাতে মেদময় অর্বুদ জন্মে। আর ক্ষুদ্রনালীতে হলে তাতে যে Pathological Change হয় তাকে বলে অবপতনিক পরিবর্তন। বৃহৎধমনী বা যে কোন বৃহৎ রক্তবাহীনালী এবং অন্যান্য ছোট রক্তবাহীনালী ইত্যাদির ক্ষেত্রে ধমনীর ব্যাধিতে তাদের মধ্যকার প্রাচীরগাত্রের স্থূলত্ব স্থানে স্থানে প্রকাশ পায়। কিডনী সংক্রান্ত স্থানের নালীর অবপতনিক পরিবর্তন থেকে কিডনিতে দানাময়তার (Granuler) সৃষ্টি হয়। অনুরূপ লিভারে সিরোসিস অফ লিভার এবং মস্তিষ্কে বার্ধক্যদশার বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

ধমনী কঠিনতা প্রাপ্ত হলে প্রান্তিক প্রতিরোধ ক্ষমতার বৃদ্ধি হওয়ার ফলে যে ক্ষতি হয় তা পরিপূরন করার জন্য হৃৎপিণ্ডকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। এর ফলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেতে পারে যাকে সাধারণত হার্টফেল (Heart failure) বলে, এটাই রক্তের উচ্চচাপ জনিত শারীরিক বিকৃতির (Pathology) দ্বিতীয় অবস্থা।

দীর্ঘ্যকাল উচ্চরক্তচাপ হতে থাকলে ক্রিয়া বিকারজনিত বৃহৎ ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম কিংবা অতি সূক্ষ্ম যে কোন রক্তবাহীনাড়ীর যে কোন স্থান অতিরিক্ত চাপের ফলে বিকৃত (Pathology) হতে পারে, এই বিকৃতির ফলে উক্তস্থান দুর্বল হয়ে ওঠে। যে কোন সময় ঐ দুর্বল স্থান বিদীর্ন হয়ে রক্তপাত ঘটিয়ে দুর্ঘটনা হওয়া সম্ভব। হাই প্রেসারে রোগীর শরীরের যে কোন দ্বার থেকে রক্তস্রাব দেখা দিতে পারে। দাঁতের গোড়া, নাক, চোখ, মস্তিষ্ক, ধমনী ইত্যাদি যে কোন স্থানই হতে পারে।

হাইপ্রেসারের পূর্বলক্ষণ

উচ্চরক্তচাপ কখনও হঠাৎ আক্রমণ করে না। প্রকৃতি দেবীর কৃপা জীবের উপর অবিরত ধারায় বর্ষিত হচ্ছে, কিন্তু জীব তা বোঝে না বা বোঝার চেষ্টা করে না বলে এত কষ্ট ভোগ করে। হাইপ্রেসার দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কতগুলো পূর্বলক্ষণ রোগীর মধ্যে প্রকাশ পায়। তখনও যদি সতর্ক না হয়, তখনও যদি প্রকৃতিদেবীকে

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙঘন করা হয় তবে প্রকৃতি তাকে ক্ষমা করার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন।

হাই প্রেসার হওয়ার পূর্বে যে লক্ষণগুলো দেখা যায় তা হল মাথা যন্ত্রণা বা মাথাধরা কিছুদিন ধরে চলতে থাকে। কপালের দিকে ও ঘাড়ের দিকে এবং মাথার মধ্যে সর্বদা পূর্ণতাবোধ। বমি এবং মাথা ঘোরা লক্ষণটিও কারও কারও ক্ষেত্রে পূর্বলক্ষণ হিসাবে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা ও সর্বসময়ের জন্য আলস্য বোধ। সামান্য নাড়াচাড়াতেও মনে হয় যেন দম আটকে যাবে। মনে হয় যেন হাঁপানী হবে। রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত, গভীর নিদ্রা একেবারেই হয় না। যদি কারও নাক থেকে ঘন ঘন রক্তপাত হতে দেখা যায় তবে তাও হাইপ্রেসারের পূর্বলক্ষণ বলে চিন্তা করা উচিৎ।

কতগুলি নির্দিষ্ট লক্ষণ দেখেও হাই প্রেসার আসছে এরূপ অনুমান করা যায়। কিছুদিন ধরে যদি এই লক্ষণগুলি চলতে থাকে তবে নিকট ভবিষ্যতেই হাই প্রেসার আসছে বা প্রায় এসেই গেছে এরূপ সন্দেহ করে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। লক্ষণগুলো হল ঃ—

শিরঃপীড়া ঃ—এটা সম্মুখ ললাট দেশে, পশ্চাৎদেশে কিংবা উভয়দিকেই হতে পারে। মাথা ঘোরা এবং মস্তকমধ্যে সর্বদা পূর্ণতাবোধ। কি শারীরিক কি মানসিক, উভয়বিধ পরিশ্রমেই অনাসক্তি এবং সর্বদা আলস্যবোধ। সঞ্চালনে শ্বাসহীনতা, মনে হয় যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হয় যেন হাপানী হয়েছে। রাত্রে ভালো ঘুম হয় না। হয়ত কোন কোন দিন একেবারেই ঘুম হয় না, সম্পূর্ণ জাগরিত ভাব অথবা তন্দ্রাযুক্ত নিদ্রা, নাক থেকে পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব, হৃৎপ্রদেশে যন্ত্রণা, হাতে পায়ে ঝি ঝি ধরা এবং সুড়সুড়ুনি ভাব। বৃদ্ধ বয়সে এইসব লক্ষণ দেখা দিলে আরও অধিক সন্দেহ করতে হবে যে হাই প্রেসার হয়েছেই। তাছাড়া রাত্রে সুনিদ্রার অভাব, রাত্রে নিদ্রার সময় একাধিকবার প্রস্রাব, বামপার্শ্বে চেপে শুতে অস্বস্তিবোধ, কানের মধ্যে একপ্রকার শব্দশ্রবণ, সময় সময় মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, সময় সময় শ্বাস প্রশ্বাসে অসুবিধা অনুভব ইত্যাদি হাইপ্রেসারের প্রাথমিক লক্ষণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হাইপ্রেসারের কারণ

প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণ করলে তা দেহ থেকে বার করে দেওয়ার জন্য দেহের বিভিন্ন যন্ত্রকে অতিক্রিয় হয়ে উঠতে হয়। খাদ্যের প্রোটিন শরীরের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে। যাদের বয়স ৪০ বছরের উর্দ্ধে এবং যৌবনেও যাদের কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম করতে হয় না, তাদের পক্ষে এই প্রোটিনের প্রয়োজন খুবই কম। স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানাভাব বশতঃ বা লোভের বশবর্তী হয়ে পরিশ্রমবিহীন ব্যক্তিগণ যখন প্রায় রোজই প্রচুর পরিমানে আমিষ ও নিরামিষ প্রোটিন খাদ্য গ্রহণ করে, তখন তাদের শরীরে অধিক পরিমানে ইউরিয়া

নামক একপ্রকার অম্লবিষ সঞ্চিত হয়। দেহের পক্ষে সঞ্চিত প্রোটিনের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। এই জন্য মনুষ্যশরীরে প্রোটিন সঞ্চয় করে রাখার কোন ব্যবস্থাও নাই। এই প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রোটিনকেই শরীর থেকে বার করে দেওয়ার জন্য লিভার এবং অন্যান্য পরিপাক তন্ত্বে সহায়তাকারী যন্ত্রগুলিকে বিশেষভাবে অতিক্রিয় হয়ে উঠতে হয়। প্রোটিনকে শরীর থেকে বার করে দিতে এই পাচক রসগুলির প্রাণপন চেষ্টাও যখন ব্যর্থ হয়, তখন এই প্রোটিন দেহের মধ্যে পচে দেহে বিষ সৃষ্টি করে, এবং সেই বিষে দেহের রক্ত দূষিত হয়, ফুসফুস, যকৃত, কিডনি ইত্যাদি রক্তশোধন কার্যে নিযুক্ত যন্ত্রগুলি ঐ বিষে জর্জরিত হয়ে যখন রুগ্ন ও দুর্বল হয়, তখন তাদের আর দূষিত রক্তকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত করার সামর্থ থাকে না। ঐ দূষিত রক্তের বিষপ্রভাবে ধমনী ও শিরাগুলির কোমলতা ও নমনীয়তা নষ্ট হয়ে যায় এবং এরা শক্ত হয়ে ওঠে। এই রুগ্ন, দুর্বল ও শক্ত ধমনীগুলির মধ্য থেকে রক্তস্রোত স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে পারে না। এর ফলে হার্টকে অতিক্রিয় হয়ে জোরে রক্ত পরিচালনার জন্য অধিক চাপ বা বেগ দিতে হয়। এই অধিক চাপ সৃষ্টি করতে গিয়ে হার্টকে অস্বাভাবিকভাবে স্পন্দিত হতে হয়। হৃদযন্ত্রের এই অতিক্রিয়তা এবং অস্বাভাবিক স্পন্দনই পরিনামে হাইপ্রেসারের সৃষ্টি করে। সুতরাং প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রোটিন খাদ্য গ্রহণ হাই প্রেসারের একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

আবার যারা রোজ প্রয়োজনাতিরিক্ত চর্ব্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে তারা যদি যথোচিত দৈহিকভাবে পরিশ্রম না করে তবে তাদের দেহস্থ সঞ্চিত চর্ব্বি দগ্ধ হতে পারে না। এইজন্য দেহে অতিরিক্ত চর্ব্বি সঞ্চিত হয়ে এদের শরীরটি স্থূলকায় হয়ে ওঠে। স্থূলকায় মানুষের বৃহৎ ধমনী ক্ষুদ্র ধমনী এবং রক্তবাহী শিরাগুলিতে মেদ সঞ্চিত হয় এবং তার ফলে ধমনীগুলির রক্ত চলাচলের পথ সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে, প্রয়োজনীয় রক্ত এই সঙ্কুচিত পথে অনায়াসে এবং স্বাভাবিক ভাবে যাতায়াত করতে পারে না। এইজন্য হার্টকেও অধিক বেগ, অধিক চাপ সৃষ্টি করে দ্রুত রক্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হয়। সুতরাং শরীরের প্রয়োজনাতিরিক্ত চর্ব্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ এবং শরীরে মেদ বৃদ্ধিও হাই প্রেসারের অন্যতম প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি।

মা বাবা উভয়েরই যদি হাই প্রেসার থাকে তবে তাদের সন্তানদের এই রোগে আক্রমণ করবেই করবে। বাবা মা দুজনের মধ্যে একজনের থাকলেও সন্তানে তা সঞ্চারিত হতে পারে। বহু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে দেখা গেছে যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেরাই এই রোগে আক্রান্ত হয় বেশী। তার একটি বিশেষ কারণ হল পুরুষেরা মানসিক কাজে ব্রিত থাকে বেশী। মানসিক অশান্তি, উদ্বেগ দুশ্চিন্তা রক্তচাপ বৃদ্ধির কারণ। মেয়েরা সাধারণত অতিরিক্ত মানসিক উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তার কবলে পতিত হয় না বলে এই রোগের হাত থেকে তাদের অনেকেই রেহাই পান কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় যে হারে মেয়েরা কর্ম্মস্থানে নিয়োজিত হচ্ছেন তাতে এরপর থেকে উভয়ের এই রোগে আক্রান্তের হার সমানুপাতিক পর্যায়েই পতিত হবে। অবশ্য দেখা যায় কোন কোন স্ত্রীলোক প্রৌঢ় বয়সে বয়ঃসন্ধিকালে অন্যান্য

উপসর্গের ন্যায় হাই প্রেসারেও ভুগে থাকে।

হাই প্রেসার সাধারণত ৪০/৪২ বছরের পর দেখা যায়। তবে কম হলেও অল্প বয়স্কদের মধ্যেও হাই প্রেসার যে একেবারে দেখা দিতে পারে না তা নয়, তবে তার কারণ সর্বত্র একই নয়। যেহেতু উচ্চ রক্তচাপ অন্য ব্যাধির লক্ষণরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাই কিডনির পুরাতন প্রদাহ বা অন্য ব্যাধির লক্ষণরূপে তরুন বা বালকদের মধ্যেও হাই প্রেসার দেখা দিতে পারে। যারা শীর্ণকায় এবং যাদের শারীরিক ওজন স্বাভাবিক অপেক্ষা কম, তাদের থেকে মোটাসোটা, ভারী ও নাদুস নুদুস ব্যক্তিদের হাই প্রেসার হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।

বর্তমানে হাইপ্রেসার রোগের অত্যধিক প্রসার ও সর্বব্যাপী হওয়ার একটি মূল কারণ হল আমাদের দেশে বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার অনুকরণ। ভারতীয় সভ্যতা আচার আচরণ কৃষ্টি ইত্যাদির মূলে রয়েছে মানবধর্মকে অর্থাৎ মন মনুষ্যত্ব ও স্থূল দেহকে সুস্থভাবে বিকশিত করার বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা। আর পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে রয়েছে ভোগ বিলাস ব্যাসন আমোদ প্রমোদের জলে গা ভাসানোর দুর্দমনীয় উন্মাদনা। ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে যেমন আহারে বিহারে অমিতাচার ইত্যাদি প্রধান কারণ তেমনি আবার মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রদের হাইপ্রেসারের প্রধান কারণ জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকার জন্য দিনরাত অনিয়ম শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, উপযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টির অভাব, মানসিক উদ্বেগ দুশ্চিন্তা ইত্যাদি। একদিকে ধনীদের অত্যধিক ভোগ বিলাসীতা ও যেমন হাইপ্রেসারের উৎভাবক অনুরূপ গরীবদের ভোগ্যবস্তুর অভাববশতঃ ম্যনসিক উদ্বেগও এই রোগের একটি মুখ্য কারণ।

The Homoeopathic Recorder পুস্তকে Dr. Willium Gatman বলেন– ''Arterial hypertension is a disease of modern Western Civilization, rare among Eastern reaces. That the way of life has a great deal to do with arterial tension is emphaised by the fact, that high blood preassure unknown among African Negroes is particularly widespread among American Negroes. Again, investigation of certain monastic order, such as the Trappists who live as vegetarians and takes the voe of silence, have shown that they never suffer from high blood pressure as compared with high groups of whites of same age level.'' —অর্থাৎ হাই প্রেসার আধুনিক পশ্চিমী সভ্য দেশের রোগ, পূর্বদেশের জাতীসমূহের মধ্যে এই রোগ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে এর যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে তা বেশ বুঝতে পারা যায় এই দেখে যে, আফ্রিকাবাসী নিগ্রোদের মধ্যে এই রোগটির অস্তিত্ব নাই, কিন্তু আমেরিকাবাসী নিগ্রোদের মধ্যে এই রোগটি বহু বিস্তৃত। আবার সাধু সন্ন্যাসী, মঠবাসী ইত্যাদি যাঁরা সাত্বিক জীবনধারণ করেন, তাদের মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে একই বয়স এবং একই পর্যায়ের শ্বেত জাতিসমূহের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই যে ট্রাপিষ্টগণ যাঁরা নিরামিষাশী এবং মৌনব্রতালম্বী

তাঁরা কখনও হাই প্রেসারের দ্বারা আক্রান্ত হন না।"

ডাঃ গাটম্যান হাই প্রেসারের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটি প্রধান কারণ নির্দেশ করেছেন। ১) রেনাল বা কিডনি সংক্রান্ত, ২) এণ্ডোক্রাইন বা হার্ট সংক্রান্ত এবং ৩) সাইকো বা মনোবিকার সংক্রান্ত, সময়ে সময়ে এই তিনটিরই সংমিশ্রণে জটিল আকারের হাই প্রেসার সৃষ্টি হতে দেখা যায়। রেনাল বা কিডনি সংক্রান্ত হাইপ্রেসারের ক্ষেত্রে প্রাদাহিক বা যান্ত্রিক গোলযোগ বশতঃই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এণ্ডোক্রাইন সংক্রান্ত প্রেসারে মেরুমজ্জার সিষ্ট টিউমার বা অন্যপ্রকার বিকৃতি হতেও উৎপন্ন হতে পারে। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে অতি সাধারণ প্রকারের হাইপ্রেসার মনোবিকার থেকে উৎপন্ন। রাগ দুঃখ পরশ্রীকাতরতা, অভিমান হিংসা ইত্যাদি যার মনে যত বেশী ঠাই পায় হাইপ্রেসারের শিকার তার ততোধিক পরিমাণেই হয়ে থাকে। ধীর স্থির শান্ত সৌম্য, সদানন্দ ও প্রফুল্লভাবে জীবনযাপন করলে এই রোগের দ্বারা খুব বেশী কষ্ট পেতে হয় না।

বর্তমানে হাইপ্রেসারের আর একটি কারণ হল অধিক পরিমানে কাচা নুন খাওয়া। বহুভাবে গবেষণা করে পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে নুন খাওয়ার সঙ্গে হাই প্রেসারের এক বিশাল সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৯৫০-৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই নিয়ে একবার গবেষণা চালানো হয়। হাজার হাজার আমেরিকাবাসীকে নিয়ে নুনের সঙ্গে প্রেসারের সম্বন্ধ আবিষ্কার করার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। তখন জনসাধারণকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই তিনটি দলকে ক, খ ও গ দল নামে অভিহিত করা হয়। ক) শ্রেণীর মানুষকে প্রত্যহ খাবারের সঙ্গে ২ থেকে ৩ গ্রাম পর্যন্ত নুন খেতে দেওয়া হয়। খ) শ্রেণীকে প্রত্যহ ৪ থেকে ১০ গ্রাম নুন খাওয়ানো হয় আর গ) শ্রেণীর জন্য প্রত্যহ খাবারে ১২ থেকে ১৮ গ্রাম নুন ধার্য করা হয়। এরপর প্রত্যেকের প্রেসার চেক করে দেখা যায় ক) শ্রেণীর মানুষ কখনও হাই প্রেসারে আক্রান্ত হয়নি, খ) শ্রেণীর মানুষ একেবারে বৃদ্ধ বয়সে হাই প্রেসারের শিকার হন আর গ) শ্রেণীর জনসাধারণ যৌবন অবস্থা থেকেই হাই প্রেসার সংক্রান্ত বিভিন্ন উপসর্গে কষ্ট পান আর বার্দ্ধক্যে তারা উচ্চরক্তচাপ ঘটিত জটিল রোগের শিকার হন। সুতরাং লবণ খাওয়ার সঙ্গে হাইপ্রেসারের যে একটা সম্বন্ধ রয়েছে একথা নিশ্চিত। আসলে নুন খাওয়া মানুষের একটি পুরাতন সংস্কার ও বলা যেতে পারে। মানব শরীরে যে নুনের প্রয়োজন হয় তা প্রাত্যহিক খাবারে যথেষ্ট পরিমানেই রয়েছে। শরীর ভালো করার জন্য বাইরের সামুদ্রিক নুনের প্রয়োজন হয় না। খাদ্যকে মুখরোচক করতেই নুনের প্রয়োজন। কিন্তু এই অভ্যাস ক্রমশঃ ত্যাগ করলে সার্বিক মঙ্গল।

হাইপ্রেসারের আর একটি কারণ দৈহিক ওজন বৃদ্ধি। যে কোন কারণেই হোক যাদের ক্রমশঃ দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে তাদের লো প্রেসার থাকলেও বুঝে নেওয়া উচিৎ যে অদুর ভবিষ্যতেই হাই প্রেসার আক্রমণ করতে আসছে। অতএব সতর্কতা অবলম্বনীয়। পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ করে দেখা গেছে ক্রমশ ওজন বৃদ্ধি হাই প্রেসারের প্রকৃতিদত্ত পূর্ব সতর্কবানী। রাত্রিজাগরণ, ব্যাভিচার, চর্ব্বচোষ্য লেহ্য পেয়াদি ভক্ষণ ইত্যাদি আনুষঙ্গি

ক কার্যকলাপ এর কারণ বলা যেতে পারে। ভোজনে অমিতাচারী ব্যক্তিগণের মধ্যেও তেমনি হাইপ্রেসারের আধিক্য দেখা যায়। পেঁয়াজ ডিম অধিক মশলাযুক্ত খাবার গুরুপাক খাবার অধিক দিন ধরে ব্যবহার করলে মানুষ মোটা এবং ভারী হয়ে পড়ে। এই সমস্ত গুরুপাক খাদ্য একদিকে যেমন রক্তচাপকে উত্তেজিত করে হাইপ্রেসারে সহায়তা করে অপরদিকে মানুষকে ওজন বৃদ্ধি ও মোটাসোটা করে রক্তচাপকে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে থাকে।

হাইপ্রেসারের আর একটি কারণ দৈহিক কর্মবিমুখতা ও অলসজীবন যাপন। বহুপর্যবেক্ষণ পরীক্ষণের দ্বারা প্রমানিত হয়েছে যে হাইপ্রেসারে আক্রান্ত জনসাধারনের বৃহৎ অংশই বুদ্ধিজীবি। শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে এই রোগের পাদুর্ভাব অতি নগন্য। যারা সর্বদা চেয়ারে বসে বসে কাজ কর্ম করে, দৈহিক কোন কর্ম করে না তারাই এই রোগের শিকার হয় বেশী। ব্যাপারটা সত্যি কিনা তা প্রমান করার জন্য অনেকবার গবেষনা করা হয়েছে। দুই তিন হাজারেরও অধিক পরিশ্রমী খেলোয়ারের প্রেসার পর্যবেক্ষণে রেখে দেখা গেছে যে তাদের সিষ্টোলিক প্রেসার গড়ে ১১০ মিলিমিটার মাত্র। আর সমসংখ্যক বুদ্ধিজীবি চেয়ার টেবিলে বসে বসে কাজ করেন এমন ব্যক্তিদের প্রেসার পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে তাদের গড় সিষ্টোলিক প্রেসার ১৪৫ মিলিমিটার। সুতরাং বুদ্ধিজীবি এবং শ্রমজীবিদের ওপর যে হাইপ্রেসারের একটা সম্বন্ধ আছে এটা নিশ্চিৎ।

হাইপ্রেসারের কারণগুলোর মধ্যে ধূমপান ও যে একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে রয়েছে তা গবেষণার দ্বারা বিশেষ ভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে হার্ট অ্যাটাক, সেরিব্রাল হ্যামারেজ, থ্রম্বোসিস ইত্যাদি হাইপ্রেসার জনিত দুর্ঘটনায় আক্রান্ত রোগীর বেশীরভাগ অংশই ধূমপায়ী। তামাকে নিকোটিন এবং কার্বমনক্সাইড এই দুই প্রকারে বিষ পাওয়া যায়। এই বিষ যখন ফুসফুসের মাধ্যমে দেহে সঞ্চারিত হয় তখন ঐ বিষ এর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য হৃৎযন্ত্র অতিক্রিয় হয়ে দ্রুতবেগে চলতে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে দুইটি সিগারেট খাওয়ার পরমুহূর্তেই রক্তের চাপ ৮ থেকে ১০ মিলিমিটার মত বেড়ে যায়। এবং এই অবস্থা প্রায় ১৫/২০ মিনিট কাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই অবস্থা যদি রোজই চলতে থাকে তবে ক্রমশঃ হাইপ্রেসার বৃদ্ধির দিকেই যাবে।

হাইপ্রেসারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল এলোপ্যাথিক পেটেন্ট ওষুধ সেবন ও মদ্যপান। অধিকাংশ বিরেচক ওষুধের সিংহ ভাগই Alchohol দ্বারা পূর্ণ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে মদ্যপান এর পরমুহূর্তেই মানুষের রক্তের চাপ বেড়ে যায় যা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী থাকে। পর্য্যবেক্ষণ পরীক্ষণ করে প্রমাণিত হয়েছে যে মদ্যপায়ী ব্যক্তিদের অধিকাংশই হাইপ্রেসারে ভুগছে।

সুতরাং হাইপ্রেসারের এই সমস্ত কারণগুলি জনসাধারণকে জানানো এবং এর থেকে বাঁচবার উপায় সম্পর্কে জ্ঞান দান করা সমাজের প্রতিটি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এবং চিকিৎসকের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে গণ্য করা উচিৎ। ধূমপানকারী ব্যক্তিদের

যেমন উচ্চরক্তচাপে এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে হয় তার থেকেও অধিক ক্ষতি করে ধূমপান অবস্থায় পার্শ্বে অবস্থিত ধূমপানে অনভ্যস্ত ব্যক্তিদের। ধূমপানে অনভ্যস্ত ব্যক্তিদের নিকোটিন ও কার্বন মনক্সাইড বিষ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা (Registance Power) তুলনামূলকভাবে কম। সুতরাং ধূমপানকারীর ধূম যখন নাক দ্বারা ফুসফুসের মধ্যে যায় তখন তাদের ঐ ধূমবাহিত নিকোটিন ও কার্ব মনক্সাইড অধিক বিষাক্তদের তোলে। পরবর্তী কালে তারা নিজ অজান্তে বিভিন্ন রোগের শিকারে পরিণত হয়। সুতরাং বাসে, ট্রেনে, কিংবা অধূমপায়ী ব্যক্তির সম্মুখে ধূমপান করা একটা সামাজিক অপরাধ, রোগের হাত থেকে বাঁচতে হলে এই অপরাধীদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে।

সপ্তম অধ্যায়

ব্যাধিতে হাইপ্রেসারের প্রভাব

হাইপ্রেসার নিজে কোন ব্যাধি নয়, অন্য ব্যাধির উপসর্গ মাত্র। বহুবিধ ব্যাধির সঙ্গে এর একটা বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। যে বিশেষ বিশেষ ব্যাধিতে এই উপসর্গটির আধিক্য ঘটে ঐ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হলে এই উপসর্গটির প্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। কোন কোন ব্যাধিতে এই উপসর্গটির প্রভাব এতই ভয়ানক যে যেকোন মুহূর্তে তা প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং বিশেষ বিশেষ ব্যাধিতে রক্তচাপের প্রভাব সম্পর্কে একটি সামান্য ধারণা থাকা চিকিৎসকগণের তো বটেই সাধারণ মানুষের মধ্যেও অবশ্যই উচিৎ।

কিডনির প্রদাহ বা পুরাতন নেফ্রাইটিস রোগে সিষ্টোলিক প্রেসার ২০০ মিলিমিটার বা তার থেকেও অনেক বেশী হতে দেখা যায়, কিন্তু ডায়াষ্টোলিক প্রেসার কমে যায়। নাড়ির চাপ (Pulse Pressure) ৬০ থেকে ৮০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল পুরাতন প্যারেঙ্কিমাস কিডনি প্রদাহে (Parenchymatous nephritis) যার সঙ্গে এলবুমিনুরিয়া (Albuminuria) এবং শোথ লক্ষণ বর্তমান থাকে সেখানে ব্লাড প্রেসার অনির্দিষ্ট। কমও হতে পারে বেশীও হতে পারে, অনেক সময় স্বাভাবিক ও থাকে।

বৃদ্ধ বয়সে ধমনীর অবপতনিক পরিবর্তনে (arterio sclerosis) রক্তের সিষ্টোলিক প্রেসার বেড়ে যায় ১৪৫ থেকে ১৮০ পর্যন্তও হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও লক্ষ্যণীয় বিষয় হল সিষ্টোলিক প্রেসারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ডায়াষ্টোলিক প্রেসার কিন্তু সমানুপাতিক হারে বাড়ে না, (৯০ থেকে ১২০ মিলিমিটার)। তাই নাড়ির চাপ অসম্ভব রকম বেড়ে যায় ৬০ বা তার থেকেও অধিক হয়।

সন্ন্যাস রোগ, মস্তিষ্কের থ্রম্বোসিস (Cerebral thrombosis) মস্তিষ্কের অস্থিভঙ্গ, মাথার মধ্যে রক্তস্রাব, মস্তিষ্কে টিউমার ইত্যাদি মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় রোগে Blood Pressure সবচেয়ে বেশী হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে সিষ্টোলিক প্রেসার ৩০০ থেকে ৩৫০ বা আরও অধিক

এবং ডায়াষ্টোলিক প্রেসার ১৫০ বা তারও উর্দ্ধে উঠতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে নাড়ি ধীরগতি বিশিষ্ট হয়, ইউরিমিয়ায় রক্তের চাপ ২৯০ মিলিমিটার পর্যন্ত উঠতে পারে।

হাইপ্রেসারে বেশীরভাগ রোগীর মৃত্যুর কারণ সন্ন্যাস রোগ। এই রোগে ধমনীগাত্র শক্ত ও ভঙ্গুর হয়। মস্তিষ্কের রক্তবাহীনাড়িসমূহে রক্তাধিক্য দেখা যায়। এই প্রকার রক্তাধিক্যতা বশতঃ মস্তিষ্কে রক্তবাহীনাড়ী ছিঁড়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ সন্ন্যাসের মুখ্য কারণ। করোনারী থ্রম্বোসিসও একটি প্রাণঘাতী রোগ। বহু মানুষকে অপরিণত বয়সে এই রোগে প্রাণত্যাগ করতে হয়। এই রোগটি হাইপ্রেসারের পরিণতি এবং সন্ন্যাসের মূল হেতু বলা যেতে পারে। মস্তিষ্কের কোনস্থানে রক্তবাহী নালীতে যেমন রক্তসঞ্চালনক্রিয়ার বৈষম্য; অনুরূপ রক্তের জমাট বাঁধা অবস্থাকে বলে থ্রম্বোসিস। মানবের সুস্থ এবং জীবিত অবস্থায় রক্ত তরলাকারে শিরা উপশিরার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। যদি কোন কারণে ঐ রক্ত দলা (Clot) বেঁধে যায় তবে ঐ জমাট অবস্থাকে থ্রম্বোসিস বলে। এরূপ ক্ষেত্রে রক্ত দলা বাঁধার ফলে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায়। এতে সঞ্চালনকারী যন্ত্রের যথা হৃৎপিণ্ড, ধমনী, শিরা, উপশিরা যে কোন স্থানে থ্রম্বোসিস হয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আর্টারী বা ধমনীর থ্রম্বোসিসই ঘটতে দেখা যায়। হার্ট নিজে যাবতীয় ধমনী, শিরা, উপশিরা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে রক্ত সঞ্চালন করে সমস্ত শরীরের পুষ্টিবিধান করে থাকে। কিন্তু হার্টের নিজের মাংসপেশীর পুষ্টিসাধন করে যে সকল ধমনী তাকে বলে করোনারী আর্টারী। হাইপ্রেসার কিংবা অন্য কোন ব্যাধিজনিত কারণে যদি করোনারী আর্টারীর মধ্যের রক্ত চলাচলের পথ আস্তে আস্তে সংকীর্ণ হয়ে এবং রক্ত দলা বেঁধে হঠাৎ পথটি বন্ধ হয়ে যায় তবে হঠাৎই রোগীর মৃত্যু ঘটে।

হাইপ্রেসার রোগীদের সাধারণতঃ যে সমস্ত হার্টের রোগগুলোতে কষ্ট পেতে হয় তা হল :—

১) Endocarditis (হৃদযন্ত্রের অন্তর্প্রদাহ)
২) Valvulitis (হৃদযন্ত্রের কপাট প্রদাহ)
৩) Myocarditis (হৃদযন্ত্রের পেশীর তরুন প্রদাহ)
৪) Hypertrophy (হৃদযন্ত্রের বিবৃদ্ধি)
৫) Dilatation (হৃদযন্ত্রের প্রসারণ)

হাইপ্রেসারে হার্টের করোনারী ধমনীর ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। যদিও হার্টের এরূপ অবস্থা হার্টের সাধারণ মেদ বৃদ্ধিতে যেমন হৃদপেশীর অপকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। কিংবা অতিরিক্ত মদ খাওয়া, ক্যানসার, টি. বি. ইত্যাদি আক্রমণের দ্বারাও যেমন করোনারী ধমনীর ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে অনুরূপ হাইপ্রেসারের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ মানুষের হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া এবং নাড়ি সুস্থ হলে রোগাক্রান্ত হলেও তার জ্ঞান অবিকৃত থাকে, অতিরিক্ত ঘাম এবং শ্বাসকষ্ট হয়, সেই সঙ্গে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, পেটে যন্ত্রণা, কখন কখন বমি ও বমির ভাব, বক্ষাস্থিতে (Sternum) বেদনা ভীষণভাবে

দেখা দেয়, এবং তা পেট পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়, বেদনা দুইদিকের কাঁধ বেয়ে হাত পা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হতে দেখা যায়। বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা বোধ হয়, তা হঠাৎই প্রকাশ পায় এবং তা এত তীব্র এবং প্রবল আকার ধারণ করে যে সহ্যসীমা অতিক্রম করে যায়। অবশ্য এই রোগের আক্রমণস্থল হল প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ বয়সের মানুষ।

হাইপ্রেসারের রোগীদের আর একটি ব্যাধিতে ভুগতে হয় তা হল embolism (এমবলিজম্)। শরীরস্থ প্রবহমান রক্তের মধ্যে রক্তের দলা অথবা শরীরের অন্য কোন স্থানে রোগ থেকে উৎপন্ন টিসু মস্তিষ্কের রক্তনালীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রক্তের প্রবাহকে রোধ করে। এই অবস্থাকে এমবলিজম বলে। হার্টের ক্রিয়া ব্যাঘাতের ফলেই সাধারণতঃ এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

আর একটি উপসর্গ হৃৎশূল (angina pectoris)। এতে প্রথমে সামান্য বক্ষলক্ষণ দেখা দেয়। বক্ষাস্থির নিচে টান টান ভাব, পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট, খাওয়ার পর উদগার এবং হাইপ্রেসার (১৮০ বা তার থেকেও অধিক) ইত্যাদি লক্ষণগুলি দেখা দেয়। হৃৎপিণ্ডের পুরাতন বিবৃদ্ধিতে সিষ্টোলিক ও ডায়াষ্টোলিক উভয় চাপই বেড়ে যায়। সিষ্টোলিক ১৪০ থেকে ১৬০ এবং ডায়াষ্টোলিক প্রেসার ৮০ থেকে ১১০ মিলিমিটার মত হয়।

অষ্টম অধ্যায়

বিপদজনক হাইপ্রেসার (Malignent Hypertension)

হাইপ্রেসারকে সাধারণভাবে দুইটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। ১) সাধারণ হাই প্রেসার (Benign Hypertension) এবং ২) বিপদজনক হাইপ্রেসার। (Malignant Hypertension)।

১) সাধারণ হাইপ্রেসার (Benign Hypertension) ঃ—অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কোন কোন রোগী সুদীর্ঘ্যকালব্যাপী হাইপ্রেসারে ভুগলেও তাদের কোন কষ্টকর উপসর্গ দেখা দেয় না। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তারা নির্বিঘ্নে সুস্থ মানুষের ন্যায়ই জীবন কাটিয়ে যায়। এমনকি কারও কারও ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে রোগী মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জানতই না যে সে এত হাইপ্রেসারে ভুগছিল। হাইপ্রেসারের এরূপ অবস্থাকে সাধারণ হাইপ্রেসার (Benign Hypertension) বলা হয়ে থাকে।

২) বিপদজনক হাইপ্রেসার (Malignant Hypertension) ঃ—যদি সাধারণ হাইপ্রেসারের সাথে এই লক্ষণগুলো বর্তমান থাকে তবে তাকে বিপদজনক হাইপ্রেসার বলা হয়। এই প্রকার প্রেসার অতি ভয়াবহ এবং এর ভাবী ফল অত্যন্ত অশুভ। এই লক্ষণগুলো দেখা দিলে প্রথম থেকেই সচেতন এবং সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, তা না হলে যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। লক্ষণগুলো হল—

ক) হাইপ্রেসারের সঙ্গে ডায়াষ্টোলিক প্রেসার অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষণটি উপস্থিত থাকবে, অন্তত ১৬০ মিলিমিটার কিংবা আরও অধিক।

খ) কিডনির ক্রিয়া বিকৃতি লক্ষণ (নেফ্রাইটিস বা অন্যকোন মূত্রসংক্রান্ত উপসর্গ) বর্তমান থাকবে।

গ) প্যাপিলিডিমা অর্থাৎ দৃষ্টি স্নায়ুমুখে শোথ লক্ষণ বর্তমান থাকবে।

ঘ) হৃৎযন্ত্রের স্থায়ী বিকৃতি জনিত কোন উপসর্গ বর্তমান থাকবে।

বিপদজনক হাইপ্রেসারে আক্রান্ত রোগের ভাবীফল অত্যন্ত অশুভ। উপসর্গবিহীন সাধারণ হাইপ্রেসারগ্রস্থ রোগী অনেক ক্ষেত্রেই বিনাকষ্টে এবং অনায়াসে মৃত্যু পর্যন্ত তার পূর্ণ আয়ুকাল ভোগ করে যেতে পারে। কিন্তু বিপদজনক হাইপ্রেসারগ্রস্থ রোগী অর্থাৎ মূত্রগ্রন্থি বা হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বিকৃতি লক্ষণযুক্ত হাইপ্রেসারের রোগী বিনা চিকিৎসায় বা অনায়াসে কখনও তার পূর্ণ আয়ু ভোগ করতে পারে না। বহু রোগী পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ করে দেখা গেছে যে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় কিংবা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা এরূপ রোগীকে দুই তিনমাসের অধিক বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু যথাযথ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা এবং নিয়মিত আসন মুদ্রাদি দ্বারা পরিচর্যায় এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। বহুক্ষেত্রে এই দুইটি উপায় অবলম্বনে এই রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে দেখা গেছে।

বিপদজনক হাইপ্রেসারে আক্রান্ত রোগীর ঝুঁকি

বিপদজনক হাইপ্রেসারগ্রস্থ রোগীদের সর্বদাই কিছু ঝুঁকি নিয়ে জীবনযাপন করতে হয়। ঝুঁকিগুলো কি তা আগে থাকতে জানা থাকলে ঐ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করলে হঠাৎ দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। ঝুঁকিগুলো হল ঃ—

১) হার্ট ফেল ঃ—রক্তের চাপ যখন বৃদ্ধি পায় তখন হার্টকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের সময় হার্টের শিরা উপশিরা মাংসপেশী ইত্যাদি বিস্তৃত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু রক্তের চাপ কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরাও আবার পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু বিপদজনক রক্তচাপে যেহেতু রক্তের সিষ্টোলিক চাপ কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সর্বদা এবং সর্বক্ষণের জন্যই ঐ বর্দ্ধিত চাপ বর্তমান থাকে সুতরাং হার্টের পেশী ও শিরা উপশিরা সমূহ বৃদ্ধি অবস্থা থেকে সামান্য সময়ের জন্যও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে না পারায় ঐ বিবৃদ্ধি স্থায়ীরূপ ধারণ করে। এর ফলে ঐ যন্ত্রসমূহ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় আহারে বিহারে অসংযম অসতর্কতা, মানসিক উদ্বেগ, ক্রোধ অশান্তি ইত্যাদি সামান্য উত্তেজক কারণে বর্দ্ধিত রক্তের চাপ আরও অধিক বৃদ্ধি পেলে ঐ পরিমান চাপ বহন ক্ষমতা ঐ দুর্বল হার্টের না থাকায় হার্ট যন্ত্রস্থ কোন অংশ ছিন্ন হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটায়। একেই আমরা হার্টফেল বলে থাকি।

২) রক্তবাহী নালীর কঠিনতা ঃ—আমাদের রক্তবাহী নালী স্বাভাবিক অবস্থায় অত্যধিক

প্রসারণ ক্ষমতা সম্পন্ন। উচ্চরক্তচাপ বিশিষ্ট রোগীর এই নালীসমূহের এই ক্ষমতা ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে। অথচ নালীসমূহের এইপ্রকার সম্প্রসারণ এবং সঙ্কোচন ক্ষমতা স্বাভাবিক জীবনযাপনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী কারণ অবস্থা এবং পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কে সজীব এবং কার্যক্ষম রাখতে কখনও কম বা কখনও অধিক পরিমানে রক্ত সরবরাহ করতে হয়। অল্প প্রবাহকালে রক্তবাহী নালীগুলো সঙ্কুচিত হয় আবার অধিক রক্তপ্রবাহকালে প্রসারিত হয়ে ফুলে ওঠে। যেমন কোনও মানুষ যখন খুব ভারী কোন কাজ করে তখন হার্টকে অধিক পরিমানে রক্ত যোগান দিতে হয়। এই কর্মের জন্য করোনারী নালীগুলো বিস্তৃত হয়ে ফুলে ওঠে। হাইপ্রেসার বা রক্তের চাপ বৃদ্ধির ফলে রক্তবাহী শিরা সমূহ সরু এবং শক্ত হয়ে থাকে, তার প্রসারণ এবং সঙ্কোচন ক্ষমতা কমে যায়। এরূপ সরু এবং শক্ত শিরা প্রয়োজনানুযায়ী অধিক পরিমানে রক্ত যোগান দেওয়ার জন্য যথাযোগ্যভাবে বিস্তৃত হতে পারে না। এরূপ করোনারী আর্টারী যখন দৈহিক পরিশ্রমের সময় হার্টকে অধিক পরিমানে রক্ত যোগান দেয় তখন যথাযোগ্যভাবে যদি বিস্তৃত হতে না পারে তবে একপ্রকার বুকের যন্ত্রণা (এঞ্জাইনা পেকটোরিস) নামক রোগের উৎপত্তি হয়।

৩) রক্তে চাপের আধিক্য থাকলে কিডনী যথাযথভাবে রক্তকে 'শোধিত করা' রূপ আপন কার্য পরিচালনা করতে পারে না। এর ফলে শরীরের বিষাক্ত ও দূষিত পদার্থ এবং লবন যথার্থ ভাবে বহির্গত হতে না পেরে দেহতেই উপস্থিত থাকে। এই বিষাক্ত পদার্থ এরপর দেহের তুলনামূলকভাবে দুর্বল কোন যন্ত্রে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়। যাদের হার্ট খুব বলশালী নয় তাদের হৃৎযন্ত্রে ঐ বিষ সঞ্চিত হয়। এর পরিনাম স্বরূপ স্ট্রোক, হার্টফেল ইত্যাদি দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

৪) দীর্ঘদিন যাবৎ হাইপ্রেসারের ফলে অনেক সময় আর্টারীর রক্তাধিক্যতা (Arteriolar inflammation) প্রকাশ পায়। এতে ধমনীগাত্রের কোষসমূহে পচন ধরে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই প্রকার অবস্থায় রক্তের চাপ ক্রমশ অধিক পরিমানে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মূত্রগ্রন্থি অকেজো হয়ে রোগীকে মৃত্যুমুখে পতিত করে।

৫) উচ্চরক্তচাপ গ্রস্থ মানুষের জীবনীশক্তির উপর নিয়তই চাপ পড়ার ফলে পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাদের আয়ু ক্রমশই কমে আসে। বহু পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ করে প্রমাণিত হয়েছে যে হাইপ্রেসারের রোগীদের মধ্যে অধিকাংশই স্বল্পায়ু এবং স্বাভাবিক এবং নিম্ন রক্তচাপ গ্রস্থ মানুষ সাধারণত দীর্ঘায়ু হয়ে থাকে। সুতরাং উচ্চরক্তচাপকে কখনও অবহেলা না করে এর যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য।

মৌলিকতানুসারে হাইপ্রেসারের শ্রেণীবিভাগ

মৌলিকতা অনুসারে হাইপ্রেসারকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, মৌলিক হাইপ্রেসার বা (Idiopathic Hypertension) এবং অমৌলিক হাইপ্রেসার (Secondary Hypertension)।

মৌলিক হাইপ্রেসার (Idiopathic Hypertension)

যে হাইপ্রেসারের সুনির্দিষ্ট কোন কারণ জানা যায় না কিন্তু রোগীর মানসিক, দৈহিক এবং সার্বিক লক্ষণ সমষ্টির মাধ্যমে ব্যক্ত হয় তাকে মৌলিক হাইপ্রেসার বলা হয়। এটা ধাতুগত রোগ। মানুষের দেহটাই যে একমাত্র চরম এবং শেষ অবস্থা নয় তা এর মাধ্যমে বেশ উপলব্ধি করা যায়। দেহটার যে পরিচালক আছে একথা হ্যানিম্যান সাহেবও পুনঃ পুনঃ বলে গেছেন। জীবনীশক্তি, মানসিকতা ইত্যাদি দ্বারা জড়দেহ পরিচালিত হয়। একজন মানুষের শৈশব অবস্থায়ই তার মানসিক লক্ষণাবলী যথাযথরূপে বিচার বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় যে সে পরবর্তীকালে হাইপ্রেসারের শিকার হবে কিনা অবশ্য অচেতন মনের লক্ষণাবলী তার বংশানুক্রমিক ধারা থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে। এটা কিন্তু কোন একটি নির্দিষ্ট কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হাইপ্রেসার নয়। এর পেছনে যে মৌলিক কারণ থাকে তা হল তার আত্মিক স্তরের বিশৃঙ্খলা। এই মৌলিক বিশৃঙ্খলাবোধই পরবর্তীকালে জড়দেহে বাহ্যিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

মৌলিক রক্তচাপ বৃদ্ধিগ্রস্থ রোগীদের প্রাথমিক অবস্থায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে দেখা গেছে যে তাদের হার্টের ক্রিয়াগত বা গঠনগত কোনপ্রকার বিকৃতি পাওয়া যায় না। এর দ্বারা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে রোগটি তখনও সুপ্তস্তরে মানসিকভাবে আড়ালে বসে কাজ করে যাচ্ছে এখনও বহিঃপ্রকাশ ঘটে নি, কিন্তু দীর্ঘ্যকাল এরূপ চলতে থাকলে যান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটাবে। অতিরিক্ত ক্রোধ, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ইত্যাদি মানসিক চাঞ্চল্য সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র তথা এড্রিন্যালিন অন্তস্রাবী গ্রন্থিকে উত্তেজিত করে। এই এড্রিন্যালিন গ্রন্থিরস উপধমনীর ক্রিয়াগত সঙ্কোচনের জন্য দায়ী, উপধমনীর ক্রিয়াগত সঙ্কোচন থেকে ক্রমশ গঠনগত সঙ্কোচন ঘটে। এর ফলেই ক্রমশ স্থায়ী রক্তচাপের সৃষ্টি হয়। সুতরাং পূর্বজন্ম বা এইজন্মকৃত পূর্ব পূর্ব কর্ম অনুসারে সুপ্তমনের অবচেতন মনে স্থিত সংস্কারই যথাসময়ে ক্রোধ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি আকারে প্রকাশিত হয়ে এড্রিন্যালিন গ্রন্থির উত্তেজনা ঘটিয়ে ধমনী উপধমনীর ক্রিয়াগত সঙ্কোচন এবং পরে গঠনগত সঙ্কোচন ঘটিয়ে স্থায়ী হাইপ্রেসারের কারণ হয়। প্রথম থেকেই যদি এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা যায় তবে অদূর ভবিষ্যতে আগত ব্যাধিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। যথাসময়ে প্রতিকার না করলে একটি দুষ্টচক্রের মধ্যে পতিত হয়ে রোগীকে ক্রমশই হাবুডুবু খেতে হয়। দুষ্ট চক্রটি কিভাবে কাজ করে তা দেখাচ্ছি।

উপধমনীগুলির ক্রিয়াগত সঙ্কোচন থেকে উদ্ভুত হাইপ্রেসার বেশীদিন স্থায়ী হলে কিডনির একপ্রকার বিকৃতি ঘটায়। ঐ বিকৃত কিডনি একপ্রকার Enzyme বা রস সৃষ্টি করে যাকে 'রেনিন' বলে। এই রেনিন এর প্রধান কাজই হল রক্তের চাপকে বৃদ্ধি করা এবং

উপধমনীগুলির প্রাচীরগাত্রের বিকৃতি (Arteriolosclerosis) সৃষ্টি করা। এইভাবেই একটি পরস্পর পরস্পরকে বৃদ্ধিকারী দুষ্টচক্রের (Vicious Cycle) সৃষ্টি হয়। যেমন প্রথমে মানসিক উত্তেজনা এর থেকে বৃদ্ধি পায় উপধমনীগুলির ক্রিয়াগত সঙ্কোচন এর ফলে সৃষ্টি হয় উপধমনীগুলির গঠনগত সঙ্কোচন এর থেকে সৃষ্টি হয় কিডনি কর্তৃক 'রেনিন' স্রাব এর ফলে উপধমনীগুলির আরও সঙ্কোচন সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে আরও গঠনগত সংকীর্ণতা সাধন হয় এর ফলে হয় আরও অধিক পরিমানে রেনিন স্রাব এর ফলে হয় ধমনীগুলির বিকৃতি বৃদ্ধি। সুতরাং মৌলিক হাইপ্রেসারের প্রধান কারণ যে আত্মা বা মানসিক স্তরের বিকৃতি, তা যদি সংশোধন করা না যায় তবে একবার এই দুষ্টচক্রে পতিত হলে আর রক্ষার উপায় থাকে না।

মৌলিক হাইপ্রেসারের বিকৃতির লক্ষণ

মৌলিক হাইপ্রেসারে এরূপ বিকৃতি বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া সত্বেও এমনকি ২৩০/১৩০ বা আরও অধিক হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে রোগীর দেহে কোনও সুস্পষ্ট লক্ষণই পাওয়া যায় না। রোগী বেশ স্বচ্ছন্দেই বিচরণ করে, নিজে কিছু অনুভবই করে না। প্রেসার চেক করলে ধরা পড়ে। তবে এই বিকৃতির সাধারণ লক্ষণ গুলো এখানে জানাচ্ছি, এগুলো কারও কারও ক্ষেত্রে প্রকাশ পেতে দেখা যায়।

১) মন ঃ—এই প্রেসারে আক্রমণের প্রথমদিকে মানসিক বিরাগ বিরক্তি প্রবণতা এবং ক্রোধ প্রবণতা দেখা দেয়। ক্রমে চিন্তা করার শক্তি ও স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা দেখা দিয়ে থাকে।

২) মস্তক ঃ—রোগাক্রমণের প্রথম থেকেই ঘন ঘন মাথা ব্যথা, মাথার পেছনে ঘাড়ের দিকে ভারী ভারী ভাব মাঝে মাঝে মাথা ঘোরা প্রভৃতি দেখা যায়।

৩) ঘুম ঃ—অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিদ্রাহীনতা লক্ষণ প্রকাশ পায়। নানাপ্রকার চিন্তার জন্য ঘুম আসতে দেরী হয়। ঘুম অকারণে বারে বারে ভেঙে যায়। গাঢ় ঘুম হয় না, ঘুম ক্রমশ হাল্কা হয়ে যায়।

৪) অন্য লক্ষণ ঃ—অলসতা, কর্মে অনিহা, সহজেই ক্লান্তিবোধ ইত্যাদি লক্ষণগুলোও কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা দেয়। তাছাড়া ক্রমশ অল্প পরিশ্রমেই বুকে কষ্ট, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি লক্ষণগুলোও কোন কোন ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়।

মৌলিক হাইপ্রেসারের গুরুত্ব নির্ধারণ

হাইপ্রেসারের গুরুত্ব নির্ধারনের জন্য কিডনির ক্রিয়া পরীক্ষা (Renal Function test) হার্টের ক্রিয়া পরীক্ষা (Cardiography) এবং অক্ষিপটের পরীক্ষা (Retinoscopy) করা আবশ্যক।

মৌলিক হাইপ্রেসারে এই লক্ষণগুলি প্রথমদিকে সবিরামভাবে অর্থাৎ মাঝে মাঝে

উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। কোন উত্তেজক কারণে প্রথম প্রথম দেখা দেয় অর্থাৎ ঐ কারণটি বিদূরিত হলে পুনরায় কমে যায়। মানসিক উত্তেজনা, শারীরিক শ্রম, ঠাণ্ডা লাগা, গরম লাগা প্রভৃতি কারণে ঐগুলির আবির্ভাব ঘটে। পরে ক্রমশ এই লক্ষণগুলি লাগাতার ভাবেই দেখা দেয়। তখন আর সবিরাম থাকে না, অর্থাৎ উত্তেজক কারণ ছাড়াই লক্ষণগুলো বর্তমান থাকে।

মৌলিক প্রেসারে অধিক দিন ভুগলে অধিকাংশ রোগীই হৃৎযন্ত্রের বৈকল্যের জন্য (Coronary thrombosis Cardiac failure) মৃত্যু ঘটে থাকে। কিছু কিছু রোগী আবার এই রোগে অধিক দিন ভুগলে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে (Cerebrovascular or Cerebral thrombosis) প্রাণত্যাগ করে। স্বল্পসংখ্যক মানুষের মৃত্যু কিডনির বৈকল্যের (Renal Failure) জন্য ঘটে থাকে।

অমৌলিক হাইপ্রেসার (Secondary Hypertension)

শরীরের কোন যান্ত্রিক বিকৃতীর ফলে যে হাই প্রেসার হয়, কিংবা যে প্রেসারে কোননা কোন যান্ত্রিক বিকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় তাকে অমৌলিক হাইপ্রেসার বলে। আসলে এইসব যান্ত্রিক বিকৃতি রক্তনালীর মধ্যে রক্ত চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই বাধা অতিক্রম করে শরীরে রক্ত চলাচল ক্রিয়া চালু রাখার প্রয়োজনেই রক্ত চাপের বৃদ্ধি ঘটে। এটা কিন্তু ঈশ্বর দত্ত আশীর্বাদ বলা যায়। কারণ যখন কোন যান্ত্রিক বিকৃতি ঘটে তখন যদি রক্তের চাপ পূর্ববতই থাকত তবে রক্ত চলাচল ক্রিয়া বন্ধ হয়ে জীবের তাৎক্ষনিক মৃত্যু ঘটত। তাই এই অমৌলিক হাইপ্রেসারের রোগীকে চিকিৎসা করার সময় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা উচিৎ যে যান্ত্রিক বিকৃতি ঘটেছে সেগুলি যাতে নিরাময় হয় তার দিকে সতর্কতা অবলম্বন করা। তা না করে শুধুই রক্তচাপ হ্রাস করার চেষ্টা করলে রোগীর শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়ার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ ব্যহত হয়ে রোগীর জীবন সংশয়াপন্ন হতে পারে। যে সব যন্ত্রের বিকৃতির জন্য অমৌলিক হাইপ্রেসার হতে পারে তার মধ্যে প্রধান প্রধান যন্ত্রসমূহ হল ১) ধমনীর পীড়া ২) মহাধমনীর পীড়া ৩) প্রষ্টেট গ্রন্থির পীড়া ৪) অন্তরসক্ষরণকারী গ্রন্থির পীড়া যেমন—পিটুইটারী গ্রন্থির অর্বুদ, এড্রিনাল গ্রন্থির অর্বুদ ইত্যাদি।

হাইপ্রেসারের উপসর্গ (Complications of Hypertention)

ক) হার্টের বিকৃতি (Disorder of Heart) ঃ হাইপ্রেসারে অত্যাধিক চাপের বিরুদ্ধে পাম্প করে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া চালু করতে গিয়ে হার্টের মাংসপেশী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরূপ ভাবে হার্টের মাংসপেশী বৃদ্ধির প্রাথমিক অবস্থাকে বলা হয় পরিপূরিত অবস্থা (Compensated phase)। এরূপ অবস্থায় সামান্য চাপের কাজ করলেই শ্বাস কষ্ট হতে দেখা যায়। কিন্তু বিশ্রাম করলে উপশম হয়। এই অবস্থা ক্রমশঃ চলতে থাকলে হার্ট যখন ক্রমশ অধিক বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তাকে অপরিপূরিত অবস্থা বলে। অপরিপূরিত

অবস্থায় বিশ্রামেও শ্বাস কষ্টের আক্রমন ঘটে। এরূপ অবস্থারও পরে হার্টের সঙ্কোচনের তাল বিকৃত হয় ফলে এই তাল পর্যায়ক্রমিক (Pulsus alternans) অথবা ত্রিত্ব প্রাপ্ত (Triple Rhythm) হয়। যদি কোন রোগীতে এরূপ পর্যায়ক্রমিক বা ত্রিত্ব প্রাপ্ত হার্টের বিট (তাল) লক্ষ্য করা যায় তবে তা সেই রোগীর ভাবীফল অশুভ বলে চিন্তা করতে হবে।

খ) ব্রেনে রক্তসঞ্চালনে বিঘ্ন (Hypertensive Encephalopathy) ঃ—দীর্ঘকাল হাইপ্রেসারে ভুগলে বা হাইপ্রেসারের হঠাৎ আক্রমনে মস্তিষ্কের স্থানে স্থানে উপধমনীগুলির সঙ্কোচন ঘটে, কিংবা রক্তবাহী নালীগুলির মধ্যে রক্ত জমাট (thrombosis) বেঁধে, অথবা কখনও কখনও দুই একটি ছোটখাটো কৈশিক রক্তনালীর দেওয়াল ফেটে রক্তস্রাব ঘটিয়ে ঐ সবস্থানের সাময়িক রক্তশূন্যতা সৃষ্টি করে। এই অবস্থাকে বলা হয় Acute focal cerebral ischaemia)। তার ফলে সাময়িক সংজ্ঞালোপ, সন্ন্যাস রোগ, হঠাৎ কিছু সময়ের জন্য অন্ধতা, সাময়িক বাক্শক্তি লোপ, নানারূপ স্থানীয় পক্ষাঘাত ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

গ) চোখে রক্তাধিক্যতা ঃ—হাইপ্রেসারে অনেক সময় চোখে রক্তক্ষরণ হয়ে জমে থাকতে দেখা যায়। চোখের শ্বেত অংশ মধ্যে গাঢ় লাল রক্তপাতের লক্ষণ দেখা যায়, এই উপসর্গ দেখতে ভয়াবহ হলেও আসলে এর গুরুত্ব কম। এর প্রধান গুরুত্ব হাইপ্রেসারের একটি অন্যতম ইঙ্গিত হিসাবে। এরূপ রোগী এলেই হাইপ্রেসার রয়েছে বলে কল্পনা করা উচিৎ।

দীর্ঘকাল হাইপ্রেসারে ভুগলে চোখে রক্তাধিক্যতা বশত দৃষ্টিশক্তির হ্রাস অনেক ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এরূপ ঘটে অক্ষিপটের (Retina) মধ্যস্থ উপধমনীগুলির বিকৃতির জন্য। এই অবস্থা প্রথমে মাঝে মধ্যে প্রকাশ পায়। কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ক্রমশ এটা লাগাতারই হতে থাকে এবং ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে বৃদ্ধি পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত অন্ধত্বে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আসলে দৃষ্টিশক্তির এইসব বিকৃতি ঘটে অক্ষিপটের বিকৃতির জন্য। এগুলোর প্রথম অবস্থায় প্রায় কোন লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যায় না। ক্রমশ তা আত্মপ্রকাশ লাভ করে এবং বাড়তে থাকে। কিছুদিনের মধ্যে যখন দৃষ্টি স্নায়ুমুখে (Optic disc) শোথ দেখা দেয় তখন দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের বা সম্পূর্ণ লোপের সম্ভাবনা ঘটে।

ঘ) কিডনীর বিকৃতি ঃ—হাইপ্রেসারে কিডনীর ওপর চাপ পড়ায় কিডনির ক্রিয়া বিকৃতি এবং পড়ে গঠনিক বিকৃতি ঘটে। রোগীর যদি বহুমূত্রের লক্ষণ দেখা দেয় বিশেষ করে যদি দেখা যায় যে রোগী দিনের বেলায়ও বারে বারে প্রস্রাব করছে তবে কিডনীর ক্রিয়া বিকৃতি সম্বন্ধে সন্দেহ করা উচিৎ এবং এই বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। অন্যথায় কিডনী সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক পরিমানে বর্তমান।

নবম অধ্যায়

হাইপ্রেসারের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

হাইপ্রেসার একটি ধাতুগত রোগ। হোমিওপ্যাথিক দৃষ্টিকোন্ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে চিররোগ বিষশক্তি (Chronic Miasm) তিনটিই এই রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। তার মধ্যে আবার অপেক্ষাকৃত প্রধান হিসাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় সোরা এবং সিফিলিসের নিবিড় এবং পুরুষানুক্রমিক সংযোগ। তাই এই রোগের মুখ্য কারণ ঘটিত বিকৃতিগুলি উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ অবস্থায় না এনে পৃথকভাবে রক্তচাপ হ্রাসকারী ভেষজের (Hypotency drugs) দ্বারা রক্তচাপ কমাবার ব্যবস্থা করতে গেলে ঐ ওষুধের প্রয়োগ চিরকাল ধরেই চালিয়ে যেতে হবে। এইভাবে লক্ষণবিরোধী (Contraria Contraribus) চিকিৎসা যতই চালিয়ে যাওয়া যাবে, কারণ ঘটিত বিকৃতিগুলির শক্তি ততই অধিক পরিমানে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এর ফলে রক্তহ্রাসকারী ভেষজের মাত্রাও সেই অনুপাতে ক্রমশ বৃদ্ধি করেই যেতে হবে এবং শেষপর্যন্ত বিপদজনক পরিমানে মাত্রা প্রয়োগ করেও আর ঐ প্রেসার হ্রাস করা সম্ভব হবে না। তখন আবার অন্য একটা আরও শক্তিশালী প্রেসার হ্রাসকারী ভেষজ প্রয়োগের প্রয়োজন হবে। এইভাবে রোগীকে একমাত্র ওষুধেই ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং যতক্ষণ না রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রমবর্দ্ধমান পরিমানে এবং ক্রমশক্তিসম্পন্ন ভেষজ প্রয়োগ করেই যেতে হবে। সুতরাং হাইপ্রেসার রোগ থেকে প্রকৃতই মুক্তি পেতে হলে যথাযথ হোমিওপ্যাথিক ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করতেই হবে।

হোমিওপ্যাথিক মতে কোনও ভেষজই শুধু একটিমাত্র লক্ষণ বা বিকৃতির উপর ক্রিয়া করে না, তা ক্রিয়া করে সম্পূর্ণ মানুষটির ওপর। একই রোগে একটি ওষুধ ক্রমাগত প্রয়োগ করে গেলে বা একই রোগের বিভিন্ন ভেষজ দ্বারা হ্রাস ঘটালে তার রি-একশন আছেই আছে। দীর্ঘকাল ব্যবহৃত রক্তচাপ হ্রাসকারী ওষুধ রোগীর উপর ক্রিয়া করে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, যাকে বলা হয় আনুষঙ্গিক ফল বা Side Effect, এবং এরূপ চলতে থাকলে কিছুকালের মধ্যেই এইসব Side effect গুলি রোগীর রোগ একেবারেই অসাধ্য করে তুলবে।

অন্যান্য লক্ষণের ন্যায় হাইপ্রেসারও একটি অন্যতম লক্ষণ কিন্তু একমাত্র লক্ষণ নয়। একটিমাত্র লক্ষণকে কেন্দ্র করে ওষুধ প্রয়োগ করা একটি গর্হিত কাজ। অন্য কোন প্রকার কষ্টকর উপসর্গ বা লক্ষণ না থাকলে কেবলমাত্র হাইপ্রেসারের জন্য যে বিশেষ কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নাই তা বেশ ভালোভাবেই অনুধাবন করা যায় এই দেখে যে বহু হাইপ্রেসার গ্রস্থ (অস্বাভাবিক হাই) ব্যক্তি বিনা চিকিৎসাতেই নিরুপদ্রবে দীর্ঘ কর্মময়

জীবনযাপন করে পূর্ণ আয়ুষ্কাল ভোগ করে স্বাভাবিকভাবেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিন্তু যারা বিভিন্ন প্রকার ভেষজ দ্বারা রোগ আরোগ্যের বৃথা চেষ্টা করেন তাদের প্রায় সকলকেই দেখা যায় রোগ ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করে প্রত্যহই বিভিন্ন উপসর্গে ভুগে স্বল্প আয়ুষ্কাল মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং একদেশদর্শীভাবে শুধু হাইপ্রেসারের চিকিৎসা করা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু বর্তমানে বাস্তবজগতে দেখা যাচ্ছে অজ্ঞতাবশতই হোক আর 'জ্ঞানপাপী'র দরুনই হোক কোন শুধু হাইপ্রেসারের চিকিৎসার Specific ওঁষুধ আমরা নিজেরাই গড়ে নিয়েছি। এলোপ্যাথিক মতে প্রতিনিয়ত এর যথেচ্ছাচার তো চলছেই, এমনকি চলছে হোমিওপ্যাথিতেও। শুধু 'হাইপ্রেসার' এইটিকে লক্ষণ ধরে দিনের পর দিন রাওলফিয়া, প্যাসিফ্লোরা গ্লোনয়েন ইত্যাদির যথেচ্ছ প্রয়োগ আমি নিজে যত্রতত্র চাক্ষুষ দেখেছি। এর সুসমাধান প্রয়োজন।

প্রকৃত হোমিও পদ্ধতিতে ভেষজ প্রয়োগই হবে এর প্রকৃত সু-সমাধান। রোগীর ব্যক্তিগত সমগ্র বাস্তবতা ভিত্তিক চিকিৎসা করলে, অর্থাৎ তার পরিবেশগত এবং অভ্যাসগত যে ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো রয়েছে তা যথোপযুক্ত সংশোধন করে, তার পছন্দ অপছন্দ হ্রাস-বৃদ্ধি, চরিত্রগত লক্ষণ প্রভৃতি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক তথ্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি রেখে এবং অতীত ইতিহাস এবং পারিবারিক ইতিহাস সংগ্রহ করে সমগ্র লক্ষণ সমষ্টির উপর ভিত্তি করে সমলক্ষণান্বিত ওষুধ উপযুক্তমাত্রা এবং পদ্ধতিতে প্রয়োগ করলে অস্বাভাবিক হাইপ্রেসার এবং তার আনুষঙ্গিক উপসর্গগুলো ধীরে ধীরে এবং স্থায়ীভাবে সমতার দিকে ফিরে আসবে।

এখানে উচ্চরক্তচাপ বিশিষ্ট রোগীদের ব্যক্তিগত লক্ষণ যে প্রকারের হয়ে থাকে তার নিকটতম লক্ষণগুলো যে ওষুধে রয়েছে তা উল্লেখ করছি, হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকাতে এরকম ওষুধ প্রচুর সংখ্যায় আছে। হাইপ্রেসারের জন্য উপযুক্ত ওষুধ আমাদের এখানে প্রদত্ত ওষুধগুলির মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ নয়, একথা সর্বদাই স্মরণে রাখতে হবে। এমনকি যে কোনও মেটিরিয়া মেডিকাতে যে আরও বৃহৎ বৃহৎ তালিকা আছে তাদের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। যে কোনও রোগে যে কোনও অবস্থার জন্য ওষুধ সর্বদাই নির্ধারিত হবে রোগীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্বলিত লক্ষণ সমষ্টি দ্বারা। এইভাবে যথার্থরূপে সুনির্বাচিত ওষুধ প্রয়োগে শুধুমাত্র যে রোগীর হাইপ্রেসারই দূর করবে তা নয় রোগীর ধাতুগত পরিবর্তন ঘটিয়ে ভারসাম্যতা ফিরিয়ে আনবে।

যদিও হোমিওপ্যাথিক ওষুধ অসংখ্য তবুও এখানে কয়েকটি ওষুধের উল্লেখ করা হচ্ছে শুধুমাত্র এইজন্য যে এই প্রকার ওষুধগুলির লক্ষণাবলী প্রায়ই হাইপ্রেসারের লক্ষণযুক্ত অনেক রোগীতে দেখা যায়। এইসব ওষুধের যে ওষুধটির লক্ষণ কোন রোগীর লক্ষণের সঙ্গে মিলবে তা প্রয়োগ করার আগে তার সম্পূর্ণ চিত্র যে কোন বড়মাপের মেটিরিয়া মেডিকা থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারলে আরও অধিক সাফল্যলাভ করা সম্ভব হবে।

চিকিৎসা

Aconite Nap 2x ঃ—হাইপ্রেসারের প্রথম অবস্থায় এটি একটি নির্ভরযোগ্য ওষুধ। যদিও হোমিওপ্যাথিতে রোগের কোন স্থান নেই। রোগীই মূল বিবেচ্য তথাপি বিভিন্নভাবে এবং বহু রোগী পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ করে দেখা গেছে যে হাইপ্রেসারের প্রথম অবস্থায় যদি এই ওষুধটির বিশেষ লক্ষণগুলি পাওয়া যায় তবে প্রথমে 2x শক্তিতে এবং পরবর্তীকালে ২০০ একমাত্রা প্রয়োগে ভবিষ্যতে আগত ব্যাধিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে।

তরুণ অবস্থায় ক্ষেত্রবিশেষে এইটি বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, বিশেষত পূর্ণ দ্রুত ও সবল নাড়ি, শুষ্ক ও উত্তপ্ত গাত্র (dry and hot skin)। ধমনীর রক্তসঞ্চয় হেতু সন্ন্যাসের প্রথম অবস্থায় বিশেষ উপযোগী। ডাঃ বার্টলেট অ্যাকোনাইটের কার্যকারিতা সম্বন্ধে বলেন ঃ almost certainly have a beneficial effect.

রক্তপ্রধান ব্যক্তিগণের হৃৎপিণ্ডের বিবর্ধনের জন্য (dur to hypertrophy of the heart) যন্ত্রণা। হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপ, অস্থিরতা এবং উৎকণ্ঠা, শ্বাসকষ্ট, সবল, পূর্ণ কঠিন নাড়ি, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অপেক্ষা নাড়ির স্পন্দন অধিকতর দ্রুত, মানসিক উদ্বেগ, অস্থিরতা এবং মৃত্যুভয়, উষ্ণগৃহে রোগের বৃদ্ধি এবং বায়ুতে উপশম।

Aeglefolia 1x ঃ এই ওষুধটি আমাদের ভারতীয় বেলগাছ থেকে তৈরী হয়েছে। হাইপ্রেসার কমানোর ক্ষমতা এই ওষুধটির অসীম। এর প্রয়োগ লক্ষণ হল মোটা সবল এবং পরিপূর্ণ নাড়ি। এই ওষুধের বিশেষ লক্ষণ রক্তসঞ্চয়ের জন্য মাথাধরা, পেটফাঁপা, পেটডাকা এবং উচ্চ শব্দ করে বায়ু নিঃসরণ। অপরাহ্ন এবং সন্ধ্যার পরে চোখমুখ দিয়ে যেন আগুন বেরোতে থাকে। মাথাধরা, বেলা ৪টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত সমস্ত উপসর্গের বৃদ্ধি (লাইকোপোডিয়ামের মত)। এর অনেক লক্ষণ বেলাডোনার মত। বেলাডোনার পরিবর্তে অথবা বেলাডোনা প্রয়োগে ফল না পেলে উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে।

Agaricus 30 ঃ এই ওষুধটি বেঙের ছাতা থেকে তৈরী হয়েছে। অত্যন্ত মানসিক অবসাদ, রোগী গান করে, চীৎকার করে, খুব কথা বলে কিন্তু উত্তর দিতে চায় না, উদাসীন ভাব, কাজ করতে অনিচ্ছা। প্রবল মাথাধরা, মদ্যপানের কুফল। মাথাঘোরা বিশেষত রৌদ্র লাগাবার পরে। সর্বাঙ্গিক কম্পনের সঙ্গে পেশিসমূহের আকুঞ্চন, প্রসারণ এবং সর্বশেষে অবসাদ। দ্বিত্ব দৃষ্টি (Double vision)। চক্ষুর সম্মুখে মেঘ, কুয়াশা অথবা মাকড়সার জাল রয়েছে—এইরূপ মনে হয়।

Ammon Carb 30 ঃ হৃষ্টপুষ্ট, স্থূল উদর অথচ দুর্বল এরূপ রোগীর Blood Pressure এ উপযোগি। কপালে এবং মাথার তালুতে পূর্ণতাবোধ, মনে হয় ফেটে যাবে। অমনোযোগিতা এবং নিশ্চেষ্টতা, উপরে উঠবার সময়ে শ্বাসকষ্ট, শেষ রাত্রে ৩/৪টার সময়ে কাশি এবং অন্যান্য উপসর্গের বৃদ্ধি। হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ (dilatation of the

heart), হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি উপসর্গে ব্যবহৃত হয়।

যারা হৃষ্টপুষ্ট স্থূল অথচ দুর্বল, অধিক পরিশ্রম করতে পারে না, অলসভাবে জীবনযাপন করে তাদের পক্ষে এটি আরও অধিক কার্য্য করে।

Hyoscyamus Niger 200 ঃ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর উপর এর ক্রিয়ামুখ্য। মাথায় রক্তসঞ্চয়, মৃদু প্রলাপ ও অচৈতন্য। অসাড়ে মলমূত্রত্যাগ, রক্তচাপের মন্দ ফলহেতু রোগী অচৈতন্য হয় এবং অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ করে। ডাঃ জার এই অবস্থার কথায় বলেন যে এই সকল লক্ষণে এটা প্রায় অব্যর্থ। হস্ত, পদ বা সমস্ত দেহের পেশির স্পন্দন (general twitching of all the muscles of the body)। রোগী আলোক এবং লোকসংসর্গ পছন্দ করে না, সন্দিগ্ধচিত্ত এবং ঈর্ষান্বিত।

Glonoine 200 ঃ এটি হাই প্রেসার কমানোর একটি উৎকৃষ্ট ওষুধ। পর্যায়ক্রমে মাথা ও হৃৎপিণ্ডে রক্তাধিক্য। মাথা অস্বাভাবিক বড় বলে মনে হয়। মনে হয় মাথার খুলি এত ছোট যেন মস্তিষ্ককে স্থান দিতে পারবে না। অত্যন্ত দপ্‌দপ্‌কর শিরঃপীড়া, দুই হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরতে হয়। সমস্ত রক্তই যেন মস্তকে প্রবেশ করছে এইরূপ মনে হয়। গর্ভিণীদের রক্তচাপ এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য। রজোনিবৃত্তিকালে স্ত্রীলোকদের রক্তাবেগ।

প্রত্যেক বস্তুর অর্ধেক পরিষ্কার, অপরার্ধ অন্ধকার দেখা। হৃৎপিণ্ডের তীব্র স্পন্দন, দেহের যাবতীয় রক্ত যেন হৃৎপিণ্ডে ধাবিত হচ্ছে এইরূপ মনে হয়। প্রত্যেক স্পন্দন নিজের কানে শোনা যায়। হৃৎপিণ্ডস্থানে পূর্ণতাবোধ এবং চাপবোধরূপ বেদনা। নাড়ি দ্রুত এবং অনিয়মিত।

অত্যন্ত অবসন্নতা, কাজ করবার ইচ্ছা মোটেই হয় না। অত্যন্ত খিট্‌খিটে, রোগী সামান্য প্রতিবাদেই উত্তেজিত হয়। রোগী অতি পরিচিত রাস্তা ও ভুলে যায়। মাথাধরা সামান্য নড়াচড়াতে এমন কি প্রতি পদক্ষেপে এবং যে কোন উত্তাপে ও উষ্ণতায় বাড়ে। এইজন্য রোগী ঠাণ্ডা ঘরে চুপ করে বসে থাকে। দুই হাতে মাথা চেপে রাখলে ভালো বোধ করে।

ডাঃ বার্টলেট বলেন ঃ Cases in which the arterial tension is high and there is co-existing kidney disease. অর্থাৎ কিডনিসংক্রান্ত উপসর্গের সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপে এটা উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

সন্ন্যাসের উপক্রমে এবং সন্ন্যাসে এটা বিশেষ উপযোগী। বিশেষত অত্যধিক রৌদ্রভোগের পরে গ্লোনইন নিম্নশক্তি প্রয়োগে উচ্চ রক্তচাপ কমে আসে। এটা উচ্চ রক্তচাপের একটি ওষুধ। আধকপালে মাথাধরা (অর্ধশিরঃশূল)—সূর্যোদয়ের সঙ্গে আরম্ভ, সূর্যাস্তে নিবৃত্তি বিশেষত স্ত্রীলোকদের বয়ঃসন্ধিকালে। রজঃস্রাবসহ মাথাধরা। যারা সমস্ত গ্রীষ্মকাল মাথাধরায় কষ্ট পান, রৌদ্র কিংবা অগ্নির তাপ বা গ্যাসের আলোক মোটেই সহ্য হয় না, তাদের পক্ষে এটা বিশেষ উপযোগী। ডাঃ হেরিং বলেন, এর প্র ভিংয়ে যে ২০৬টি লক্ষণ পাওয়া গেছে, তার অর্ধেক মস্তকসংক্রান্ত।

Angustura vera 6 ঃ স্পাইনাল মোটর নাউ সমূহের এবং মিউকাস মেমব্রেনের ওপর এর প্রধান ক্রিয়া। আত্মনির্ভরতার অভাব এবং মনের নীচতা, মাথায় বেদনাসহ মূর্ছাভাব, মৃত্যুভয়, হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনবোধ। সন্ধিসকলের (joints) এবং পেশির আকর্ষণ ও আড়ষ্টতা, স্পাইন্যাল মোটর নার্ভের উপর এর প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কফি পান করবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা—এর প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ।

Lycopus Verginca Q ঃ Blood Pressure এবং Heart এর বিভিন্ন উপসর্গে এটি একটি নির্ভরযোগ্য ওষুধ। উচ্চরক্তচাপে এটা বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। রক্তের চাপ হ্রাস করতে এটা বিশেষ ফলপ্রদ। প্রবল হৃৎস্পন্দন, হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত, হৃৎপ্রদেশে বেদনা, হৃৎরোগের সঙ্গে স্থান পরিবর্তনশীল বাতবেদনা, হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি। হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক ঔষধাদি ব্যবহারের পরে এটা বিশেষ উপযোগী হয়ে থাকে।

এর বেদনার একটা বিশেষ প্রকৃতি এই যে, বেদনা মাথা থেকে হৃৎপিণ্ডে, হৃৎপিণ্ড থেকে চক্ষুতে, চক্ষু থেকে আবার হৃৎপিণ্ডে অথবা অন্য কোন স্থানে সঞ্চরণ করে বেড়ায়। ডাঃ বোরিক বলেন ঃ lowers the blood pressure, reduces the rate of the heart and increases the length of the systole to a great degree. অর্থাৎ উচ্চ রক্তচাপকে কমিয়ে দেয়, হৃৎপিণ্ডের দ্রুতগতিকে হ্রাস করে, সিস্টোলের দৈর্ঘ্যকে বর্ধিত করে।

Argentum Nitricum 30 ঃ এই ওষুধটি ব্যস্ত বাগীশ ব্যক্তিদের বিশেষ বন্ধু। অনিয়মিত বা দীর্ঘদিনব্যাপী মানসিক পরিশ্রমে উৎপন্ন ব্যাধিতে উপকারী। অল্প বয়সেও যাদের বৃদ্ধের ন্যায় দেখায়, যাদের দেহ ক্ষীণ, মাংসপেশি ক্ষয়প্রাপ্ত, গাল চোপসানো তাদের পক্ষে উপযোগী। মনে হয় সময় আস্তে আস্তে বইছে তাতে রোগী অসহিষ্ণু হয়ে উঠে। রোগীর সর্বদাই ব্যস্তভাব, প্রত্যেক কাজ তাড়াতাড়ি করতে চায়। মানসিক ভয় বেশি, রাস্তা চলতে ভয়—মনে হয় পাশের ঘরবাড়ি তার উপর এসে পড়ছে। নিজের হাত, পা, নাক যেন বড় হয়ে গেছে এইরূপ মনে হয়। ছাদ বা পুলের উপর থেকে অথবা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়বার আগ্রহ। কোন সভায়, নাট্যশালায় বা ভজনালয়ে যাবার ইচ্ছা করলেই উদরাময় উপস্থিত হয়। মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জায় রোগে স্নায়ুবিকৃতি। মস্তিষ্ক ক্লান্তি (Brain fag), মাথাঘোরা, অর্ধশিরঃশূল, মানসিক পরিশ্রমে বাড়ে এরূপ মাথাধরা, মাথাধরার সঙ্গে কম্পন ও শীতলতা বোধ। মস্তকে রক্তাধিক্য, রোগী মনে করে তার মাথা যেন বেড়ে যাচ্ছে। গলার মধ্যে শলাকা বা মাছের কাঁটা রয়েছে এইরূপ মনে হয়, বিশেষত ঢোক গিলবার সময়ে। স্ত্রীলোকদের চলবার সময়ে জরায়ুর মধ্যে বা জরায়ুর বাইরেও ঐরূপ মনে হয়। পেটে অত্যধিক বায়ুসঞ্চয়, প্রতিবার আহারের পরে উদগার। শূন্যোদগার, মিষ্ট খাবার অতীব স্পৃহা।

Tribulus Terrestris 1x ঃ এটি ইক্ষুগন্ধা থেকে তৈরী হয়েছে ধ্বজভঙ্গ, বিশেষত বৃদ্ধ বয়সে অতিরিক্ত মৈথুনের জন্য, সেই সঙ্গে মূত্রকৃচ্ছ্রতা, মূত্রত্যাগে বেদনা, প্রস্টেটগ্রন্থির

প্রদাহ। রোগী মূত্রবেগ রোধ করতে পারে না।

প্রস্রাবের পীড়াসহ Blood pressure এর এটি একটি উৎকৃষ্ট ওষুধ।

Rowlfia Sepentana 1x ঃ এই ওষুধটি ভারতীয় ভেষজজাত একটি বিখ্যাত ওষুধ, এই ভেষজটির বাংলা নাম সর্পগন্ধা বা ছোট চাঁদর। উচ্চ রক্তচাপের এটা একটি উৎকৃষ্ট ওষুধ। স্নায়ুবিধানের উগ্রতা এবং অনিদ্রা এর প্রধান প্রয়োগলক্ষণ। উন্মাদরোগেও এটা বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর নিদ্রাকারক গুণ এত বেশি এবং বিহারবাসীদের মধ্যে এটা এত বেশি পরিচিত যে, অনেক স্থানে শিশুদের ঘুম পাড়াবার জন্য এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফলত যে সকল উচ্চ রক্তচাপে অনিদ্রা এবং স্নায়বিক উগ্রতা থাকে, সেখানে এটা বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মস্তক যেন ফেটে যাবে বা উড়ে যাবে অথবা তার অস্থি যেন উচ্চ হয়ে উঠছে এইরূপ মনে হয়। ঠাণ্ডা প্রয়োগে এবং নির্মল বায়ুতে উপশমবোধ। মানসিক ক্লান্তি এবং অস্বচ্ছন্দতা, স্ফূর্তিহীনতা, উদাসীনতা। রোগী একাকী থাকতে ভালোবাসে (loves solitude)।

উচ্চ রক্তচাপ হ্রাসে এর অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক এর মূল অরিষ্ট অধিক মাত্রায় (physiological dose) প্রয়োগ করে থাকেন কিন্তু এটা হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞানসম্মত নয়। অন্যান্য লক্ষণ উপেক্ষা করে শুধু রক্তচাপ চিকিৎসা করায় হানি আছে, বিশেষত রাওলফিয়ার যদি সমগ্র লক্ষণ (totality of symptoms) না থাকে। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ এই প্রণালীতে চিকিৎসা করতেন, এখনও কেউ কেউ করেন কিন্তু অনেকে আবার তাদের ভুল বুঝতে আরম্ভ করেছেন। হ্যানিম্যান বা হোমিওপ্যাথির নীতি যে অভ্রান্ত তারা তা মানছেন। বিশেষত উচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসায় এটা মেনে চলা উচিত। স্থানবিশেষে অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে, যেখানে উচ্চ রক্তচাপ সাময়িকভাবে কমাতে না পারলে রোগী হঠাৎ মারা যেতে পারে।

*ইংরেজী ১৯৫৩ সালের ২৬এ ফেব্রুয়ারী, নয়াদিল্লী থেকে এই ঔষধ সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ২৮এ ফেব্রুয়ারী অমৃতবাজার পত্রিকায় 'উচ্চ রক্তচাপের ঔষধ' শিরোনামায় প্রকাশিত হয় ঃ "এটা একটি অতি প্রাচীন ভারতীয় ঔষধ। বর্তমানকালের শক্তিশালী রাসায়নিক দ্রব্যসংযোগে উচ্চ রক্তচাপ দমনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত হয়েছে। বোস্টনের একটি সংবাদে প্রকাশ। ম্যাসাচুসেটস্ হাসপাতালের দুইজন চিকিৎসক বলেন, এই ভারতীয় ঔষধ যা স্নেক প্ল্যান্ট বা সর্পগন্ধা নামে অভিহিত এবং যার ডাক্তারী নাম রাওলফিয়া উচ্চ রক্তচাপ দমনে বিশেষ সাহায্য করে থাকে। স্নায়বীয়তা, শিরঃপীড়া এবং অনিদ্রার রোগীকে দ্রুত আরোগ্য করে থাকে। অন্তত গত এক শতাব্দী ধরে ভারতীয় চিকিৎসকগণ সর্পগন্ধা গাছড়া উচ্চ রক্তচাপ, উন্মাদ, অনিদ্রা, মৃগী প্রভৃতি রোগে ব্যবহার করে আসছেন।

Nux Vomica 200 ঃ কৃশ, রাগী, পিত্তপ্রধান, উত্তেজিত প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের

পক্ষে এটা বিশেষ উপযোগী। বিশেষত যারা শারীরিক পরিশ্রম না করে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, অতি পরিমাণে তামাক, মদ এবং কফি খান অথবা ঐ সকল নেশা থেকে যারা নানাবিধ উপসর্গে কষ্ট পান তাদের পক্ষে ঔষধটি অধিকতর উপযোগী। মাথাঘোরা, বিশেষত আহারের পরে। ভোরে শিরঃপীড়া, মুখে অম্ল বা তিক্ত আস্বাদ। কোষ্ঠবদ্ধ, পুনঃপুনঃ মলত্যাগের ইচ্ছা অথচ বাহ্যে পরিষ্কার হয় না। মল কঠিন। সন্ন্যাসের পূর্ববর্তী মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয়ে এটা বিশেষ উপযোগী হতে দেখা যায়, কিন্তু প্রবল রক্তসঞ্চয়ে বেলাডোনা এবং জ্বর থাকলে অ্যাকোনাইট। কটিবাত, মাজায় বেদনা, বিশেষত হস্তমৈথুন এবং অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবার পরে। রাত্রি তিনটার পরে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়, মনে নানাপ্রকার ভাব উদিত হয়, ভোরে স্বপ্নপূর্ণ তন্দ্রা উপস্থিত হয়, রোগী অনেক বেলা পর্যন্ত তন্দ্রায় অভিভূত হয়ে থাকে—সহজে তাকে জাগানো যায় না, এর পরেই সে ক্লান্তি ও দুর্বলতা বোধ করে (...awakes at 3 or 4 a.m. falls into a dreamy sleep at daybreak from which he is hard to arouse and then feels tired adn weak-- Dr. Allen)।

Tabacum 30 ঃ এই ওষুধটি তামাক থেকে তৈরী, সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা কিন্তু পেটটা গরম এর বিশেষ লক্ষণ। চক্ষু মেললেই মাথাঘোরা এবং বমনেচ্ছা উপস্থিত হয় (চক্ষু বুজলে—ল্যাকেসিস, থুজা), উপরের দিকে চাইলে অথবা বিছানা ত্যাগ করবার চেষ্টা করলে তা বাড়ে। সন্ন্যাসরোগের এটা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সংজ্ঞালোপ, শরীর বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, মরা মানুষের মতো বিবর্ণ, সন্ন্যাসের পরে পক্ষাঘাত। অতিরিক্ত শীত বা অতিরিক্ত গ্রীষ্মে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি।

মাথাধরা আরম্ভ হয় সূর্যোদয়ের সঙ্গে এবং তার উপশম হয় সূর্যাস্তের পরে। রোগী মনে করে তার পাকস্থলী শূন্য রয়েছে, উদর যেন শিথিল হয়ে গিয়াছে এবং ঝুলছে, মনে হয় যেন চক্ষুর সম্মুখে একখানি অস্বচ্ছ কাঁচ রয়েছে, সেইজন্য দেখতে পাচ্ছে না, মনে হয় যেন চক্ষুর সম্মুখে মাছির ন্যায় পদার্থ উড়ছে। হৃৎশূল এবং বাম পার্শ্বে শয়নে হৃৎকম্প। নাড়ি মৃদু এবং সবিরাম।

Phytolacca 200 ঃ পারদের অপব্যবহার বা উপদংশ থেকে জাত বাত, অস্থিবেদনা প্রভৃতি উপসর্গে বিশেষ উপযোগী। এতে শরীরের ডান দিক অধিক আক্রান্ত হয়, উপসর্গসকল রাত্রিতে এবং বর্ষাকালে বাড়ে। রোগীর জীবনে বিতৃষ্ণা, কোন প্রকার আস্থা থাকে না, রোগী মনে করে সে নিশ্চয়ই মরবে। বিছানা থেকে উঠলেই মাথা ঘোরে, মূর্ছার মতো অবস্থা হয় (ব্রায়োনিয়ার ন্যায়)। মাথায় বাতের বেদনা, বৃষ্টিতে বৃদ্ধি। বাতবেদনা বিদ্যুতের ন্যায় অবিরত স্থান পরিবর্তন করে। অনেকে বলেন, ফাইটোলাক্কা বাত এবং শিরঃরোগে ব্রায়োনিয়া ও রাসটক্সের মধ্যবর্তী ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। রোগী বেদনার জন্য অস্থির হয়, মনে করে চলে বেড়ালে উপশম হবে।

Natrum Carbonicum 30 ঃ উভয়প্রকার প্রেসারেরই এটি একটি নির্ভরযোগ্য

ওষুধ। অত্যন্ত দুর্বলতা, বিশেষত রৌদ্রভোগের পরে, অতি সামান্য শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের পরেও অবসন্নতা, যাদের পূর্বে সর্দিগর্মি হয়েছে সামান্য উত্তাপে বিশেষত গ্রীষ্মকালে তাদের শিরঃপীড়া। মাথাধরা, মাথাঘোরা এবং হতবুদ্ধির ন্যায় ভাব ব্যতীত রোগী চিন্তা করতে বা মানসিক পরিশ্রম করতে পারে না। ডাঃ ন্যাশ এই লক্ষণের উপর অত্যধিক জোর দিয়ে বলেছেন ঃ The symptom alone makes it an invaluable remedy, as we often come across that kind of patient.

সামান্য চিন্তা করতে বা মানসিক পরিশ্রম করতে মাথাধরা উপস্থিত হয়, বজ্রপাত ও ঝড়বৃষ্টিতে এবং গীতবাদ্যে সমস্ত উপসর্গ বিশেষত মানসিক উদ্বেগ এবং অস্থিরতা বাড়ে। প্রবল হৃৎস্পন্দন। উপরে উঠতে, রাত্রিতে এবং বাম পার্শ্বে শয়নে তার বৃদ্ধি। রোগী লোকসংসর্গ পছন্দ করে না, তাতে বিরক্ত হয়। ক্ষণরাগী এবং ক্রোধশীল প্রকৃতি।

Picric Acid 30 ঃ নিম্ন রক্তচাপে এটা অনেক সময়ে বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ ন্যাশের মতে, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চালনাহেতু স্নায়ুদৌর্বল্যের এটা সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী সর্বদা মনমরা, কোন কাজ করতে ইচ্ছা হয় না, তাচ্ছিল্যভাব, মস্তিষ্কক্লান্তি (brain-fag), স্নায়বিক দুর্বলতা, ক্রমবর্ধনশীল রক্তাল্পতা। যারা অতিরিক্ত লেখাপড়ার কাজ করেন বা জটিল বিষয়কর্মে সর্বদা বিব্রত থাকেন, তাদের মস্তিষ্কক্লান্তি। ছাত্র, শিক্ষক এবং বৈষয়িক লোকদের মাথাধরা, পশ্চাৎ মস্তকে বেদনা, সামান্য সঞ্চালনে বা মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি, শক্ত করে বাধলে উপশম হয়। ঐ প্রকার রোগীদের অর্ধাঙ্গবাত বা পক্ষাঘাতেও ইহা উপকারী।

Oxalic Acid 30 ঃ নিজের রোগের কথা চিন্তা করলে উপসর্গ বাড়ে। স্নায়বিক দুর্বলতা বা সম্পূর্ণ অবসাদ। বাম অঙ্গের বাত, মোটর নার্ভ বা গতিশক্তি স্নায়ুর পক্ষাঘাত ইত্যাদি এর প্রকৃতিগত লক্ষণ। মাথাধরা এবং মাথাঘোরা, হৃৎপিণ্ডের এবং বামদিকের ফুসফুসে বেদনা, শ্বাসকষ্ট।

Passiflora Inc Q ঃ অনিদ্রা উপসর্গে এটা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল অরিষ্ট দশ/পনের ফোঁটা মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। তীব্র মাথাধরা, সেই সঙ্গে চোখে বেদনা, অম্ল ঢেকুর এবং পেটফাঁপা, হাঁপানির কষ্টকর টানেও এর মূল অরিষ্ট ঐরূপ অধিক মাত্রায় বিশেষ ফলপ্রদ হয়ে থাকে।

Sanguineria 200 ঃ অর্ধশিরঃশূল, ডানদিকের। পশ্চাৎ মস্তষ্কে আরম্ভ হয়ে মস্তষ্কের উপর দিয়ে চক্ষুতে বেদনা অবস্থান করে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে আরম্ভ এবং সূর্যাস্তের সঙ্গে তার নিবৃত্তি, এই সঙ্গে বমন ও বমনেচ্ছা। শব্দে এবং আলোকে অনুভবাধিক্য। রোগী অন্ধকার গৃহে এবং চুপ করিয়া থাকতে ভালোবাসে। রজোনিবৃত্তিকালের প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকদের ব্লাড প্রেসার। মুখমণ্ডলে উত্তাপাবেশ, এক বা উভয় গণ্ডের সীমাবদ্ধ আরক্ততা (circumscribed redness)। শ্বেতপ্রদর, হাতে পায়ে ভীষণ জ্বালা—শীতকালের রাত্রিতেও লেপের তলে পা রাখতে পারে না। (ল্যাকেসিস এবং সালফার ব্যর্থ হলেও এটা বিশেষ উপযোগী হয়ে

থাকে)।

Sulfonal 3x ঃ মাথাঘোরা ও অনিদ্রা। মাথা উঁচু করলেই মাথা ঘোরা, মাথাঘোরার সঙ্গে মাথায় বেদনা। যাদের দেহ ক্ষীণ এবং যারা অবনত হয়ে চলেন তাদের পক্ষে এটা বিশেষ উপযোগী।

চোখের পাতা ঝুলে পড়া, অস্পষ্ট কথা উচ্চারণ, প্রস্রাবে এলবুমেন ও কাষ্টস্, অনবরত প্রস্রাবের ইচ্ছা, স্বল্প প্রস্রাব, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত রক্তচাপে এই ওষুধটি সুন্দর কাজ করে।

Sepia 200 ঃ মৃদু কোপন স্বভাবের, বিষণ্ন, ক্রন্দনপ্রিয়া, জরায়ুরোগগ্রস্তা স্ত্রীলোকদের রক্তচাপরোগে ইহা উপযোগী। বহুক্ষণ জলে থেকে কাপড় কাচায় বা অন্য কাজ করায় যাদের রোগলক্ষণ বাড়ে, সিপিয়া তাদের একটি ফলপ্রদ ঔষধ। সিপিয়া রোগীণীর সাংসারিক কার্যে বিতৃষ্ণা এবং স্বামী বা পুত্রকন্যাগণের প্রতিও অবজ্ঞা প্রকাশ পায়, তলপেটের যন্ত্রসমূহ যেন যোনিপথ দিয়ে বার হয়ে যাবে এইরূপ মনে হয়। সেইজন্য ভয়ে পায়ের উপর পা দিয়া বসে। প্রৌঢ়াবস্থায়, বয়ঃসন্ধিকালে মাঝে মাঝে মূর্ছাভাব, ঘর্ম ও শরীরের উত্তাপের ঝলক। হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে মাথাধরা প্রকাশ পায়, মনে হয় যেন মাথা ফেটে যাবে, সম্মুখ দিকে ঝুঁকলে সঞ্চালনে এবং মানসিক পরিশ্রমে বাড়ে। দ্রুত সঞ্চালনে এবং চাপ দিলে কমে। মাথার তালুদেশে ঠাণ্ডাবোধ।

Silicea 200 ঃ এই ঔষধটি বিশুদ্ধ বালি থেকে তৈরী হয়েছে। এটি রক্তচাপরোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সিলিসিয়াজ্ঞাপক লক্ষণ আস্তে আস্তে প্রকাশ পায়। এর লক্ষণগুলি রাত্রিকালে, পূর্ণিমার সময়ে, খোলা বাতাসে বাড়ে এবং উত্তাপে কমে। মাথা কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখিলে রোগী ভালো থাকে। মেজাজ খিট্‌খিটে, রোগী যেন সর্বদাই রেগে আছে; মাথাধরা ঘাড় থেকে আরম্ভ হয়, মাথার উপর দিয়ে এসে বেদনা ডান দিকের চক্ষুতে অবস্থান করে ; যৌবনকালে হয়ত কোন কঠিন পীড়া হয়েছিল, তার পরেই এইরূপ কষ্টদায়ক শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়। এই ঔষধটি সোরা, সাইকোসিস, সিফিলিস তিনটি ধাতুদোষেরই প্রতিষেধক ওষুধ।

Rhustox 2C ঃ এই ঔষধটিও উপযুক্ত লক্ষন থাকলে উভয় বিধ প্রেসারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাত প্রধান ধাতুর রোগীতে বিশেষ উপযোগী। উদ্বেগ এবং অস্থিরতা বিশেষ লক্ষণ। মাংসপেশীতে বেদনা ও ক্ষত বোধ, সেজন্য রোগী অত্যন্ত অস্থির হয়। ঐ বেদনা মধ্যরাত্রিতে বাড়ে, সঞ্চালনে সাময়িক উপশম, সেজন্য রোগী সর্বদা স্থানপরিবর্তন বা নড়াচড়া করতে চায়, রোগীর নিরুৎসাহ বিষণ্ন মন, আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়। কেউ বিষ খাওয়াবে বলে ভয় হয়, রাত্রিকালে ভয়, বিছানা হতে উঠবার সময়ে মাথা ঘোরে, মাথা ভারী বোধ হয় এবং স্পর্শকাতরতা, পশ্চাৎ মস্তকে মাথাধরা, মস্তকের সম্মুখ দিকে বেদনা আরম্ভ হয়ে পশ্চাদ্দিকে বিস্তৃত হয়, হৃৎপিণ্ডের প্রসার, চুপ করে বসে থাকলে বুক ধড়ফড়

করে। নাড়ি দ্রুত, দুর্বল, অসমান ও সবিরাম। জিভের আকৃতি লাঙলের ফালার মত এবং তার সম্মুখ ভাগ লাল।

Tarantula Hispanica 200 ঃ এই ওষুধটি মাকড়সা দ্বারা তৈরী। এতে মেজাজের হঠাৎ পরিবর্তন হয়। রোগীর নৈতিক অবনতি (Moral degeneration) হয় এবং জিনিসপত্র নষ্ট করে ফেলবার ইচ্ছা এবং তৎসহ অস্থিরতা। রোগী কখনও মনে, কখনও হৃৎপিণ্ডে, কখনও পাকস্থলীতে বা কখনও হাতে পায়ে অস্থিরতা অনুভব করে। রোগী অস্থিরতায় নৃত্য করে (নাচগানে উপসর্গের উপশম)। সঞ্চালনে উপসর্গের বৃদ্ধি অথচ তবুও সঞ্চালন না করে পারে না। মাথাঘোরা ও মাথাধরা, মাথার মধ্যে যেন হাজার সুচ বিদ্ধ করে দিয়েছে এরূপ মনে হয়। হৃৎকম্পন এবং হৃৎপিণ্ডে খালিখালি বোধ, তা যেন মুচড়িয়ে তুলে ফেলছে এরূপ মনে হয় এবং প্রবল কামেচ্ছা। কামাতুরা রোগিনী অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করেন, তিনি যেন পীড়িতা এইরূপ ভাব দেখান। কামোন্মাদ বাধকবেদনা এবং প্রচুর পরিমাণে ঋতুস্রাব। একই সময়ান্তর রোগলক্ষণের প্রকাশ।

Magnesia Mur 30 ঃ স্নায়বিক শিরঃপীড়া, নড়াচড়ায় এবং খোলা বাতাসে বাড়ে, জোরে চাপলে মস্তকে গরম কাপড় জড়িয়ে রাখলে এবং শয়নে উপশম। যকৃৎরোগে মার্কুরিয়াসের সঙ্গে অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে—ডান পার্শ্বে শয়নে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি এবং জিহ্বায় দাঁতের দাগ লাগে। কিন্তু ম্যাগমিউরের রোগীর মল অত্যন্ত কঠিন এবং ভেড়ার মলের ন্যায়। যকৃতের বৃদ্ধির সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবিকৃতি, হৃৎস্পন্দন এবং হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে বেদনা—বসে থাকলে বাড়ে এবং হেঁটে বেড়াইলে কমে। মূর্ছাবায়ুগ্রস্তা স্ত্রীলোকদের এবং যাদের প্রত্যেক ঋতুকালে অত্যধিক কামোত্তেজনা (sexual excitement) হয় তাহাদের ব্লাড প্রেসাররোগে ইহা বিশেষ উপযোগী।

Iberis amera θ ঃ একটু নড়াচড়া করলে বা হাসলে কাশলে বুক ধড়ফড়ানি বৃদ্ধি হয়, তাতে যেন শ্বাস বন্ধ হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জারোগে ভুগবার পর হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতাসহ ব্লাড প্রেসার উপস্থিত হলে ইহা বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হৃৎপিণ্ডে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা, মনে হয় সামান্য সঞ্চালনে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে (ডিজিটেলিসের ন্যায়) এবং হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে মাথাঘোরা। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অতি দ্রুত; পূর্ণ, সবিরাম এবং অনিয়মিত নাড়ি। সামান্য সঞ্চালনে এবং উষ্ণগৃহে বৃদ্ধি।

Spartium Scaparium 3x ঃ এই ওষুধটি খুব অল্পই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটা স্বল্প প্রয়োজনীয় হইলেও ব্লাড প্রেসারের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। উচ্চ রক্তচাপে ডিজিটেলিস ও ভেরেট্রাম ভিরিডির মিশ্র লক্ষণে ব্যবহৃত হয়। হৃৎপিণ্ডের পেশি এবং মাইট্রাল ভাল্ভ্ আক্রান্ত। কিডনির প্রদাহ, শোথ, অ্যালবুমিনুরিয়া। এটা প্রয়োগে মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া এই সকল উপসর্গ দুর করে। চেইন-স্টোকসের শ্বাসপ্রশ্বাস অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস অতি মৃদু, পরে গভীর হয়ে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়ে উঠে। তার পরে ক্ষীণ হতে হতে কিছুক্ষণের

জন্য (পাঁচ হইতে পঞ্চাশ সেকেণ্ড) বন্ধ হয়ে যায়। দেখলে মনে হয় যেন রোগীর মৃত্যু হয়েছে কিন্তু পুনরায় শ্বাসপ্রশ্বাস আরম্ভ হয়।

Acid Phos 2C ঃ স্নায়ুদৌর্বল্য (nervous debility)। অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ, হস্তমৈথুন ইত্যাদি রেতঃক্ষয় জাত ব্যাধি। রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে, কথা বলতেও বক্ষঃস্থলে দুর্বলতা বোধ করে। যে সকল যুবক শীঘ্র শীঘ্র বেড়ে ওঠে, তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের জন্য ব্যাধিতে প্রথমে মন, পরে শরীর পীড়িত হয়। উদাসীনতা, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, রাত্রিকালে এক একবার খুব বেশি পরিমাণে জলের ন্যায় প্রস্রাব হয়, তাতে রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ওষুধটির একটি বিশেষত্ব হল সকল রোগের সঙ্গে দুর্বলতা আছে কিন্তু উদরাময়ে দুর্বলতার অভাব।

Lycopodium 200 ঃ অম্ল ও অজীর্ণ রোগগ্রস্ত রোগীর ব্লাড প্রেসারে এটা বিশেষ উপযোগী। আহারের পরে নিদ্রালুতা এবং অবসন্নতা, সামান্য আহারের পরে তলপেটে পূর্ণতা এবং স্ফীতিবোধ। বৈকাল চারটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত সমস্ত উপসর্গের বৃদ্ধি। রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না কিন্তু দিবাভাগে নিদ্রালুতা, প্রস্রাবে লাল বালুকার ন্যায় তলানি, বিষণ্ণ মন, বিরক্তচিত্ত, কোপন ও অপ্রসন্ন মন, স্মরণশক্তির দুর্বলতা। মস্তকের তালুতে বেদনা, মস্তকের জড়তা এবং ভারবোধ। দ্রুত হৃৎস্পন্দন, বিশেষত আহারের পরে। নাড়ির গতি দ্রুত। রোগীর একাকী থাকতে ভয় হয়।

Lac Can 200 ঃ মস্তকে বেদনা, প্রথমে একদিকে, পরে অন্যদিকে, সেই সঙ্গে বমনেচ্ছা এবং বমন হয়, চোখে ঝাপসা দেখে। মস্তিষ্ক পর্যায়ক্রমে একবার সঙ্কুচিত, পরক্ষণে প্রসারিত হচ্ছে এইরূপ মনে হয়। অন্য মনস্ক, সর্বদা ভুল; দোকানে জিনিস কিনে ফেলে যায়। লেখাপড়ায় মন দিতে পারে না, রোগী মনে করে তার ব্যারাম সারবে না। একাকী থাকতে ভয়, রোগীর আরও ভয় হয় সে মরে যাবে অথবা পাগল হয়ে যাবে। মানসিক অবস্থা অত্যন্ত বিকৃত, পথ চলবার সময়ে রোগী মনে করে সে বাতাসে উড়ে যাচ্ছে, শয়নকালে মনে হয় শূন্যে শুয়ে আছে; বাতের বেদনা আড়াআড়িভাবে এক সন্ধি থেকে অপর সন্ধিতে যায় (পালসেটিলা, কেলি বাইক্রোমিকামের ন্যায়)।

Kali Bichrom 200 ঃ হৃৎপিণ্ডের প্রসার (Cardiac dilatation) সেই সঙ্গে মূত্রগ্রন্থির বিকৃতি। হৃৎপিণ্ডের চারিধারে ঠাণ্ডাবোধ। মাথাঘোরা, সেই সঙ্গে বমনোদ্রেক। মাথাধরার পূর্বে চোখে অন্ধকার দেখা। সর্দিরোধের জন্য আধকপালে মাথাধরা, ভ্রূ দুইটির মাঝখানে বেদনা ও পূর্ণতাবোধ। এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ এই যে, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীজাত বা শ্লৈষ্মিক দ্বার থেকে যে শ্লেষ্মা নির্গত হয় তা শক্ত ও চট্‌চটে, সহজে ছাড়াতে চায় না, সুতোর ন্যায় ঝুলতে থাকে। বেদনা শীঘ্র শীঘ্র স্থান পরিবর্তন করে এবং একটি ক্ষুদ্র স্থানে আবদ্ধ থাকে, বিস্তারলাভ করে না।

Kali Sulph 6x, 200 ঃ বায়োকেমিক কেলি সালফ ব্লাড প্রেসারে বিশেষ উপযোগিতার

সহিত ব্যবহৃত হতে পারে। রোগী অত্যন্ত খিটখিটে এবং একগুঁয়ে। সহজেই রোগে যায়, সন্ধ্যাকালে উৎকণ্ঠা, ভয়, নিরানন্দভাব বৃদ্ধি পায়। মানসিক অবস্থার পরিবর্তনশীলতা, মাথাঘোরা। শয়নাবস্থা হতে উঠে বসলে উপবেশন অবস্থা হতে দাঁড়ালে, উপরের দিকে তাকালে রোগী মাথা ঘুরে পড়ে যায়। সন্ধ্যাকালে, রুদ্ধ গৃহে এবং উত্তাপে মাধাধরা বাড়ে এবং ঠাণ্ডা হাওয়ায় ও মধ্যরাত্রির পরে কমে। স্থান পরিবর্তনশীল বাতবেদনা ও স্নায়ুশূল।

Gelsemium 200 ঃ এই ওষুধটির প্রধান লক্ষণ তিনটি 'D' দ্বারা প্রকাশিত— 'Dullness, Drwosiness এবং Dizziness —অর্থাৎ নিস্তেজতা, স্ফূর্তিহীনতা, নিদ্রালুতা এবং শিরোঘূর্ণন জেলসিমিয়ামের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ। মত্ততার ন্যায় মস্তকের আন্দোলন, মত্ততার ন্যায় মাথাঘোরা। শিরঃপীড়া, প্রচুর পরিমান জলের ন্যায় প্রস্রাব করার পরে তার উপশম। স্নায়বীয় মাথাধরা — প্রথমে পিছন মস্তকে আরম্ভ হয়, বেদনা মাথার উপর দিয়ে সম্মুখ ললাটে এবং চক্ষুতে এসে অবস্থান করে। মানসিক পরিশ্রমে, ধূমপানে, সূর্যোত্তাপে এবং মস্তক নিচু করে শয়নে বাড়ে। নাড়ি ধীর ও পূর্ণ, কোমল এবং দুর্বল — অনুভব করা যায় না এইরূপ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, বিচরণ না করলে তা স্থগিত হয়ে যাবে এইরূপ মনে হয়। (Fears that unless on the move, heart will cease beating)।

Thyroidenum-200 ঃ রক্তাল্পতা শীর্নতা এবং পেশিসমূহের দুর্বলতা, পক্ষাঘাত, রোগী সামান্য বিষয়ে ক্রোধ এবং সামান্য বিরোধিতায় অস্থিরতা প্রকাশ করে, বিষাদ এবং অচৈতন্য পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়। মাথাধরা, সম্মুখকপালে বেদনা, সেইসঙ্গে আরক্ত মুখমণ্ডল। চোখের ডেলা যেন বার হয়ে পড়বে এইরূপ মনে হয়। হৃৎশূল, সামান্য পরিশ্রমে হৃৎকম্প। বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত হয়ে গেছে এইরূপ মনে হয়, নাড়ি দুর্বল ও চঞ্চল, দ্রুতগামী হৃৎপিণ্ড (ট্যাকিকার্ডিয়া), শয়নে অক্ষমতা।

Moschus 200 ঃ মাথাঘোরা সামান্য নড়াচড়ায় বাড়ে, চোখের পলক ফেলতেও মাথা ঘুরে ওঠে, মাথায় চাপবোধ, শরীরের মধ্যে উত্তাপ কিন্তু বাইরে শীতবোধ, স্নায়বিক হৃৎস্পন্দন, হৃৎপিণ্ড যেন কাঁপতে থাকে। নিঃশ্বাসে কষ্ট, নাড়ি দুর্বল, মৃত্যু নিশ্চিতবলে রোগী মনে করে। হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্তা স্ত্রীলোকদের পক্ষে এটা অধিকতর উপযোগী।

Physostigma 30 ঃ মেরুদণ্ডের উপদাহিতা (Spinal irritation) । দুই স্কন্ধের মধ্যস্থানে, পৃষ্ঠে, স্কন্ধদেশে, কোমরে বেদনা—সঞ্চালনে বৃদ্ধি। মেরুদণ্ডে চাপ দিলে ক্ষতের ন্যায় বেদনাবোধ, মেরুদণ্ড শক্ত ও আড়ষ্টবোধ। গলার মধ্যে সঙ্কোচনবোধ (sense of constriction), হস্তপদের কম্পন, অসাড়তা। কণ্ঠদেশে হৃৎপিণ্ডের দপ্‌দপানি অনুভূত হয়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মস্তকে এবং বক্ষে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। পক্ষাঘাত।

Tanacetum Vulgaris 3x ঃ সামান্য পরিশ্রমেই মানসিক ক্লান্তি। অতিরিক্ত অবসাদ এবং স্নায়বিকতা, অদ্ভুত মানসিক লক্ষণ, রোগী মনে করে তার শরীর অর্ধেক মৃত অর্ধেক জীবিত। রোগী মনে করে তার কানের ছিদ্র হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। রোগলক্ষণ হঠাৎ উপস্থিত হয়, এই সঙ্গে হাতবেদনা, মূত্রাশয়ে বেদনা এবং মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে।

Robinea 30 ঃ এই ওষুধটিও বেশ নির্ভরযোগ্য। ব্লাড প্রেসার রোগীর অত্যধিক অম্লসঞ্চয়ে এটা বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অম্ল উদগার, অম্ল বমনে দাঁত পর্যন্ত টক হয়ে যায়, অম্লশূল বেদনায় মলে ও ঘর্মেও অম্লগন্ধ।

Lithium Carb 6 ঃ হৃৎপিণ্ডে বেদনা, হৃৎপ্রদেশে বাতজনিত বেদনা। হৃৎকম্প, কিডনিরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা অধিকতর উপযোগী। মূত্রপথের মধ্যস্থলে বেদনা। ঘনঘন অধিক পরিমানে মূত্রত্যাগ, মূত্রনালীতে জ্বালা, স্ত্রীলোকগণের ঋতুপ্রকাশের পূর্বে এবং ঋতুকালে হৃৎপিণ্ডে বেদনা অনুভব।

Lactic Acid 30 ঃ সন্ধি এবং পেশির বাত, বহুমূত্র, অজীর্ণতা, অম্ল, উদ্গার, বুকজ্বালা ইত্যাদি লক্ষণসহ রক্তচাপে উপযোগী। গাত্রে দুর্গন্ধহীন অতিরিক্ত ঘাম, গলার মধ্যে যেন একটা গোলা আবদ্ধ আছে — ঢোক গিললেও তা যায় না, পাকস্থলী এবং যকৃতের পীড়া থেকে বহুমূত্র। মূত্রগ্রন্থি বা কিডনিতে বেদনা, নিদ্রাহীনতা।

Stigmeta Madis 2x ঃ হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা এর প্রধান লক্ষণ, এই সঙ্গে বর্তমান থাকে স্বল্প পরিমান মূত্র এবং নিম্নাঙ্গের শোথ, মূত্রে রক্ত এবং লাল বালুকা (লাইকোপোডিয়ামের ন্যায়)। এই ঔষধ সেবনে প্রথমে মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করে শোথ কমিয়ে দেয়, পরে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ভালো হয়। ডাঃ বোরিক এর মূল অরিষ্ট দশ হতে পঞ্চাশ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহারের কথা লিখেছেন।

Iodium 30 ঃ অত্যন্ত স্নায়বীয় উত্তেজনা (nervous excitability) । বিষণ্নতা, প্রবল হৃৎস্পন্দন, সামান্য সঞ্চালনে বৃদ্ধি। হৃৎপিণ্ডস্থানে ভারবোধ এবং চাপবোধরূপ বেদনা। হাতের ও পায়ের পেশির স্পন্দন এবং দেহের কম্পন, অত্যন্ত দুর্বলতা ও অবসন্নতা। গণ্ডমালাগ্রস্ত ব্যক্তি এবং বৃদ্ধদের ব্যাধিতে বিশেষ উপযোগী।

Spigilea 200 ঃ এই ওষুধটিও হৃদ্‌রোগযুক্ত ব্লাড প্রেসার রোগীতে উপযোগী। হৃৎস্পন্দন সমগ্র দেহের বা শুধু হাতের সঞ্চালনেই অত্যন্ত বেড়ে যায়। হৃৎপিণ্ডের উপর ঘড়ঘড় শব্দ অনুভূত হয় (purring feeling over the heart)। হৃৎস্পন্দন এত প্রবল যে সমগ্র বক্ষঃস্থলের কম্পন রোগীর জামার উপর দিয়েও দেখা যায় এবং অনেক সময়ে কয়েক ইঞ্চি দূরেও তা শুনা যায়। হৃৎপিণ্ডের তরুণ ব্যাধির ন্যায় হৃৎকপাটের পুরাতন বিকৃতিজনিত উপসর্গেও এটি বিশেষ উপযোগী। হৃৎস্পন্দনে ডাঃ জোসেট এই ওষুধটিকে হৃদরোগযুক্ত প্রেসারের প্রধান ঔষধ বলে বর্ণনা করেছেন। বাঁদিকের অর্ধ শিরঃশূল। প্রথমে পিছন মস্তকে আরম্ভ হয়ে মস্তকের উপর দিয়ে বাম চক্ষুতে অবস্থান করে, সূর্যোদয়ের সঙ্গে আরম্ভ হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকে। (ডান দিকের — স্যাঙ্গুইনেরিয়া)। সামান্য শব্দে বা সঞ্চালনে তার বৃদ্ধি।

Lachesis 200 ঃ প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকগণের ব্লাড প্রেসার। হৃৎস্পন্দন, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ক্ষীণতা এবং ক্ষীণ নাড়ি। শ্বাসরোধ এবং শ্বাসকৃচ্ছ্রতাসহ রোগিণী সহসা নিদ্রা থেকে জাগরিত হয়। অনিদ্রা, মাথার তালুদেশে জ্বালা, নিদ্রার পরে বা নিদ্রার মধ্যে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি।

প্রাতঃকালে নিদ্রা থেকে জাগিবামাত্র মানসিক উদ্বেগ ও দুঃখিতচিত্ততা প্রকাশ পায়। মানসিক অবসন্নতা। সূর্যোত্তাপে, শীত এবং উত্তাপের আতিশয্যে, অম্ল আহারে, অনাবৃত বায়ুতে, প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি। শরীরের বাম পার্শ্বে রোগের প্রাবল্য লক্ষিত হয়।

Rohitak 30 ঃ মস্তকের উপরভাগে অত্যন্ত উত্তাপবোধ, কপালের মধ্যেও উত্তাপ জ্বালা এবং এক প্রকার যন্ত্রণা অনুভূত হয়। মাথা ঘোরা, চোখ মুখ হাত পা জ্বালা—যেন আগুনের ঝলক বেরোতে থাকে। শীতল জল ও শীতল বাতাস প্রয়োগে উপশম, উত্তাপের জন্য স্নান করতে ইচ্ছা, বমনের উদ্বেগের সঙ্গে পেটের মধ্যে জ্বালা। রোগীর স্মরণশক্তি কমে যায় এবং তার বিশৃঙ্খলা ঘটে। কোন বিষয়ে মন ঠিক করতে পারে না, লিখবার সময়ে বানান ভুল হয়। স্ত্রীলোকদের বয়ঃসন্ধিকালের ব্লাড প্রেসারে উপযুক্ত লক্ষণে বিশেষ ফলপ্রদ।

Terminalia Arjuna 3x, 30 ঃ হৃৎপিণ্ডের নানাবিধ গোলযোগ, হৃৎস্পন্দন, বুককাঁপা, বুকের মধ্যে ধড়ফড় করা, হৃৎশূল, হৃৎপিণ্ডস্থানে বেদনা, অতিরিক্ত হৃৎস্পন্দন সেই সঙ্গে জীবনে বিতৃষ্ণা, ক্রোধপ্রবণ, উদ্বিগ্নতা। নির্জনতাপ্রিয় রোগীদের পক্ষে উপযোগী। রোগী প্রত্যেক জিনিসের মন্দ দিক দেখে। মাথা ঘোরা, মাথার পিছনে বেদনা, কর্ণে গুনগুন শব্দ, দৃষ্টি অস্পষ্ট, চক্ষুর মধ্যে উত্তাপবোধ, অনিদ্রা, নিদ্রার উপক্রমে রোগী আত্মহত্যা, মারামারি, সমুদ্রে ঝড় ইত্যাদির স্বপ্ন দেখে। এটি ক্রেটিগাসের সমকক্ষ ঔষধ। ক্রেটিগাস প্রয়োগে উপকার না পেলে এটা ব্যবহার করা উচিত।

Spongia 200 ঃ হৃৎকপাটের (valve) বিকৃতিজনিত হৃদ্‌রোগযুক্ত ব্লাড প্রেসারে এটা বিশেষ উপযোগী। রাত্রিকালে রোগী সহসা শ্বাসরোধ অনুভব করে নিদ্রা থেকে জেগে ওঠে, সেই সঙ্গে প্রবল সশব্দ কাশি, ভয়, উদ্বেগ, অস্থিরতা, হৃৎপিণ্ডের গোলযোগ স্পনজিয়ার বিশেষ প্রয়োগলক্ষণ ("...awakes out of sleep from a sense of suffocation with a violent, loud cough, great alarm, agitation anxiety and difficult respiration.")। হৃৎকপাটসংক্রান্ত ব্যাধিতে ডাঃ ন্যাশ এটিকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। তিনি লিখেছেন ঃ I have never done better work with any remedy in valvular disease than with Spongia. অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের ভালভ্ সম্বন্ধীয় রোগে স্পনজিয়া ব্যতীত অন্য কোন ঔষধে অধিকতর উত্তম ফল পাই নাই। বহুদিনের হৃৎকপাটের মারমার (murmur) শব্দও যে ইহার দ্বারা বিদূরিত হয় তাহাও ডাঃ ন্যাশ স্পষ্ট লিখে গেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ Not only are these paroxysis relieved or stopped, but valvular murmurs of years' standing have disappeared under the action of Spongia. নাড়ি পূর্ণ, কঠিন এবং দ্রুত, মাথা নিচু করে শয়নে (lying with head low) এবং ল্যাকেসিসের ন্যায় নিদ্রায় (sleep into the paroxysm) রোগলক্ষণের বৃদ্ধি।

Thallium 3x ঃ লোকোমোটর অ্যাট্যাক্সিয়া বা মজ্জাক্ষয়ের জন্য চলৎশক্তির বিকৃতি, তীব্র বেদনা। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত, স্নায়বিক ও আক্ষেপিক বেদনা, পাকস্থলী ও অন্ত্রে বিদ্যুৎ চলাচলের ন্যায় বেদনা।

Acid Hydro 30 ঃ বক্ষঃস্থলের স্নায়ুশূল, হৃৎশূল, রোগী সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারে কিন্তু প্রশ্বাস ত্যাগ করতে ভীষণ কষ্ট (এর বিপরীত লক্ষণ—আর্সেনিক), বুক ধড়ফড়ানি, দুর্বল অসম নাড়ি, হৃদ্‌রোগের সঙ্গে শুষ্ক, আক্ষেপিক, শ্বাসরোধের কাশি, হিমাঙ্গাবস্থা।

Arnica Mont 1M ঃ মস্তকে অত্যধিক রক্তসঞ্চয়হেতু বৃদ্ধদের সন্ন্যাসের আশঙ্কায় এটা উপযোগী। মস্তকে আঘাত বা পতনের জন্য ব্যাধিতেও এটা বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, অত্যধিক রক্তচাপহেতু মস্তকের ধমনী ছিন্ন হয়ে পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়। ডাঃ কার্স্টিস বলেন ঃ The best medicine to give after the acute symptoms have been relieved, to promote the re-absorption of the effused blood. অর্থাৎ তরুণ লক্ষণ উপশমিত হলে, ক্ষরিত রক্তকে শোষণের জন্য দিতে হবে। ডাঃ বেয়ার (Baehr) বলেন ঃ ...occupies the first rank as a medicine to accelerate the absorption of the apoplectic effusion.

সমস্ত শরীরে ঘৃষ্টবৎ বেদনা, নাড়ি পূর্ণ, দ্রুত, বিষমগতি, দেহের উপরের অংশ গরম, নিম্নাংশ ঠাণ্ডা, অসাড়ে মলমূত্রত্যাগ, বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা—কিছু জিজ্ঞাসা করলে ঠিক উত্তর দেয় কিন্তু পরক্ষণেই অচৈন্যতা উপস্থিত হয়।

COCA 3x ঃ উচ্চস্থানে বা পর্বত আরোহণে উপসর্গ বৃদ্ধি। হৃৎস্পন্দন, বুক ধড়ফড় করে। শ্বাসকষ্ট, রাত্রিতে ঘুম হয় না, অস্থিরতা। শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমের জন্য স্নায়ুসকলের অবসাদ ভাব, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, অস্থিরতা এবং নিদ্রাহীনতা এর বিশেষ লক্ষণ। উচ্চস্থানে এবং পাহাড়ের উপর উঠলে সমস্ত উপসর্গের বৃদ্ধি।

Paris Quadrifolia 6x ঃ—মাথার তালুতে অত্যন্ত বেদনা, এত বেদনা যে রোগী চুল আঁচড়াতে পারে না। মাথাধরা পশ্চাদ্দিকে ঘাড়ের নিম্নদিক থেকে আরম্ভ হয়ে মাথার উপর যায়, রোগীর মনে হয় যেন তার মাথা খুব ফুলে গেছে। পাকস্থলীতে পাথরের মতো ভারবোধ, ঢেকুর উঠলে উপশম। উন্মাদ অবস্থাতেও এটি উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রোগী অবিরাম বকে।

KALMIA LATIFOLIA 200 ঃ বাত থেকে যাদের হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয়েছে অথবা বাত ও হৃৎরোগ যাদের পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয় তাদের পক্ষে এটা বিশেষ উপযোগী। হৃৎপ্রদেশের বেদনা তীব্র এবং শ্বাসরুদ্ধকর, রোগীর দম বন্ধ হয়ে আসে। এই বেদনা নিম্নদিকে (downward direction) অবতরণ করে, প্রায়ই পাকস্থলী ও উদরে নামে। নাড়ি মৃদু (কিন্তু ডিজিটেলিসের ন্যায় অত মৃদু নহে)। বাতের বেদনা তীব্র, এক সন্ধি থেকে অন্য

সন্ধিতে যাতায়াত করে। অতি দ্রুতগামী হৃৎপিণ্ড (tachycardia), সেই সঙ্গে ঐ স্থানে তীব্র বেদনা।

Platinum Met 200 : স্ত্রীলোকদের রক্তচাপরোগে উপকারী। অহঙ্কার, ক্রোধ অথবা জরায়ুরোগের জন্য মাথাধরা, বেদনা ধীরে আসে ধীরে চলে যায়, মস্তকে অসাড়তাবোধ, রোগিণী সকল বিষয়ে তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ করে, অপর সকলকে ছোট, হীন বলে মনে করে। আরও মনে করে, শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে অপর সকলে তাহার সমান না, সকলেই তার দয়ার পাত্র। ইগনেসিয়া, ক্রোকাস, নাক্স মশ্চেটা প্রভৃতি ঔষধের ন্যায় তার ঘনঘন মানসিক অবস্থার পরিবর্তন যথা, কখনও হাসি, কখনও কান্না, কখনও প্রফুল্ল, কখনও বিষণ্ণ প্রভৃতি মানসিক ও শারীরিক লক্ষণ পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। যাদের অল্প বয়সেই কামেচ্ছা প্রকাশ পায়, জননাঙ্গ স্পর্শকাতর, সামান্য স্পর্শে আক্ষেপ উপস্থিত হয়, সহবাসকালে মূর্ছিত হয়ে পড়েন, গর্ভাবস্থায় কামেচ্ছা বাড়ে তাদের পক্ষে প্ল্যাটিনাম বিশেষ উপযোগী।

Bothrops Lan 30 : হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের ধমনীতে রক্ত জমাট বেধে নানাবিধ উপসর্গ। অর্ধাঙ্গে পক্ষাঘাত। স্নায়বীয় সম্পন, মুখমণ্ডল রক্তশূন্য ও স্ফীত। গিলতে কষ্ট, রোগী তরল দ্রব্যও গিলতে পারে না। রক্ত ও কালো বমন, রক্তভেদ। ব্যাধির চরম অবস্থায় বিশেষ উপযোগী। (ইয়েলো ভাইপার বা ল্যাকেসিস ল্যান্সিওলেটাস নামক সর্পবিষ থেকে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়েছে, এর ক্রিয়া ল্যাকেসিস, কোবরা, ক্রোটেলাস ইত্যাদি সর্পবিষজাত ঔষধের ন্যায়)।

Phosphorus 200 : স্নায়ুবিধানের উপর বিশেষ ক্রিয়া, স্নায়ুপীড়ার প্রথম অবস্থায় সর্বশরীরে জ্বালা এর বিশেষ লক্ষণ। রক্তাল্পতাজনিত শোথ—চক্ষুর চারিপার্শ্বে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়, নীল দাগ পড়ে। প্রাচীন বয়সে শয্যাত্যাগের পরেই মাথাঘোরা, মেরুদণ্ড থেকে মাথায় উত্তাপের ঝলক। মস্তিষ্কের অবসাদ, একাকী থাকতে মৃত্যুভয়, পেট খালিবোধ (sense of emptiness), রোগী পুনঃপুনঃ আহার করেন কিন্তু আহারের অব্যবহিত পরে আবার ক্ষুধা পায়, রাত্রিতে নিদ্রাকালেও ক্ষুধা পায় বলে নিদ্রা থেকে জেগে তাকে আহার করতে হয়। হৃৎপিণ্ডের ডান পার্শ্বের প্রসারণ, হৃৎস্পন্দন। বাম পার্শ্বে শয়নে উপসর্গের বৃদ্ধি এবং রোগী অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করে। নাড়ি মৃদু, কোমল এবং সূক্ষ্ম।

Naza Tri 30 : শুষ্ক বিরক্তিকর কাশিসহ হৃৎপিণ্ডের ভালভ্ বা কপাটের বিকৃতিজনিত উপসর্গ এবং হৃৎপিণ্ডের পুরাতন অতিবিবৃদ্ধি। বাতজনিত হৃৎপ্রদাহ, হৃৎপ্রদেশে তীব্র সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা, হৃৎস্পন্দন। বাম পার্শ্বে শয়নে উপসর্গের বৃদ্ধি, মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে, রোগী সর্বদা অনিশ্চিত বিষয়ে চিন্তা করে এবং আত্মহত্যা করতে চায়। শরীরের স্নায়ুবিধান (nervous system) অধিক আক্রান্ত হয়।

Natrum Sulph 12x : ডাঃ শুসলারের মতে, পিত্তের উপর এই ঔষধের আশ্চর্য ক্রিয়া দেখা যায় এবং পিত্তবিকৃতির জন্য যে কোন উপসর্গে এটা অব্যর্থ। মুখের আস্বাদ তিক্ত, পিত্তবমন, পিত্তভেদ, জিহ্বায় পিত্তজ লেপ—সবুজাভ ধূসর (greenish grey) বা সবুজাভ বাদামী (greenish brown)। অতিরিক্ত পিত্তবৃদ্ধির জন্য মানসিক উত্তেজনা এবং আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা, জীবনধারণে বিতৃষ্ণা, খিট্‌খিটে এবং বিষণ্ণ স্বভাব। প্রাতঃকালে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি।

সাইকোসিস ধাতুগ্রস্থ রোগীদের পক্ষে এটা বিশেষ উপযোগী। যাদের আর্দ্রতা মোটেই সহ্য হয় না, বর্ষাকালে এবং শুষ্ক থেকে আর্দ্র ঋতু বা হাওয়ার পরিবর্তনে রোগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি তাদের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি।

পৈত্তিক লক্ষণযুক্ত শিরঃপীড়া এবং অর্ধশিরঃশূল। মস্তকের নিম্নভাগে বেদনা মনে হয় যেন সাঁড়াশি দিয়ে অস্থিসকল চূর্ণ করে ফেলছে, সম্মুখ কপালেও তেমনি বেদনার জন্য মনে হয় যেন কপাল ফেটে যাবে।

Melilotus alb 30 : শরীরের কোন অংশে বা যন্ত্রে রক্তাধিক্য। স্নায়বীয় ও রক্তসঞ্চয়জনিত মাথাধরা, মাথাধরার জন্য রোগী যেন পাগল হয়ে যায়। মস্তিষ্কে ললাটের মধ্য দিয়ে ফেটে বার হবে এইরূপ মনে হয় (it seems as if the brain would burst through the forehead)। নাক থেকে রক্তস্রাব হলে মাথাধরা কমে (epistaxis affords relief)। আরক্ত মুখমণ্ডলসহ ধর্মোন্মাদ, উন্মত্ত অবস্থা, কোষ্ঠাকাঠিন্য—বাহ্যের বেগ আদৌ হয় না, সরলান্ত্রে বেশি পরিমাণে মল না জমলে বেগ হয় না (অ্যালুমিনার ন্যায়)।

Natrum Phos 30 : অম্ললক্ষণসহ যাবতীয় উপসর্গে এটা বিশেষ উপযোগী। কৃমি, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ এবং বাত ও প্রমেহ।

অম্ল বমন, অম্ল উদগার, মুখ দিয়ে অম্লজল ওঠা, বুক জ্বালা এবং ঘর্মেও অম্লগন্ধ। অম্ললক্ষণসহ শিরঃপীড়া এবং অর্ধশিরঃশূল। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পরেই মাথার উপরে বেদনা, সেই সঙ্গে জিহার পশ্চাদ্ভাগে সরের ন্যায় হলদে লেপ। নিদ্রাভঙ্গের পরে, আলোকে, শব্দে, সঞ্চালনে এবং মানসিক পরিশ্রমে উপসর্গের বৃদ্ধি, মুক্ত বায়ুতে হ্রাস। অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়ের জন্য পরিপাকযন্ত্রের দুর্বলতা ও অজীর্ণতা। হৃৎস্পন্দন অজীর্ণ ও অম্লপীড়াবশত হয়। আহারের পরে, সন্ধ্যাকালে, বাম পার্শ্বে শয়নে, শব্দে, ঝড় ও বজ্রপাতের সময়ে বৃদ্ধি।

Magnolia Grandiflora 2x : হৃৎরোগ এবং নানাপ্রকার বাতের বেদনা। বর্ষাকালে বা সেঁতসেঁতে ঋতুতে বৃদ্ধি। বেদনা স্থানপরিবর্তশীল। বাতের বেদনা হৃৎপিণ্ডে চালিত হয়। হৃৎপিণ্ডস্থানে খামচানো বেদনা এবং খিলধরা। শ্বাসবন্ধের উপক্রম। স্থান পরিবর্তনে বেদনা, বিশেষত প্লীহাস্থানে এবং হৃৎপিণ্ডে বেদনা পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইলে এটা বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। বাতের বেদনা হৃৎপিণ্ডে চালিত হয়। হৃৎপিণ্ডের বাইরের

আবরণের প্রদাহ, হৃৎশূল বেদনা, হৃৎপিণ্ডের ভিতর রক্তচলাচলের নানাবিধ উপসর্গ বর্তমানে এটা বিশেষ উপযোগী। শ্বাসকষ্ট, হৃৎপিণ্ডের চারিদিকে বেদনার সঙ্গে অনেক সময় পদদ্বয়ের কণ্ডূয়ন লক্ষণ থাকে। বর্ষা এবং সেঁতসেঁতে ঋতুতে এর উপসর্গের যেমন বৃদ্ধি আছে, রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করলেও তেমনি তার উপসর্গ বাড়ে।

Natrum Mur 200 : দারুণ শিরঃপীড়া অথবা মৃদু অচৈতন্যকর শিরঃপীড়া, নিদ্রা থেকে জাগিবামাত্র মাথা ধরে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকে (from sunrise to sunset), মস্তক শীঘ্র ফেটে যাবে (bursting) এইরূপ মাথাধরা, হৃৎকম্প এবং হৃৎপ্রদেশে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা। দুর্বল। মূর্ছার ন্যায় অনুভূতিসহ হৃৎপিণ্ডের গতি ফরফর বা পক্ষীর পক্ষ সঞ্চালনের ন্যায় (fluttering of the heart)—শয়নে উহার বৃদ্ধি। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে সমস্ত শরীর ঝেঁকে ওঠে (the heart's pulsation shake the body)। কোষ্ঠকাঠিন্য, মলদ্বারে সঙ্কোচন (contraction of anus), কঠিন ও শুষ্ক খণ্ড খণ্ড মল এবং তা কষ্টে নিঃসারিত হওয়ায় মলদ্বার ফেটে যায়, তা থেকে রক্ত পড়ে (torn and bleeding), সরলান্ত্রে সূচিবেধবৎ যন্ত্রণা, বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ মন, বিলাপশীলতা, মেজাজ খিট্‌খিটে ও খারাপ এবং রোগী সহজেই রেগে ওঠে। যারা অত্যধিক লবন খান এবং যাদের রুটিতে অরুচি তাদের পক্ষে এটা বিশেষ উপযোগী। ধ্বজভঙ্গ, ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতা সত্ত্বেও অত্যন্ত কামেচ্ছা। স্ত্রীসহবাসের পরেও স্বপ্নদোষ হয়।

রোগী নিদ্রিতাবস্থায় (somnambulism) শয্যা থেকে উঠে বেড়ায়, স্বপ্নে দেখে ঘরের ভিতরে চোর প্রবেশ করেছে এবং সেইজন্য রোগী নিদ্রা থেকে জেগেও চারিদিকে অনুসন্ধান করে।

Laurocerasus 3x : হৃৎপিণ্ডের আক্রমণে বিশেষ উপযোগী। হৃৎরোগ শয়নে উপশম কিন্তু উঠে বসলে বৃদ্ধি। শরীর এবং মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হয়ে যায়, শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। রোগী খাবি খায়। হৃৎস্পন্দন, নাড়ি অত্যন্ত ক্ষীণ। হৃৎপিণ্ডে বেদনা, মনে হয় যেন কেহ মুঠা করে অথবা খামচে ধরছে, হৃৎপিণ্ডের কোন ভাল্‌ভে পীড়াসহ কাশিতে (cough with valvular disease) এটা বিশেষ উপযোগী। সোরাবিষগ্রস্থ রোগীদের প্রতিক্রিয়ার অভাবে (want of reaction—অর্থাৎ যেমন সুনির্বাচিত ঔষধে ফল হয় না) যেরূপ সালফার ও সোরিনাম, প্রমেহ বিষদুষ্ট রোগীদের প্রতিক্রিয়ার অভাবে মেডোরিনাম, মোহাচ্ছন্ন নিদ্রালু রোগহীন রোগীতে ওপিয়াম, স্নায়ুসম্বন্ধীয় পীড়ায় ভ্যালেরিয়ানা বা অ্যাম্বা গ্রিসিয়া, লরোসেরাসাসও সেইরূপ হৃৎরোগে প্রতিক্রিয়ার অভাবে বিশেষ উপযোগী।

Ignetia am 30 : পিত্তপ্রধান স্ত্রীলোকদের পক্ষে উপযোগী। পরস্পরবিরোধী লক্ষণ এর বিশেষত্ব। যেমন, বেদনাযুক্ত পার্শ্বে শয়নে মাথাধরা কমে, কিছু গিলবার সময়ে গলক্ষতের যন্ত্রণার উপশম হয়, আহারেও পেটের শূন্যতা দূর হয় না, চলবার সময়ে অর্শের যন্ত্রণা হ্রাস

পায়, রোগী যত কাশে ততই কাশি বাড়ে ইত্যাদি। মাথাধরায় মনে হয় যেন মাথার পার্শ্ব দিয়ে পেরেক অথবা নখ বিদ্ধ হচ্ছে। ক্রোধ বা শোকের পরে রক্তসঞ্চয়সহ মাথাধরা। পরিবর্তনশীল প্রকৃতি—হাসতে হাসতে কান্না বা কাঁদতে কাঁদতে হাসা। সামান্য কারণে উত্তেজিত, প্রতিবাদ করলে ভয়ানক ক্রোধের সঞ্চার হয়। আধকপালে মাথাধরা, বেদনাযুক্ত পার্শ্বে চেপে শয়নে উপশম।

Kali Phos 12x : ব্লাড প্রেসারে এই বায়োকেমিক ঔষধটি বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, বিশেষত যেখানে হৃৎপিণ্ডের গোলযোগ আছে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া নিয়মিত হয় না, তার স্পন্দন কখনও কখনও থেমে যায়, নাড়িও দুর্বল এবং অনিয়মিত। হৃৎস্পন্দন, বুক ধড়ফড় করে। অনিদ্রা এবং অস্থিরতা, রোগী সামান্য কারণে উত্তেজিত হয় এবং সামান্য পরিশ্রমে শ্রান্তি বোধ করে। এটা প্রয়োগে হৃৎপিণ্ড সবল হয় এবং বুকের ধড়ফড়ানি কমে যায়। নানাবিধ মানসিক ক্লেশ ব্যাধির উত্তেজক কারণ হলে এটা অধিকতর উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এর মানসিক লক্ষণও প্রণিধানযোগ্য। স্নায়বীয় ধাতুপ্রকৃতিতে (nervous temperament) এটা বিশেষ উপযোগী। রোগী সামান্য কারণে বিরক্ত হয়, সামান্য গোলমালে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। স্বভাব অত্যন্ত খিটখিটে, উৎসাহশূন্য, উদ্বিগ্ন, সন্দিগ্ধচিত্ত। কোন কারণ ব্যতীত ভয়ের সঞ্চার হয় এবং সকল বিষয়েই দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। কেলি ফসের রোগীকে নিরাশাবাদী (pessimist) বলা যায়। জগৎ দুঃখময়, এটাই তাহার ধারণা এবং ভবিষ্যৎকে বিপদসঙ্কুল বলে মনে করে। নিম্ন রক্তচাপে এটা বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একে অনিদ্রার একটি মহৌষধ বলা যায়।

আয়োডাইড অব সোডিয়াম ৩x—কিডনি পীড়াসহ রক্তচাপ। ডাঃ জোসেট বলেন : Iodium and especially of sodium have in my hands and those of many other physicians produced a veritable and durable amelioration, not only of the symptoms of arterio-sclerosis but also of those of interstitial nephritis. অর্থাৎ আয়োডিয়াম, বিশেষত সোডিয়ামের আয়োডাইড প্রয়োগে আমার হাতে এবং আরও অনেক চিকিৎসকের হাতে উক্ত ব্যাধিসমূহের লক্ষণাবলীর প্রকৃত স্থায়ী হ্রাস হয়েছে।

উইদানিয়া সোমনিফেরা ২x—অশ্বগন্ধা হতে এই ঔষধটি প্রস্তুত হয়েছে। মানসিক পরিশ্রমজনিত শারীরিক ক্ষয়, বাত, উপদংশ, ধাতুদৌর্বল্যযুক্ত অথবা ঐ সকল ব্যাধি থেকে জাত ব্লাড প্রেসারে এটা বিশেষ ফলপ্রদ। বৃদ্ধদের ব্লাড প্রেসার, হৃৎপ্রদেশে বেদনা, বা ভারবোধ।

হোমিওপ্যাথিক মতে সুস্থ শরীরে এটা আজও রীতিমতো প্রুভিং না হলেও উপযুক্ত লক্ষণে বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে।

বেলাডোনা ২০০—মস্তিষ্কে অত্যধিক রক্তসঞ্চয় এটা বিশেষ উপযোগী—বিশেষত

সন্ন্যাসের উপক্রমে। মুখমণ্ডল থমথমে, আরক্ত, ক্যারোটিড ধমনীর এবং ললাটস্থ ধমনীর উল্লম্ফন, তন্দ্রালুতা, সম্পূর্ণ চৈতন্যলোপ। কনীনিকা প্রসারিত (Pupils dilated), নিদ্রালুতা অথচ নিদ্রা হয় না, অনিদ্রা। ভয় এবং ভয়ঙ্কর স্বপ্নদর্শন, অত্যন্ত ক্রোধপ্রবণতা, অস্থিরতা, ভয়শীলতা এবং উৎকণ্ঠা। মাথাধরা এবং মাথা ঘোরা, মস্তকের এখানে ওখানে চাপ, কপালের উপরে দৃঢ় চাপে বেদনার উপশম, কপালে কোন গুরুভারের বস্তু চাপানো হচ্ছে এইরূপ অনুভূতিবিশিষ্ট শিরঃপীড়া, মাথার তালুতে জ্বালা, মাথাধরা—সূর্যের উত্তাপে, বায়ুর প্রবাহে (draught of air) অথবা চুল ছোট করে ছাঁটলে বাড়ে। নিদ্রাকালে কাতরানি এবং অস্থিরতা, পূর্ণ কঠিন নাড়ি।

মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত সম্বন্ধে ডাঃ জার বলেন : My first recouse is always to Belladonna if the consciousness is entirely suspended. অর্থাৎ চৈতন্য বিলুপ্ত হলে আমার প্রথম কার্য বেলাডোনা প্রয়োগ। ডাঃ বেয়ারও বলেন : Scarcely one case of apoplexy where this remedy is not suitable, and sometimes has a magic effect. অর্থাৎ এই ঔষধ উপযোগী নহে এমন একটি সন্ন্যাসের রোগী ক্বচিৎ পাওয়া যায়, অনেক সময়ে ইহার ফল যাদুমন্ত্রের ন্যায় হয়।

ব্যারাইটা কার্ব ২০০—বৃদ্ধদের উচ্চ রক্তচাপে বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। মদ্যপায়ীদের রক্তচাপ, খর্বকায়, স্ক্রোফুলাধাতুগ্রস্থ এবং গাউটগ্রস্থ মোটা লোকদের ব্যাধি—ব্যারামের কথা চিন্তা করলেই বাড়ে, শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা। বৃদ্ধদের বালকস্বভাব এবং বিবেচনাশূন্যতা, স্মরণশক্তির ক্ষীণতা, বালকস্বভাবের এবং বিবেচনাশূন্য বৃদ্ধদের মাথাখোরা, মাথার তালুদেশে বেঁধার ন্যায় বেদনা। ডাঃ হেল বলেন : It assists in its (the clot) absorption and the removal of the consequences of the pressure. অর্থাৎ এটা দলা রক্তকে শোষণ করতে এবং রক্তচাপজনিত উপসর্গকে দূর করতে সহায়তা করে।

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ২০০—অত্যন্ত বাচালতার সঙ্গে মানসিক উদ্বেগ ও উচ্ছ্বাস। কথা বলা, হাসা বা কাঁদা—রোগী যাই আরম্ভ করুক, সহজে থামে না। সামান্য ব্যবধানকে অতি দীর্ঘ মনে করে—দশ হাত লম্বা যেন দশ মাইল, অথবা দশ সেকেণ্ডকে দশ বৎসর মনে হয়। মনে হয় যেন মাথার হাড় একবার জোড়া লাগছে, একবার খুলে যাচ্ছে, কখনও মনে হয় যেন মাথার হাড় উঁচু হয়ে উঠছে, অর্ধ শিরঃশূল। পেটফাঁপা বা প্রস্রাব বন্ধ হওয়ার জন্য মাথাধরা। হৃৎপিণ্ড থেকে যেন ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে এইরূপ মনে হয়, হৃৎস্পন্দনের জন্য ঘুম ভেঙ্গে যায়।

কার্বোনিয়াম সালফুরেটাম ২০০—মাথাবেদনা এবং বসবার সময়ে হঠাৎ মাথাঘোরা, কপালের সম্মুখ দিকে চাপবোধ, সহসা অজ্ঞান হয়ে পড়া, স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া। বুদ্ধিহীনতা, বালকের ন্যায় হাবভাব, ভুল দেখা এবং ভুল শোনা। মস্তকের পশ্চাৎ দিকে অত্যন্ত

বেদনা—মনে হয় একবার উন্মুক্ত হচ্ছে পরক্ষণে রুদ্ধ হচ্ছে, অর্ধাংশে পক্ষাঘাত এবং সন্ন্যাস।

Cephalendra Indica 3x : ওই ঔষধটি তেলাকুচা থেকে প্রস্তুত হয়েছে। মধুমেহ ও মূত্রমেহ (diabetes mellitus and insipidus) এবং পিত্তাধিক্য ও পৈত্তিক উপসর্গযুক্ত রোগীদের রক্তচাপে এটা বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে। সর্বশরীরে জ্বালা, হাত পা চোখ মুখ আগুনের ন্যায় জ্বলে যায়, ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম। রৌদ্র লাগাবার পরে মাথাধরা। মাথাঘোরা, প্রচুর পরিমাণ মূত্রস্রাব, মূত্রে শর্করা। প্রচুর মূত্রত্যাগের পরে দুর্বলতা এবং অবসন্নতা, তীব্র পিপাসা, বিশেষত মূত্রত্যাগের পরে প্রচুর পরিমাণ জলপানের ইচ্ছা হয়। বিষণ্ণ, বিরক্ত মন, কোন কাজ করতে ইচ্ছা হয় না।

কনভ্যালেরিয়া ৩x—ডাইলেটেশানের প্রথম অবস্থায় এটা বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। হৃৎপিণ্ডের শক্তিকে বৃদ্ধি করে তার ক্রিয়াকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে এর যথেষ্ট উপযোগিতা দেখা যায়। হৃৎপিণ্ডের গোলযোগ থেকে উদ্ভুত উদরীতেও এটা বিশেষ ফলপ্রদ। স্ত্রীলোকগণের জরায়ুপ্রদেশে টাটানি বেদনা থাকলে এটা অধিকতর উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ ন্যাশ এর প্রয়োগ সম্বন্ধে লিখেছেন : I have used it with much satisfaction in women who complained of great soreness in the uterine region and sympathetic palpitation of the heart.

সমস্ত শরীরে কালশিরার দাগ, অতি দ্রুত অনিয়মিত নাড়ি। অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট, ভ্রমনে বা নড়াচড়ায় মনে হয় হৃৎপিণ্ডের কার্য স্থগিত হয়ে আসছে, হৃৎপিণ্ডের ভালভ্ সম্বন্ধীয় ব্যাধি, সেই সঙ্গে মূত্রের স্বল্পতা, শোথ, শ্বাসকষ্ট, হৃৎপিণ্ডের গোলযোগহেতু শ্বাসকষ্ট। হৃৎস্পন্দন এবং শোথে এটা অনেক সময়ে অতি উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

Conium M 200 : এটিও হাইপ্রেসারের ভাল ওষুধ। প্রফুল্লতার অভাব এবং কার্য করতে অপ্রবৃত্তি। কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রম করতে ইচ্ছা হয় না। স্মরণশক্তির অভাব। মাথাঘোরা, শয়নকালে এবং বিছানায় পার্শ্বপরিবর্তনে বাড়ে। বামদিকে মাথা চালনা করলে বাড়ে। বৃদ্ধদের মাথাঘোরা। স্ত্রীলোকদের ডিম্বকোষ এবং জরায়ুঘটিত উপসর্গসহ মাথাঘোরা। মস্তকের পিছন দিকে এবং গ্রীবাদেশে ছিড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা। সন্ন্যাসরোগের পরবর্তী পক্ষাঘাতে এটা বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবার মন্দফলহেতু উপসর্গে উপযোগী।

ডিজিটেলিস ৬x—নাড়ির অত্যন্ত মন্দগতি এবং সবিরামগতি (slow and intermittent pulse) এর প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ক্ষীণতা, কখনও দ্রুত, কখনও অনিয়মিত হৃৎকম্প। সামান্য নড়াচড়াতেও অত্যন্ত হৃৎকম্প হয়। হৃৎপিণ্ড বা কিডনির পীড়াসহ শোথ। মলিনবর্ণ (নীলবর্ণ) ত্বক, চক্ষুর পাতা, ওষ্ঠ, জিহ্বা এবং নখ। অনিয়মিত

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, চিৎ হয়ে শয়নে অক্ষমতা। মাথাঘোরা এবং মস্তকের জড়তা, নিরাশা, শঙ্কাপূর্ণতা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যাকুলতা। মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়াহীনতা, স্নায়বীয় দুর্বলতা অত্যন্ত বেশি। মূর্ছাপ্রবণতা।

ক্যাল্কেরিয়া আর্স ৬x (বিচূর্ণ)—অত্যন্ত মানসিক অবসাদ, সামান্য উত্তেজনাতেই হৃৎস্পন্দন উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কে এবং বাম বক্ষঃদেশে রক্তাধিক্য (গ্লোনইন এবং এমিল নাইট্রাইটের ন্যায়)। মদ্যপায়ীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। রজোনিবৃত্তিকালে মোটা স্ত্রীলোকগণের রক্তচাপজনিত উপসর্গে বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

ক্রোকাস স্যাটাইভা ৩০—স্ত্রীলোকদের রজোনিবৃত্তিকালের রোগ। এর একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, রোগিণী মনে করে তার পেটের মধ্যে কিছু নড়ছে। ঘনঘন মানসিক লক্ষণের পরিবর্তন। রোগিণী কখনও হাসে, পরক্ষণে কাঁদে, গান গায়, পাগলের মতো ভাব করে, যাকে সম্মুখে পায় তাকেই চুম্বন করে।

অ্যাসপ্যারাগাস অফিসিনেলিস ৩০—মাথাঘোরা, সম্মুখদিকে বেশি। প্রবল হৃৎকম্পন, তা বাইরে থেকেও দেখা যায়। উপবেশনে হৃৎকম্পন। নাড়ি অত্যন্ত দুর্বল, ধীর এবং অনিয়মিত। হৃৎপিণ্ড এবং কিডনির পীড়ার জন্য শোথ, শ্বাসকষ্ট।

অ্যালুমেন ২০০—মাথায় জ্বালা এবং মাথাধরা, শরীরের নানাস্থানের সঙ্কোচন এবং শুষ্কতা, দারুন কোষ্ঠবদ্ধতা, অন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তার জন্য আদৌ মল বেগ থাকে না। বক্ষঃস্থলের অত্যন্ত দুর্বলতা, ডানদিকে শয়নে হৃৎস্পন্দন হয়।

সিটিসাস ল্যাবার্নাম ৩x—হাতে বেদনা এবং পক্ষাঘাতের ন্যায় হাত অসাড় হয়ে যায়। মুখমণ্ডল মলিন। মাথাঘোরা, বমন, মূর্ছা, নাসিকা থেকে রক্তপাত। একদিকের চাপক (pressing) মাথাধরা।

কিউরারি ৩০—পক্ষাঘাত। প্রথমে মাথা ঘোরে, পরে পায়ের বল কমে যায়, পা কাঁপে, চলবার সময়ে পা ঠিক স্থানে পড়ে না, হাতও ভারী এবং দুর্বল লাগে।

ক্যাকটাস গ্র্যাণ্ডিফ্লোরাস ৩০—নিম্ন রক্তচাপে বিশেষ উপযোগী। বিলাপপ্রবণতা, নীরবতা, বিমর্ষতা। মানসিক উদ্বেগ এবং মৃত্যুভয়। মাথাঘোরা, হৃৎস্পন্দন, বামদিকে শয়নে বৃদ্ধি, বিচরণে এবং রাত্রিকালেও বাড়ে। হৃৎপিণ্ডের গতি কখনও দ্রুত কখনও ধীর। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে সূচীবেঁধার ন্যায় মনে হয় এবং তীব্র বেদনা। হৃৎপিণ্ড যেন একটি লৌহহস্ত দ্বারা দ্রুত চেপে ধরছে ও ছাড়ছে এইরূপ মনে হয় (heart feels as if clasped and unclasped rapidly by an iron hand)। স্পন্দনেরও স্থান নাই, যেন এই ভাবে হৃৎপিণ্ডকে চেপে ধরা হচ্ছে। হৃৎশূল উপসর্গে (angina pectoris) ডাঃ হেল একে প্রথম শ্রেণীর ঔষধ বলে গণ্য করেছেন। শরীরে নানাস্থানে স্পন্দনহেতু রোগী নিদ্রা যেতে পারে না।

ক্যাফিন ৩x—উচ্চ রক্তচাপ এবং নাড়ির গতির হার কমাতে এর বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত দুর্বল, মনে হয় যেন তা বিলুপ্ত হবে। প্রস্রাব অত্যন্ত কমে যায়, এটা প্রস্রাবের মাত্রা বাড়াতে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ও স্নায়ুকেন্দ্রের উত্তেজনা প্রদান করতে বিশেষ ফলপ্রদ।

জিঙ্কাম মেট্যালিকাম ২০০—রোগী এত দুর্বল যে তার রোগলক্ষণ সহজে প্রকাশ পায় না, রোগীকে দেখতে বৃদ্ধের ন্যায়, গাত্রচর্ম ঝুলে পড়ে, মুখমণ্ডল শীর্ণ ও মলিন। রোগী অত্যন্ত শীতকাতর, সামান্য শীতও সহ্য হয় না। কোন প্রকার উত্তেজক খাদ্য বা ঔষধে রোগলক্ষণ বাড়ে। অবিরত পদসঞ্চালন এর একটি বিশেষ লক্ষণ। পদসঞ্চালনে সমস্ত উপসর্গ উপশমিত হয়। মেরুদণ্ডে বেদনা, বসলে বাড়ে, চলাফেরা করলে সাধারণত উপশম হয় কিন্তু সকল প্রকার রোগ তাতে কমে না (এইস্থলে রাসটক্সের সঙ্গে প্রভেদ)। বেলা দশ এগারটার সময়ে অতিরিক্ত ক্ষুধা (সালফারের ন্যায়)।

রোগী গণ্ডগোল সহ্য করতে পারে না। পরিশ্রমের কাজ করতে বা কথা বলতে ভালোবাসে না। বাম পার্শ্বে পড়ে যাবে এইরূপ ভয় হয়। সামান্য মদ্যপান করলেও মাথাধরা বাড়ে।

রোগিণীর ঋতুস্রাব আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হয় (ল্যাকেসিসের ন্যায় কিন্তু সিমিসিফুগার ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি)।

জিঙ্কাম ফসফরিকাম ৬x—মাথাঘোরা-শয়নে বৃদ্ধি। কপালে এবং মস্তকের পশ্চাদভাগে বেদনা, স্নায়বিক দুর্বলতা, ব্যবসায়িগণের স্নায়বিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি, সেইজন্য কোন প্রকার কাজ করতে অনিচ্ছা। অনিদ্রা, সন্ন্যাস, পক্ষাঘাত এবং উন্মাদ অবস্থাতেও এর ব্যবহার আছে।

অ্যাড্রেনালিন ২x—ভ্রমি বা মাথাঘোরা, বমনেচ্ছা ও বমন। যেখানে ধমনীগাত্রের অবপতনিক পরিবর্তন হয় সেখানে এর বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়। এটা উচ্চ রক্তচাপে বিশেষ উপকারী। এই ঔষধ প্রয়োগে নাড়ির বেগ কমে আসে, নাড়ি ধীর হয়। ইহা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার লোপ আশঙ্কায় উপকারী। ডাঃ বোরিক বলেন, ফুসফুসের প্রদাহে অথবা হাঁপানিতে, ধমনীর প্রদাহে অথবা হৃৎশূলে যেখানে দেখা যায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ পেয়ে আসছে সেখানে ইহা বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর ক্রিয়া দ্রুত, সুনির্বাচিত হলে শীঘ্রই ফল পাওয়া যায়, ঘনঘন প্রয়োগ করা ঘনঘন প্রয়োগ করা উচিত নয়।

অ্যান্টিপাইরিন ৩০—মৃগীর ন্যায় অবস্থা, খিলধরা এবং সমস্ত শরীরের কম্পন। ভুল দেখা এবং ভুল শোনা, উৎকণ্ঠা, রোগী মনে করে সে যেন পাগল হয়ে যাবে। অবসন্নতা, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে যাবে এইরূপ অনুভূতির সঙ্গে মূর্ছা। দ্রুত দুর্বল অসম নাড়ি, প্রস্রাব অত্যন্ত কম, মুখমণ্ডলের শোথ।

অ্যান্টিম ক্রুডাম ৩০—জিহ্বা পুরু সাদা ময়লায় আবৃত, মনে হয় যেন চুনকাম করা হয়েছে (white-washed)—এটা অ্যান্টিম-ক্রুডের একটি বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ। জীবনে বিতৃষ্ণা এবং নৈরাশ্য, বিষণ্ণতা। জ্যোৎস্নালোকে মানসিক লক্ষণ বৃদ্ধি পায়। মাথাঘোরার সঙ্গে নাসিকা হতে রক্তপাত।

অরাম মেটালিকাম ৩০—রক্তচাপের আধিক্য, সেই সঙ্গে বিষাদবায়ু (mellancholia)। গভীর নৈরাশ্য এবং জীবনে বিতৃষ্ণা, আত্মহত্যা করার ইচ্ছা, চিত্তের অপ্রসন্নতা, সামান্য প্রতিবাদেও ক্রোধের সঞ্চার, মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্তি অনুভব, মাথাঘোরা, মাথা নিচু করলে মনে হয় যেন তা মণ্ডলাকারে ঘুড়ছে, মুক্ত বায়ুতে বেড়াবার সময়ে মাথাঘোরা—শয়নে উপশম, হৃৎস্পন্দন এবং হৃৎপ্রদেশে অত্যন্ত উদ্বেগ- বোধ, সেই সঙ্গে ব্যাকুলতা এবং ভয়, নাড়ি অনিয়মিত, দুর্বল এবং দ্রুত, উপদংশগ্রস্ত এবং পারদের অপব্যবহারজনিত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, স্থূলকায় বৃদ্ধ, রক্তপ্রধান ধাতু এবং গণ্ডমালাদোষগ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

ধমনীগাত্রের অবপতনিক পরিবর্তনে (arterio-sclerosis) (যাতে ধমনীগাত্র মোটা হয়) অরাম বিশেষ উপযোগী। ডাঃ হেল বলেন ঃ Aurum is an excellent remedy in arterio-sclerosis in which there is an element of vasomotor constriction.

থিয়া ৩০—হৃদ্‌রোগ, হৃদ্‌কম্পন, রোগী বাম পার্শ্বে শুতে পারে না, নাড়ি চঞ্চল—সবিরাম এবং অসমান, মাথাধরা, বদহজম। উপর পেট খালি খালি বোধ এবং মূর্ছা। রোগী অম্লদ্রব্য খেতে অত্যন্ত ভালোবাসে। খুন করতে বা উচ্চস্থান হতে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা। পুরাতন চাপায়ীদের দিনেরবেলায় নিদ্রালুতা এবং রাত্রিতে অনিদ্রা।

ফেরাম ফসফরিকাম ৬x, ১২x, ৩০x, ২০০x—বায়োকেমিক ঔষধ ফেরাম ফস প্রদাহের অবস্থায় বিশেষ ফলপ্রদ। সুতরাং ব্লাড প্রেসারে এর বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়। হৃষ্টপুষ্ট, বলবান, রক্তাধিক্যযুক্ত রোগীর মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যবশত দপ্‌দপ্‌কর মাথাধরা, চক্ষু ও মুখমণ্ডল আরক্ত, প্রলাপ, উত্তেজনা, নাসিকা থেকে রক্তস্রাব। গুরুতর বিষয়ে অবহেলা এবং তুচ্ছ বিষয় গুরুতর বলে মনে করা। স্মৃতিশক্তি হ্রাস, পরিচিত লোকের বা গ্রামের নাম মনে আসে না। মস্তিষ্কে ধামনিক রক্তের প্রধাবনহেতু (owing to rush of arterial blood to the head) প্রবল শিরঃপীড়া এবং প্রলাপ। সূর্যোত্তাপ অথবা রৌদ্র লাগাবার পরে শিরঃপীড়া এবং অন্যান্য উপসর্গ, মস্তকে সামান্য স্পর্শে বেদনাবোধ (sensitiveness)। চুলের গোড়াতেও বেদনা।

স্মরণশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত, মন অত্যন্ত দুর্বল, পরিচিত লোকের বা স্থানের নাম অথবা অল্পদিনের ঘটনা মনে থাকে না, সেজন্য অনেক সময়ে রোগী আশাভরসাশূন্য হয়ে পড়ে।

ট্রিটিকাম ৩০—ব্লাড প্রেসাররোগে মূত্রযন্ত্র আক্রান্ত এবং প্রস্টেটগ্রন্থি প্রদাহিত হলে বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্লাডারের প্রদাহ, পুনঃপুনঃ প্রস্রাব করবার ইচ্ছা, প্রস্রাবে জ্বালাযন্ত্রণা, প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষমতা (কস্টিকামের ন্যায়), পুঁজ মিশ্রিত প্রস্রাবসহ প্রমেহ।

টাইফোফেব্রিনাম ৩০—মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়, মাথাধরা এবং মাথাঘোরা, মস্তকের সম্মুখদিকে বেদনা—যেন হাতুড়ি মারছে এইরূপ মনে হয়, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনা হয়ে পরে অবসাদ। সর্বদা আশঙ্কা, কখন কি বিপদ ঘটবে। শ্বাসবদ্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটবে, রোগী এইরূপ মনে করে।

উচ্চ রক্তচাপের জন্য মস্তক, ফুসফুস এবং কিডনীতে রক্তসঞ্চয়। উচ্চ রক্তচাপে এটা বিশেষ উপকারী। মস্তিষ্ক এবং শরীরের বাম ভাগ পক্ষাঘাতপ্রবণ।

জ্যানথক্সিলাম ৩x—ভীত, স্নায়ুপ্রধান, অবসাদগ্রস্থ মন, মস্তকে পূর্ণতাবোধ, মাথার উপরে ভারবোধ এবং বেদনা—মনে হয় যেন মাথা দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে, মাথার পশ্চাদদিকে বেদনা, মাথাঘোরা, অনিদ্রা, অর্ধাঙ্গে পক্ষাঘাত। বাম অঙ্গের অসাড়তা। জরায়ু ও ডিম্বকোষের উপর এর বিশেষ ক্রিয়া থাকায় যে সকল স্ত্রীলোক বাধকবেদনায় কষ্ট পাচ্ছেন, বাম ডিম্বকোষে যাদের স্নায়বিক বেদনা আছে, সেই সঙ্গে কোমরে এবং তলপেটে বেদনা এবং ঐ বেদনা উরুদেশ এবং পদদ্বয়ে বিস্তৃত হয় তাদের রক্তচাপে ঔষধটি বিশেষ উপযোগী।

টার্মিনেলিয়া চেবুলা (হরীতকী) ৩x—মাথাঘোরা, মাথার পশ্চাদদিকে আরম্ভ হয়ে সমগ্র ডানদিকে ছড়িয়ে পড়ে, দিনরাত্রি সমভাবে থাকে। ডানদিকের রগে (right temporal region) সূচফোটানোবৎ ব্যথা। মাথাঘোরা। শক্ত চাপে, সঞ্চালনে এবং রোদ লাগালে তা বাড়ে এবং ঠাণ্ডা জলে স্নানে, সন্ধ্যাকালের শুষ্ক ঠাণ্ডা হাওয়ায়, আহারের সময়ে ও নিদ্রাকালে কমে। পায়োরিয়া, দাঁতের মাড়ী ফোলা, মুখ থেকে দুর্গন্ধ নিঃসরণ। নাক্স ভমিকার ন্যায় কোষ্ঠবদ্ধ, বারংবার বেগ হয় অথচ দাস্ত খোলসা হয় না, সামান্য মলত্যাগ হয়।

ভ্যালেরিয়ানা ৩০—রোগী অস্থিরচিত্ত। অস্থিরতা এর একটি বিশেষ লক্ষণ। রোগী একস্থানে স্থির থাকতে পারে না। নাড়ি চঞ্চল। মস্তকে রক্তসঞ্চয়, উর্ধ্বাঙ্গ এবং নিম্নাঙ্গের রোগ পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়। সায়েটিকা। দাঁড়ালে অথবা পা মেঝেতে ছড়িয়ে দিলে বেদনা বাড়ে, চলাফেরা করার সময়ে কমে। রোগী নিজেকে হালকা মনে করে, মনে করে সে যেন হাওয়ায় উড়ছে। হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্থদের পক্ষে এটা বিশেষ উপযোগী। স্নায়বিক উত্তেজনা এবং স্নায়ুর নানাবিধ পীড়া, আক্ষেপিক হাঁপানি। স্নায়ুরোগে সুনির্বাচিত ঔষধে উপকার না হলে এটা প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়।

ভেরেট্রাম অ্যালবাম ৩০—বিষাদ, উন্মত্ততা, মূর্ছা, সন্ন্যাস, হৃৎশূল ইত্যাদি ব্লাড প্রেসারের নানাবিধ অবস্থাতেই এটা বিশেষ উপকারী হয়ে থাকে। রোগী একাকী থাকতে

ভালোবাসে না অথচ কারও সঙ্গে আলাপাদি করতেও ইচ্ছা করে না। মাথার উপর যেন একখানি বরফ রয়েছে এইরূপ মনে হয় (সিপিয়ার ন্যায়)। মস্তিষ্ক ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে এইরূপ মনে হয়। অস্থিরতা, দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে হৃৎকম্প। হৃৎস্পন্দন সবিরাম, নাড়ি মৃদু এবং অসমান। রোগিণী মনে করে তার গর্ভসঞ্চার হয়েছে।

সারাকা ইণ্ডিকা ২০০—জরায়ুসংক্রান্ত ব্যাধিযুক্ত, গুল্মবায়ুগ্রস্ত স্ত্রীলোকদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সহজে ক্রন্দনশীল এবং সহজে উত্তেজনশীল স্বভাব। কাজ করতে অনিচ্ছা। মাথাধরা—সম্মুখ কপালে বেশি, মাথাধরার জন্য রোগিণী অচৈতন্য হয়ে পড়ে। জরায়ুর প্রতিক্ষিপ্তক্রিয়ার (reflex action) জন্য মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, প্রচুর পরিমাণ ঋতুস্রাব হলে মাথাধরা কমে। মাথাঘোরা, বমনেচ্ছা। খোলা বাতাসে সমস্ত উপসর্গের উপশম। হৃৎস্পন্দন নড়াচড়ায় বাড়ে। হৃৎপ্রদেশে বেদনা, নাড়ি দ্রুত, পূর্ণ ও শক্ত।

অ্যাম্ব্রা গ্রিজিয়া ৩০—মাথাঘোরা বিশেষত বৃদ্ধদের স্নায়বীয় শিরোঘূর্ণন। মস্তকের উপরার্ধে ছিন্নকর (tearing) বেদনা, দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধতা, অস্বচ্ছন্দ নিদ্রা বা নিদ্রাশূন্যতা, কাজকর্মের গোলযোগহেতু রোগীর অনিদ্রা—সারারাত্রি উঠে বসে থাকতে হয়। বিষণ্ণতা এবং স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতা, চিন্তাশক্তিরও অভাব, রোগী সহজে কোন কথার অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না। গুল্মবায়ুগ্রস্থ স্ত্রীলোকদের রক্তচাপে বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। অবসন্নতা, অনিদ্রা, মানসিক উপদ্রবহেতু দৃষ্টি ও শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা।

অ্যামিল নাইট্রেট ৩০—মুখমণ্ডলে এবং মস্তকে রক্তাবেগ, বক্ষঃস্থলে পূর্ণতা বোধ এবং অব্যক্ত যাতনা। শ্বাসকষ্ট, শারীরিক বা মানসিক সামান্য পরিশ্রমেই মুখমণ্ডলে রক্তাবেগ এর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ডাঃ ন্যাশ বলেন ঃ I have cured a very bad of chronic blushing or flushing of blood to the face on the least excitement either mental or physical. স্ত্রীলোকগণের রজোনিবৃত্তিকালের রক্তচাপে উপযুক্ত লক্ষণে এটা বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। রোগী মুক্ত বায়ুর জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে।

অ্যাডোনিস ভারনেলিস ৩x—নাড়ির গতি কমিয়ে এবং হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনশক্তি বৃদ্ধি করে এটা হৃৎপিণ্ডের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং ধামনিক প্রসারণকে (arterial tension) বাড়িয়ে দেয়। মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়াহীনতা, অত্যন্ত স্বল্পপরিমাণ মূত্র, অনিয়মিত এবং বিষমগতিবিশিষ্ট নাড়ি, সামান্য সঞ্চালনেই হৃৎকম্প। হৃৎপিণ্ডের নানাবিধ রোগে এটা বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি থেকে নানাবিধ উপসর্গ বা ব্যাধি, শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানি, হৃৎকম্প এবং হৃদাবরক ঝিল্লীপ্রদাহ, মাথাঘোরা, মাথা হালকাবোধ, পশ্চাৎ মস্তক থেকে সম্মুখ ললাট পর্যন্ত এবং চক্ষুদ্বয়েও বেদনা।

অ্যাসটিরিয়াস রুবেনজ ৩০—রোগী হঠাৎ উত্তেজিত হয়, চটে উঠে, মাথা এত গরম,

মনে হয় তার উপর আগুন রয়েছে। প্রাতঃকালে মাথা ধরে, দিনের বেলায় থাকে না। আবার সন্ধ্যাকালে ধরে। অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধতা—মলকাঠিন্য। মৃগী ও সন্ন্যাসরোগে উপকারী। পথ চলার সময়ে রোগী ইচ্ছামতো চলতে পারে না, হাতপা ঘোরাতে পারে না—পেশিসকল ইচ্ছামতো কাজ করে না।

ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম ৩x (বিচূর্ণ)—উচ্চ রক্তচাপসহ যকৃতের যান্ত্রিক বিকৃতি (organic degenaration), মধুমেহ, বহুমূত্র, পাকস্থলী এবং অন্ত্রে ক্ষত। পাকস্থলী এবং অন্ত্রের সঙ্গমস্থলে (pylorus) জ্বালাকর বেদনা। ধ্বজভঙ্গ, আহারের পরে উদরে বায়ুসঞ্চয়, অস্বাভাবিক রাক্ষুসে ক্ষুধা। প্রচুর পরিমাণ প্রস্রাব, অসাড়ে প্রস্রাব, প্রস্রাব করবার সময়ে মূত্রনালীতে জ্বালা।

এক্স-রে ২০০—শারীরিক এবং মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং সঞ্জীবনী শক্তির বলাধানে এটি একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (... Arouses the reactive vitality, mentally and physically.- Dr. Boericke)। সঙ্গমেচ্ছার লোপ এবং রতিশক্তি হ্রাস; সাইকোটিক বা অন্যান্য মিশ্রিত দোষ (sycotic and other mixed infections) শরীরের মধ্যে চাপা থাকলে ইহা প্রয়োগে বহির্গত হয়, সেইজন্য রে সম্বন্ধে বলা হয় ঃ homoeopathic action is centrifugal towards the periphery. অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক ক্রিয়া কেন্দ্রাপসারী (tending to recede from the centre).

কফিয়া ২০০—অনিদ্রায় বিশেষ উপকারী। সন্ন্যাস। মাথাধরা, স্নায়ুশূল রোগীর অনুভবশক্তি এত বেশি যে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরও সহজে পড়তে পারে, অতি সামান্য স্পর্শও সহজে বুঝতে পারে, সামান্য গন্ধও সহজে ধরতে পারে। অতিরিক্ত চিন্তা বা উচ্ছ্বাসের জন্য নিদ্রাহীনতা। পর্যায়ক্রমে হাসি ও কান্না, অর্ধশিরঃশূল, মাথাধরার জন্য মনে হয়, মস্তিষ্ক পিষে খণ্ড খণ্ড হচ্ছে। রোগী যদি কফিপানে আসক্ত না হয়, তার মানসিক আঘাত হতে জাত অর্ধশিরঃশূলে বিশেষ উপযোগী হয়ে থাকে।

ক্রেটিগাস ২x—হৃৎপিণ্ডের গতি দুর্বল এবং অনিয়মিত। হৃৎপিণ্ডের ভালভের ক্রিয়াহীনতা। নাড়ি ক্ষুদ্র এবং অনিয়মিত, হৃৎপ্রসারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারে না। মাথাঘোরা, রোগীর সর্বদা বায়ুপ্রাপ্তির ইচ্ছা। অনিদ্রা, মস্তকের পশ্চাদ্দিকে এবং স্কন্ধদেশে বেদনা, সামান্য পরিশ্রমেই শ্বাসকষ্ট অথচ নাড়ির বেগ বাড়ে না। হৃৎপ্রদেশে বেদনা। হৃৎপিণ্ডের গোলযোগে এর তুল্য ঔষধ আর নেই বললেই হয়। (ডাঃ গ্রীন নামক একজন আইরিস চিকিৎসক এই ঔষধ দ্বারা হৃৎরোগ চিকিৎসায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন; কিন্তু তিনি জীবিতকালে এর নাম প্রকাশ করেন নাই। তার মৃত্যুর পরে তার কন্যা রে নাম দেন ক্রেটিগাস।)

চায়না ৩০—সাময়িকতা (periodicity) এর একটি বিশেষ লক্ষণ। এক দিন, দুই দিন, সাত দিন বা চৌদ্দ দিন অন্তর উপসর্গের বৃদ্ধি। শরীরের রসরক্তাদির অতিরিক্ত ক্ষয়ের জন্য দুর্বলতা; অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়, মাথাধরা এত প্রবল, মনে হয় যেন মাথার খুলি ফেটে যাবে। শুলে বা বসলে বাড়ে এবং দাঁড়ালে অথবা চলতে থাকলে কমে যায়। মস্তকে এবং ক্যারোটিড ধমনীতে দপ্‌দপ্‌কর বেদনা, মাথার তালুতে স্পর্শদোষ, রোগী মাথায় চিরুনি দিতে পারে না। দুর্বলতা, অজীর্ণতা, পেটফাঁপা।

অরাম মিউরিয়্যাটিকাম নেট্রনেটাম ৩x (বিচূর্ণ)—স্নায়ুক্রিয়ার ব্যাঘাত হেতু (owing to the disturbed function of the nervous mechanism) রক্তচাপ বেড়ে গেলে এর প্রয়োগ প্রায় অব্যর্থ। জরায়ু, ডিম্বকোষ প্রভৃতি জরায়ুঘটিত ব্যাধিযুক্ত স্ত্রীলোকগণের এবং উপদংশদুষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে এটি অধিকতর উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। জরায়ুর টিউমাররোগে এর তুল্য ঔষধ আর নাই। ডাঃ বার্নেট এর বিশেষ প্রশংসা করে গেছেন।

ভেরেট্রাম ভিরিডি ৩০—রক্তপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট রোগীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। নাড়ির গতি ধীর অথচ কঠিন হওয়া এর একটি বিশেষ লক্ষণ। সর্বশরীরেই নাড়ির গতি অনুভূত হয়, ডান উরুতে বেশি। সর্দিগর্মিতে মস্তকে অত্যধিক রক্তসঞ্চয়, মেরুদণ্ডে বেদনা, মাথাঘোরা এবং বমনেচ্ছা জিহ্বার ঠিক মাঝখানে লম্বালম্বিভাবে একটা পরিষ্কার সরু লাল দাগ পড়ে, এটি ভেরেট্রাম ভিরিডির বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ।

অ্যাট্রোপিন সালফ ৩x (বিচূর্ণ)—জ্বরজ্বরভাব, সেই সঙ্গে প্রত্যহ মাথাধরা, দীর্ঘকালস্থায়ী শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, অর্ধ শিরঃশূল, স্নায়বীয় প্রকৃতির মাথাধরা—এই অবস্থায় ডাঃ হেল এর বিশেষ প্রশংসা করেন। অনিদ্রা, মস্তিষ্কের রক্তস্বল্পতাহেতু অবসন্নতা, স্নায়বীয় হৃৎস্পন্দন, হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ির গতি ক্ষীণ ও দ্রুত। অর্ধ শিরঃশূল, মাথাধরার সময় রোগী পাগলের ন্যায় হয়, কিছুই চোখে দেখে না। ডাঃ হিউজেস এই অবস্থায় এর ২x শক্তি প্রয়োগে সর্বদাই সফলকাম হয়েছেন।

জেরোফাইলাম ৩০—এর কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ আছে। সেই সকল লক্ষণযুক্ত ব্লাড প্রেসার রোগীতে এটি সময়ে সময়ে বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে। রোগী নাম ভুলে যায়, লিখবার সময়ে শব্দের শেষ অক্ষরটি প্রথমে লেখে। একটা সাধারণ শব্দ লিখতেও বানান ভুল করে বসে। এর আরও একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, সে প্রস্রাবের বেগ ধারণ করতে পারে না, পথ চলবার সময়ে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয়।

ককিউলাস ইণ্ডিকাস ৩০—অত্যন্ত উদগার এবং জল ও শ্লেষ্মা বমনের সঙ্গে স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, মস্তকে শূন্যতা ও মত্ততার ন্যায় অনুভব, বমনেচ্ছাসহ মাথাঘোরা—বিছানায় উঠে বসলে বাড়ে। নৌকায় বা গাড়িতে আরোহনের জন্য বমনসহ মাথাধরা। মস্তকের জড়তা, পানাহারে বাড়ে। অত্যন্ত দুর্বলতা, সোজা হয়ে দাঁড়াতে কষ্ট হয়। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতেও রোগী কষ্ট বোধ করে, বিষয়কর্মের চিন্তা, উৎকণ্ঠা, অস্থিরতার জন্য অনিদ্রা এবং তজ্জনিত উপসর্গ।

কার্বোনিয়াম হাইড্রোজেনিসেটাম ৩x—রোগী নিজেকে অত্যন্ত বড়, জীবনকে সুখময় মনে করে। মাথাধরা, মাথাঘোরা এবং অচৈতন্য অবস্থা। মানসিক জড়তা, হৃৎস্পন্দন অতি কষ্টে অনুভব করতে হয়। নাড়ি দ্রুত, দৃঢ় এবং অনিয়মিত অথবা দুর্বল ও ক্ষীণ, কম্প এবং হাতে পায়ে অসাড় বোধ। সন্ন্যাসরোগে বিশেষ উপকারী।

এপিস মেলিফিকা ২০০—মূত্রযন্ত্রের প্রদাহসহ রক্তচাপ, মূত্রকৃচ্ছ্র বা স্বল্পমূত্র, মলিনবর্ণের অল্প পরিমাণ প্রস্রাব, অবারিত প্রস্রাব—হাঁচবার এবং কাশবার সময়েও অজ্ঞাতসারে হয়, মস্তকে পূর্ণতাবোধ—মনে হয় যে মস্তকটি বড় হয়েছে। মাথাঘোরা, সেই সঙ্গে বমনেচ্ছা, নিদ্রালুতা এবং পিপাসাহীনতা, নিদ্রাকালে চিৎকার এবং সহসা চমকিত হয়ে উঠা।

থেরিডিয়ন ২০০—এর দুইটি অদ্ভুত লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রথমত, রোগী মনে করে সময় অতি দ্রুত চলে যাচ্ছে, দ্বিতীয়ত, যেন সামান্য শব্দও রোগীর শরীর ভেদ করে যাচ্ছে, সেইজন্য বমনেচ্ছা এবং বমন উপস্থিত হয়। দন্তশূল—দাঁতের মধ্য দিয়ে শব্দ ভেদ করে যাচ্ছে এইরূপ মনে হয়। মাথাধরা আরম্ভ হয় প্রথম চলবার সময়ে, শয়ন করলে বাড়ে (ল্যাকেসিসের ন্যায়)। অপর কেহ ঘরের মধ্যে চলাফেরা করলে অথবা মাথা সামান্য নড়াচড়া করলেও বাড়ে। সামান্য সঞ্চালনে এবং চক্ষু বুজলে বমনেচ্ছা, বমন এবং মাথাঘোরা উপস্থিত হয়, হৃৎপিণ্ড স্থানে বেদনা এবং অস্বস্তিবোধ।

বেনজোয়িক অ্যাসিড ২০০—ঘোড়ার প্রস্রাবের মতো প্রস্রাবে উগ্র কটু গন্ধ এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ। প্রমেহ বা উপদংশবিষদুষ্ট ধাতু, সেই সঙ্গে বাত। গেঁটেবাতে আক্রান্ত রোগীদের ব্লাড প্রেসারে বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হাঁপানি কাশি, রাত্রিতে এবং ডান পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডস্থানে বেদনা।

অ্যাসিট্যানিলিডাম ৩x—উচ্চ গাত্রতাপ, ১০৫° বা তার উপর। হৃৎপিণ্ডের গতিও অত্যন্ত দ্রুত ও অসম (irregular) উচ্চ রক্তচাপ। এটি প্রয়োগে শীঘ্রই গাত্রতাপ ও উচ্চ রক্তচাপ কমে। হৃৎপিণ্ডের ঊর্ধ্বগতি নিম্নগামী হয়, হিমাঙ্গাবস্থা এবং সর্বশরীর পাণ্ডুবর্ণ। শরীরের বিবর্ণতা। মস্তক যেন বড় হয়েছে—এইরূপ মনে হয়। মূর্ছা, প্রস্রাবে অ্যালবুমেন, পায়ে শোথ, রোগীর ঠাণ্ডা আদৌ সহ্য হয় না।

কার্বোনিয়াম অকসিজেনিসেটাম ৬x—জড়বুদ্ধি মাতালের ন্যায় এবং অচৈতন্য অবস্থা, দীর্ঘ সময় ধরে নিদ্রালুতা। অবসাদগ্রস্থ মন, বোকাটে, মাথাঘোরা এবং মাথাব্যথা, অত্যন্ত

দপ্‌দপ্‌কর বেদনা, সম্মুখ কপালে বেদনা, মাথাঘোরার সঙ্গে স্বল্পদৃষ্টি। যে সব বস্তু দেখা যায় সবই যেন কাঁপছে মনে হয়, হৃৎপিণ্ডস্থানে অসহ্য বেদনা এবং দপ্‌দপানি। সমস্ত বায়ুনালীতে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় শব্দ। সায়েটিকা বাত এবং তাতে বিদ্ধবৎ বেদনা, চাপে অথবা সঞ্চালনে বাড়ে না।

অ্যাসেটিক অ্যাসিড ৩০—অত্যন্ত দুর্বলতা বিশেষত হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা, ঘনঘন মূর্ছা, শ্বাসকষ্ট, মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয়। দুইটি রগে ধমনী রক্তপূর্ণ বলে মনে হয়, দুইটি কপোল আরক্তিম। অত্যন্ত জ্বালাকর পিপাসা, অম্ল-উদগার এবং অম্লবমন। প্রত্যেকবার আহারের পরেই বমন। পেটফাঁপা, প্রচুর পরিমাণ মলিন মূত্রত্যাগ, পদদ্বয়ে শোথ। শোথ ও উদরীযুক্ত ব্লাড প্রেসার রোগীতে বিশেষ উপযোগী।

জিফোসুরা ৩০—এর অপর নাম লিমুলাস (limulus)। ডাঃ হেরিং এই ঔষধের আবিষ্কারক। ডাঃ লিপিও এর আংশিক প্রুভিং করেছিলেন। শারীরিক এবং মানসিক অবসন্নতা এর বিশেষ লক্ষণ। তন্দ্রালুতা বা ঘুমঘুম ভাব, বিশেষত সমুদ্রস্নানের পরে। এর উদরের লক্ষণও উল্লেখযোগ্য। জলবৎ মলের সঙ্গে পেট খামচানো বেদনা। এইজন্য সরল কলেরাতেও এটি ব্যবহৃত হয়।

থ্যাস্পিয়াম অরিয়াম ৬x—বিষাদবায়ু, আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা, পর্যায়ক্রমে হর্ষ ও বিষাদ (পালসেটিলা, ইগনেসিয়া, সিপিয়ার মত) অবিরত পদসঞ্চালন (জিঙ্কামের ন্যায়) এবং নিদ্রাকালে তাণ্ডব এর বিশেষ লক্ষণ। স্ত্রীলোকদের বাম ডিম্বাশয়ে সবিরাম বেদনা এবং ঋতু রুদ্ধ হয়ে প্রচুর পরিমাণ হাজাকর শ্বেতপ্রদর।

দশম অধ্যায়

হাই ব্লাডপ্রেসারের প্রতিষেধক ব্যবস্থা

ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে যে Prevention is better than cure, রোগ ধরিয়ে তা অরোগ্য করার থেকে রোগ যাতে না ধরে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন সর্বাংশে শ্রেয়ঃ। এই কথাটি কিন্তু হাইপ্রেসারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য। কারন এটা একটি ধাতুগত এবং জীবনব্যাপী রোগ। একবার ধরলে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং চিকিৎসা করার থেকে এই রোগটি যাতে না ধরে তার প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহন করার উপর জোর দিতে হবে বেশী। বাল্যকাল থেকে এই রোগটি যদি উপযুক্তভাবে প্রতিষেধ করা যায় তবে এর হাত থেকে অনায়াসেই রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

এই রোগটি কিন্তু কাউকে না জানিয়ে তড়িঘড়ি করে হঠাৎ আক্রমন করে না। আক্রমনের

মুহুর্তে খুবই মৃদু ভাব থাকে এবং ক্রমশঃই তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে পেতে জটিল আকার ধারন করে। এই রোগের বীজ রোপিত হয় শিশু অবস্থা থেকেই। সুতরাং এর যথার্থ প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হলে শৈশবকাল থেকেই তা অবলম্বন করতে হবে। তানা হলে ঐ বীজ যতই অঙ্কুরিত হয়ে একটি পূর্ণ বৃক্ষে পরিনত হতে থাকবে ততই তা চিকিৎসকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার নাগালের বাইরে চলে যাবে। অবশেষে ঐ বৃক্ষই ফলে ফুলে বিকশিত হয়ে মহীরুহে পরিনত হয়ে রোগীর মৃত্যুর কারন হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং এর প্রতিকারের যথার্থ সময় শৈশব অবস্থা।

বহু পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ করে দেখা গেছে যে বাচ্চারা খুব অনুকরন প্রিয় হয়। তারা যা দেখে যা শোনে তাই সে হতে চায়এবং তাই সে করতে চায়। তাদের সামনে ওষুধ খাওয়া, রোগের কথা বলা, বংশানুক্রমিক রোগ যে সন্তানে সক্রামিত হয় এরূপ আলোচনা করা অমঙ্গলকর। কারণ শিশুদের অবচেতনমন অধিক সক্রিয় থাকে। অবচেতন মনে যে চিন্তা সুপ্তভাবে গভীরে চলে যায় ও রেখাপাত করে তা পরবর্তীকালে তার নিজ অসাক্ষাতেই সুপ্তভাবে মনের সংস্কার রূপ ধারন করে। এই সংস্কারই ধীরে ধীরে ব্যক্ত শরীরে বিকৃতি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাছাড়া যেহেতু শিশুরা খুব অনুকরন প্রিয় হয় তাই তাদেরকে এই সময় থেকেই জীবনযাত্রার ভঙ্গি, খাওয়া দাওয়া চিন্তা ভাবনা, ইত্যাদি সবদিক থেকে হাইপ্রেসারের অনুপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। যেহেতু তারা মা-বাবাকেই সর্বক্ষণের জন্য কাছে পায় তাই মা বাবার জীবন যাত্রার ভঙ্গি এমন করতে হবে যা শিশুদের কাছে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের উদাহরন স্বরূপ হয়ে দাড়ায়।

বহুগবেষনা দ্বারা এটা প্রমানিত হয়েছে যে লবন গ্রহন করি তাতেই আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় লবন যথোপযুক্ত মাত্রায় পাওয়া যায়। তবে খাদ্যকে সুস্বাদু করতে লবনের ব্যবহার হয়। কিন্তু প্রথম থেকেই যদি এই বিষ ভক্ষণ থেকে বিরত থাকা যায় কিংবা একেবারেই পরিমিত মাত্রায় খাওয়া যায় অথবা ভেষজ লবন 'বিটনুন' খাওয়ার অভ্যাস করা যায় তবে শিশুরা তা অনুকরন করে বড় হয়েও অনুরূপ আচরন করবে। লবন হাইপ্রেসারের একটি বিশেষ উত্তেজক কারণ। পেঁয়াজ ডিম এবং পক্ষীমাংস এই তিনটি দ্রব্য প্রায় সর্বধর্মেই নিষিদ্ধ খাবার হিসাবে ঘোষিত। প্রতিটি মা বাবার উচিৎ এই তিনটি দ্রব্য সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করে শিশুদের সম্মুখে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তাদের সুপ্ত মনে একটি সংস্কার তৈরী করে দেওয়া। এই তিনটি খাবার কেবলমাত্র হাইপ্রেসারেরই নয় মানসিক চারিত্রিক এবং দৈহিকও বিভিন্ন দোষের আকর। হাইপ্রেসারের সুপ্ত বীজ এই তিনটি দ্রব্যে সমধিকরূপে নিহিত রয়েছে।

পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মানসিক উত্তেজনা এই রোগের একটি অন্যতম প্রধান কারণ। সুতরাং এমনভাবে জীবন যাপন করতে হবে যে কোন অবস্থায়ই যেন মানসিক ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে। সামান্যতেই উত্তেজিত হলে তা পরবর্তীকালে ধাতে পরিনত

হবে যা আর জীবন ব্যাপী পাল্টানো সম্ভব নয়। শিশুরা মা বাবার আচরন অবচেতন মনে গ্রহন করে ঐ ক্ষুদ্র অবস্থায়ই স্বল্পে উত্তেজনা রূপ হাইপ্রেসারের বীজ রোপিত করবে। সুতরাং নিজেদের আচার আচরণ এমন ভাবে নিয়ন্ত্রন করতে হবে যার মধ্যে শান্ত সৌম্য ভাব বর্তমান থাকে। মানসিক আনন্দভাব যেন কোন অবস্থাতেই বিনষ্ট না হয় তার দিকে নজর দিতে হবে। চিন্তা দোষের নয়, কিন্তু দুশ্চিন্তা হাইপ্রেসারের সহায়ক। শোক দুঃখ দুশ্চিন্তা, হতাশা ইত্যাদি থেকে মনকে সরিয়ে এনে সদানন্দভাবে বিরাজ করার শিক্ষা যেন শিশুরা মা বাবার কাছে শৈশবকাল থেকেই গ্রহন করতে পারে সেদিকে প্রত্যেক অভিভাবকের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ।

যারা শুয়ে বসে কাল কাটায় তারা হাইপ্রেসারের শিকার হয়। প্রত্যহ মর্নিং ওয়াক এবং শরীর চর্চ্চাকারী কিছু আসন মুদ্রা বা খালি হাতে ব্যায়াম সকলেরই কর্তব্য। এতে একধারে যেমন শিশুরাও এই শিক্ষা গ্রহন করবে অপরদিকে বড়দেরও হাইপ্রেসার কিংবা অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের রোগের হাত থেকে মুক্তি দিতে সহায়তা করবে। একদিকে মাত্রাধিক পরিশ্রম যেমন বিভিন্ন রোগের কারন বিপরীতক্রমে আবার অলসজীবন যাপনও রোগের একটা প্রধান কারণ। সুতরাং উভয়ই বর্জন করা প্রয়োজন।

শৈশবাবস্থা থেকে দৈনন্দিন জীবনে নিয়মানুবর্ত্তিতা পালন করলে হাইপ্রেসারের কোপে পড়তে হয় না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে দৈনন্দিন জীবনে নিয়ামানুবর্ত্তিতার অভাবই এই রোগের একটা অন্যতম কারন। সুতরাং শৈশবাবস্থা থেকেই নিয়মানুবর্ত্তিতা পালনের জন্য একটা অভ্যাস গড়ে তোলা উচিৎ।

বয়স অনুপাতে বেশী মোটা হয়ে যাওয়া এবং ওজন অধিক পরিমানে বৃদ্ধি পাওয়া বা অতিরিক্ত চর্ব্বি হওয়া হাইপ্রেসারের একটি মুখ্য কারণ। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্র যাতে তৈরী হতে না পারে তার জন্য শৈশব অবস্থা থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যখনই ওজন বৃদ্ধি মেদবৃদ্ধি বা শরীর অধিক মোটা হবে তখনই তার প্রতিকারে সযত্ন হতে হবে। খাদ্য, পরিবেশ, আচার আচরনের পরিবর্তন ঘটিয়ে বা যতদুর সম্ভব প্রাকৃতিক নিয়মে এই সমস্ত লক্ষণের মোকাবিলা করা কর্তব্য। অতিরিক্ত তৈলজাতীয় খাদ্য ছোটবেলা থেকেই বর্জন করা ভাল।

ধূমপান, দোক্তা, তামাক, চা, কফি ইত্যাদি তামাক জাতীয় দ্রব্য শরীরের রক্তকে দূষিত করে হাইপ্রেসারের সৃষ্টি করে। ধূমপানে কেবল মাত্র যে ধূমপানকারীরই ক্ষতি হয় তা নয় সে একাধারে অজস্র মানবের ক্ষতিসাধন করে থাকে। ধূমপানরত ব্যক্তির আশেপাশে যারা উপস্থিত থাকে তাদেরও ঐ ঘুম ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে রক্ত বিষাক্ত করে তোলে। সুতরাং শুধু ধূমপান বর্জন করলেই এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না এমন একটা সংস্কার সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাতে আশে পাশে কোন ব্যক্তি ধূমপান করলে সেখানে অপরে উপস্থিত না থাকে। তাছাড়া শিশুদের সামনে ধূমপান করলে তাদের ক্ষতিতো হয়ই প্রকারান্তরে

শিশুকে ভবিষ্যৎকালে ধূমপানের শিক্ষাও এর মধ্যে নিহিত থাকে।

মদ্যপানও হাইপ্রেসারের একটি উত্তেজক কারণ। আমেরিকা, চীন, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদিতে একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে হাইপ্রেসারে আক্রান্ত রোগীদের অধিকাংশই মদ্যপায়ী। যারা নিয়মিত মদ্যপান করে থাকেন তাদের সার্বিক উত্তেজনা বশতঃ ঐ সময়ের জন্য রক্তস্রোত দ্রুত হারে বৃদ্ধি হায়। এই ভাবে যদি প্রত্যহ চলে তবে তা স্থায়ী আকার ধারন করে। সুতরাং সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে দেহের রক্তস্রোত দূষিত হলে (Toxic Conditions of the blood) রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। দেহের মধ্যে নানা জাতীয় বিষ উৎপন্ন এবং সঞ্চিত হলে ধমনীগাত্র শক্ত ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে, ফলে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘকাল ধরে কোষ্ঠবদ্ধতায় ভূগলে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘকালস্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতা রক্তচাপ বৃদ্ধির একটি অন্যতম প্রধান কারণ। কারণ কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য অস্ত্রের দূষিত রস শোষিত হয়ে রক্তকে খারাপ করে। শরীরের রক্ত দূষিত হয় বলেই মানুষ হাইব্লাডপ্রেসারে আক্রান্ত হয়। রক্ত দূষিত না হলে সাধারণতঃ রক্তচাপবৃদ্ধি হতে পারে না। দেহের মধ্যে প্রবাহিত রক্তস্রোত থেকেই দেহের যাবতীয় যন্ত্র নিজ নিজ খাদ্য গ্রহন করে পুষ্টি লাভ করে থাকে। রক্ত বিষাক্ত হলে অন্যান্য যন্ত্রাদির ন্যায় ধমনীও আক্রান্ত হয় এবং স্বীয় পুষ্টি সঞ্চয়ে ব্যর্থ হয়ে দূর্বল হয়ে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এর পরিনামই হাইপ্রেসার।

সুতরাং শুধু ওষুধ নয়, হাইপ্রেসারকে চিকিৎসা করতে আগে তাকে আহ্বান করতে হয় পরে চিকিৎসা করে ওষুধ নিব্যাচন। কিন্তু যেহেতু রোগ আরোগ্যের চেয়ে রোগকে প্রবেশ করতে না দেওয়াই শ্রেয়। তাই ওষুধের চেয়ে এই ব্যবস্থাগুলি যথাযথরূপে প্রতিপালনই শ্রেষ্ঠ উপায় বলে বিবেচিত হওয়া উচিৎ।

একাদশ অধ্যায়

হাইপ্রেসারের আনুষঙ্গিক চিকিৎসা

হাইপ্রেসারের আনুষঙ্গিক চিকিৎসার মধ্যে মহামতি হ্যানিম্যান তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'অর্গানন অব মেডিসিনে' বিভিন্ন প্রকার মর্দ্দনের কথা উল্লেখ করেছেন ২৯০ নম্বর সূত্রে। তিনি রোগীর ধাতু প্রকৃতি অনুসারে নানা প্রকৃতির অঙ্গমর্দনের কথা বলেছেন এবং ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। উত্তেজনাপ্রবন বা অসহিষ্ণু ব্যক্তির ক্ষেত্রে মর্দন অনুগ্র (Moderate) এবং পরিমিত (not excessive) হবে। মর্দন নানা প্রকারের বা প্রকৃতির হয় যেমন— উগ্র, অনুগ্র (পেযন (rubbing), মোচড় (wringign) গভীর, হাল্কা, আঘাত, চাপড় ইত্যাদি। রোগ আরোগ্যের ক্ষেত্রে মর্দনের ভূমিকা বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। বহুকাল থেকেই আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধনী ব্যক্তিরা ভৃত্যের দ্বারা তাদের অঙ্গ মর্দন

করিয়ে থাকে। এতে দেখা যায় যে রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়ার সহায়তা হয়ে থাকে এবং ধমনীগাত্র শক্ত বা ভঙ্গুর হলেও এর দ্বারা উপকার হয় ও নমনীয় হয়। যার ফলে হাইপ্রেসার থাকলেও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বাধা উৎপাদন কারী ধমনীগাত্রের অনমনীয়তা দুর হয়এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া অনায়াসে চলতে পারায় হাইপ্রেসার কমে যেতে সাহায্য করে। সুতরাং অঙ্গমর্দন হাইপ্রেসারের রোগীর পক্ষে একটি উপকারী উপায়। অঙ্গমর্দন ক্রিয়ায় রক্তের চাপ ভেঙে রক্ত স্রোতকে স্বাভাবিক করে রোগমুক্তিকে সহায়তা বা ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে।

উচ্চ রক্ত চাপে রোগীর মানসিকতা অত্যন্ত উগ্র হয়ে যেতে দেখা যায়। মানসিক উত্তেজনা রক্তচাপকে তাৎক্ষনিক বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। সুতরাং এই রোগীকে এমনভাবে পরিচর্য্যা করতে হবে যাতে কোন অবস্থায়ই মানসিক উত্তেজনা না আসে, সর্বদা মনে আনন্দভাব বর্তমান থাকে। যুক্তিহীন কথা বাত্রা বললেও তার প্রতিবাদ করতে গেলে উত্তেজিত হয়ে রক্তচাপকে বাড়িয়ে বিপদ সীমা অতিক্রম করে বিপদ ঘটাতে পারে। সুতরাং যেন কোন অবস্থাতেই মানসিক শান্তভাব নষ্ট না হয় তার দিকে নজরদারী করা এই রোগের একটি অনুষঙ্গিক চিকিৎসা বলে মনে কার উচিৎ।

রোগীর অধিকদিন ধরে কোষ্টবদ্ধতা চলতে থাকলে রক্ত বিষাক্ত হতে পারে। বিষাক্ত রক্ত হাইব্লাড প্রেসারের একটি মূল কারণ। কোষ্টবদ্ধতা যদি বহু পুরাতনও হয়ে থাকে, হাইপ্রেসার চিকিৎকার সময় এই লক্ষটিকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং আনুষঙ্গিক চিকিৎসা হিসাবে ইসবগুল সরবৎ রাত্রে ভিজিয়ে রেখে সকালে খালিপেটে খেতে হবে। বেলের সরবৎ সোনামুখী পাতার জল ইত্যাদি কোষ্টবদ্ধতা নিবারক চিকিৎসা করতে হবে। বৎসরে যে সময়ে যে ফল পাওয়া যায় সেই সময়ের ফল অধিক পরিমানে খেতে হবে। সবুজ শব্জি পরিমান মত এবং শাকপাতা বেশী করে খেলেও কোষ্টবদ্ধতা নিবারিত হয়। ভোরবেলা ঘুমথেকে উঠে যতটা সম্ভব শীতল জল পান করাও একটি উত্তম ব্যবস্থা। প্রত্যূষে উষাপাণ কোষ্টবদ্ধতা নিবারনের যেমন একটি উৎকৃষ্ট উপায় আবার সারাদিন মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প করে জলপান করাও তেমনি বিশেষ হিতকর। হাইপ্রেসার রোগীর পক্ষে প্রত্যূষে এবং বারে বারে অল্প পরিমানে শীতল জলপান খুবই উপকারী। দূষিত রক্তকে পরিস্কার এবং দোষ শূন্য করতে জলের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দূষিত রক্তকে পরিস্কার ও দোষমুক্ত করতে পারলে ধমনীগাত্র স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইজন্য রক্তের চাপও কমে যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীগুলির মধ্যে যখন রক্ত চলাচল কমে যায়, তখনই রক্তের চাপ বাড়ে এইজন্য যেখানে দেখা যাবে যে ক্ষুদ্র ধমনী কৈশিকা প্রভৃতিতে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পেয়ে হাইপ্রেসার সৃষ্টি করছে সেখানে উক্ত ধমনী বা কৈশিকাতে যাতে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে শীতল ঘর্ষন বিশেষ উপযোগি। ঐ সকলস্থানে ভিজা গামছা রেখে তার ওপর হাত রেখে ঘর্ষন করতে হয়। রগরে রগরে স্নান করতে হবে। গরম জল গায়ে

ঢালবার পর আর ঠান্ডাজল নেওয়া চলবে না।

হাইপ্রেসারে উপবাস একটি প্রধান এবং বিশেষ আনুষঙ্গিক চিকিৎসা। বহুক্ষেত্রে অনেক অনেক রোগীর উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে উপবাসে এই রোগ যত দ্রুত এবং সঠিক ভাবে আরোগ্য হয় কোন ওষুধেই তদ্রূপ ফল হয় না। এইজন্য প্রখ্যাত চিকিৎসক ডঃ গাটম্যান বলেন ঃ Nothing can reduce high blood pressure than a period of fasting or a pure fruit die, which can be combined with bed rest. A vegetarian diet has proved definitely helpful. Microscopic examinations of the capillaries of persons experimenting with meat and vegetable diets has shown that a meat diet produce capillary contractions which disappears with change to a predominantly vegetarian diet.'

অর্থাৎ হাইপ্রেসারকে উপবাস বা কেবলমাত্র ফল আহার এবং সেই সঙ্গে বিছানায় পূর্ণ বিশ্রাম ব্যতীত আর কোন উপায়ই তাড়াতাড়ি হ্রাস কবা যায় না। নিরামিষ আহার এই বিষয়কে বিশেষভাবে সাহায্য করে বলে প্রমানিত হয়েছে। আমিষভোজী ও নিরামিষাশী উভয় শ্রেনীর রোগীর কৈশিকা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মাংস জাতীয় খাদ্য কৈশিকার সঙ্কোচন উৎপাদন করে, অথচ নিরামিষ আহারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সঙ্কোচন অতি দ্রুত দূরীভূত হয়ে যায়। সুতরাং উপবাস, ফলাহার, এবং বিশ্রাম যে এই রোগের অন্যতম প্রধান আনুষঙ্গিক চিকিৎকা এই বিষয়ে কোনও মত পার্থক্য নাই। উপবাসে স্বাভাবতঃই রক্তের চাপ কমে যায়। তাই হাইপ্রেসার রোগীদের প্রতি সপ্তাহে একদিন উপবাস বিশেষ হিতকর। যদি প্রতি সপ্তাহে উপবাস করতে কষ্ট হচ্ছে মনে হয় তবে প্রতি একাদশীতে উপবাস এবং অমাবস্যা পূর্ণিমায় নিশিপালন করবে অর্থাৎ ঐ রাত্রে আর কিছু খাওয়া চলবে না। যাদের শরীরে অধিক মেদ ও মাংস আছে তারা উপবাসের দিন কোন খাদ্য না খেয়ে শুধু ইচ্ছামত বিশুদ্ধজল বা লেবুর রস সহ জল পান করলে অধিক উপকার হবে। আর শীর্নকায় রোগীরা দুগ্ধ ও ফলাহার করবে। তবে প্রচুর পরিমানে জলপান করতেই হবে। কারন প্রচুর পরিমানে জল পানে দেহের দূষিত পদার্থ প্রস্রাবের সঙ্গে বেড়িয়ে যাবার সুযোগ পায়। এতে রক্ত পরিশুদ্ধ হয়ে রক্তের চাপও কমে যায়, কিন্তু কোন কিছু খাবার সময় বা খাবার ঠিক পর মুহূর্তেই জল পান করা উচিত নয়। খাবার ঠিক এক ঘন্টা আগে বা খাদ্যদ্রব্য হজম হয়ে খাওয়ার পরে খালিপেটে জলপান করা উচিৎ।

হাইপ্রেসারে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, উদ্বেগ, বিশেষ করে কাম, ক্রোধ, বিরক্তি এগুলোকে অতি যত্ন সহকারে বর্জন করতে হবে। কাম এবং ক্রোধ আশু উত্তেজনা কারক। অতি উত্তেজনার সঞ্চার হলে মস্তিষ্কের ধমনী ফেটে গিয়ে রোগীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটতে পারে। সুতরাং এই রোগে আক্রান্ত হলে কাম ক্রোধকে সর্বদা স্ববশে রাখতেই হবে। বহু পর্যবেক্ষণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে যারা মানসিকভাবে কামকে বর্জন করতে পারেনি, অথচ ঐ মানসিক কাম বলপূর্বক দেহদ্বারা রোধ করে রাখার চেষ্টা করে তারাই হাই

প্রেসারের শিকার হয় বেশী। সুতরাং সংসারী হাই প্রেসারের রোগীদের পক্ষে সহবাস অধিক হিতকর বলে পাশ্চাত্য চিকিৎসক সমাজ রায় দিয়েছে।

প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় বিশুদ্ধ উন্মুক্ত বায়ুতে ভ্রমন বিশেষ হিতকর। যারা মানসিক পরিশ্রম অধিক করেন তাদের পক্ষে তো উন্মুক্ত বায়ুসেবন অতি অবশ্যাই পালনীয়। যত বেশী সময় মুক্ত বায়ুতে থাকা যায় হাই প্রেসারের রোগীর পক্ষে ততই হিতকর। যারা অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করে থাকে তাদের প্রেসার যদি ২০০ মিলিমিটারের বেশী হয় এবং নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ১২০'র উপরে হয় তবে তাদের পক্ষে সম্পূর্নভাবে বিশ্রাম (বেড রেষ্ট) নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। এরূপ অবস্থায় পূর্ণ বিশ্রাম নিতেই হবে। যারা সাধারণতঃ ব্যায়ামকরে বা পরিশ্রমশীল তাদের পক্ষে মুক্তবায়ুতে মৃদু বিচরন, প্রাতঃভ্রমন বিশেষভাবে উপযোগি, আর যারা পরিশ্রম বিমুখ তাদের পক্ষে অঙ্গমর্দন, হাত, পা, বুক ইত্যাদিতে তেল দ্বারা ভালো করে মালিশ হাইপ্রেসার কমার পক্ষে বিশেষ হিতকর।

যাদের প্রেসার ১৮০ বা তদুর্ধে তারা যদি প্রত্যহ টাববাথে বসে স্নান করেন। সকালে সন্ধ্যায় ভ্রমন প্রানায়াম করেন এবং সহজপ্রানায়াম করেন তবে রক্তের প্রেসার অবশ্যই কমে আসবে। এই প্রনালীগুলি কিরূপ তা বলে দিচ্ছি। যথাযথভাবে হাইপ্রেসারের রোগীগনের এইগুলো পালন করতে হবে। টাব বাথ বলতে একটি বড় এমন জলপাত্র নিতে হবে যেটি বেশ বড় এবং তার মধ্যে সহজেই বসা যায়। এখন ঐ পাত্রে এমন পরিমান জল রাখতে হবে যেন বসলে নাভিদেশ জলে ডুবে যায়। এবার মাথায় খানিকক্ষণ শীতল জলের ধারা দিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে ঐ টাববাথে বসতে হবে। নজর রাখতে হবে যে নাভিদেশ যেন জলের মধ্যে থাকে।

এইরূপ টাব বাথে বসে প্রত্যহ সকালে ৪০ বার সহজ অগ্নিসার ধৌতি অভ্যাস করতে হবে। সহজ অগ্নিসার ধৌতির নিয়ম হল প্রথমে ডানহাতের বুড়ো আঙুলটি কোমরের ডানদিকে যে একটি খাঁজ রয়েছে তার ফাঁকে (অর্থাৎ বুকের একদম নিচের শেষ পাঁজরার হাড়ের নিচে এবং কটিদেশের হাড়ের ওপরে এই দুই হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে) স্থাপন করতে হবে। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটি একইভাবে বা দিকের বুক ও কোমরের হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে রাখতে হবে। এখন দুই হাতেরই মধ্যমা আঙুল নাভির ওপর বসাতে হবে এরপর দুই হাতেরই বুড়ো আঙুলকেই স্বস্থানে সুদৃঢ় রেখে সমস্ত আঙ্গুলগুলি দ্বারাই নাভিদেশকে সঙ্কুচিত করে মেরুদণ্ডের সঙ্গে সংলগ্ন করতে চেষ্টা করতে হবে। নাভিদেশ মেরুদণ্ডের সংলগ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাভির ওপর থেকে আঙুলগুলো ধীরে ধীরে আলগাকরে দিতে হবে। আবার আঙুলগুলো দ্বারা নাভিদেশকে সঙ্কুচিত করে মেরুদণ্ডে সংলগ্ন করতে হবে। পুনরায় সংলগ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আঙুলের চাপ ঢিলে করে দিতে হবে। এটাই হল সহজ অগ্নিসার ধৌতির প্রনীল, বাথটাবে বসে প্রত্যহ সকালে এই প্রনালী ৪০ বার অনুসরন করতে হবে। আর প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় ভ্রমন প্রানায়াম অভ্যাস করতে হবে। ভ্রমন

প্রানায়ামের প্রনালীটা একটু বলি, নির্মলবায়ু পূর্ণ খোলামেলা জায়গায় মেরুদণ্ডকে সরল ও টান রেখে হাটতে হাটতে এই প্রানায়ামটি অভ্যাস করতে হবে। প্রথমে ৪ বার পদক্ষেপের তালে তালে ১, ২, ৩, ৪ মনে মনে উচ্চারন করতে করতে উচ্চারনের তালে তালে দুই নাক দিয়েই শ্বাস গ্রহন করতে হবে। শ্বাস নেওয়া শেষ হওয়ামাত্রই অবার পদক্ষেপের তালে তালে শ্বাস ত্যাগ করতে হবে। প্রথমে এই ক্রিয়াটি প্রথম প্রথম ৩ মিনিট করে একটু বিশ্রাম এইভাবে ৯ মিনিট করতে হবে রপ্ত হলে ক্রমশ মাত্রা বৃদ্ধি করে ৩০ মিনিট পর্যন্ত করা যাবে। এরূপ টাববাথ, অগ্নিসার ধৌতি এবং ভ্রমন প্রানায়াম অভ্যাস করলে হাইপ্রেসার কমবেই।

দ্বাদশ অধ্যায়

হাইপ্রেসার রোগীর পথ্য

হাইপ্রেসার রোগীর জন্য রোগ প্রতিরোধার্থেই হোক আর নিবারনার্থেই হোক এমন পথ্য নির্বাচন করতে হবে যা সহজ পাচ্য এবং পরিপাক শক্তির বিশেষ সহায়ক, কারন পরিপাক শক্তির গোলযোগ বশতই শরীরের রক্ত বিষাক্ত হয়ে এই রোগের সৃষ্টি করে হাইপ্রেসার রোগীর পক্ষে দীর্ঘ্যদিন ধরে কোষ্ঠবদ্ধতা বা পরিপাকশক্তির কোনরূপ রোগে ভোগা ভালো নয়। ভুক্তদ্রব্য ঠিকমত হজম না হলে পেট গরম হয়। পেট গরম হলে ভুক্তদ্রব্য যথাযথ পরিপাক না হয়ে তাতে ক্ষারসঞ্চিত হয় এবং ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলিতে পচতে আরম্ভ করে। যেহেতু বায়ুর সাধারণগতি উর্দ্ধদিকে তাই রক্তের স্রোতও উর্দ্ধমুখী হয়ে মস্তিষ্ক আক্রমন করে এবং রক্তের উর্দ্ধমুখী চাপের সৃষ্টি করে। উর্দ্ধমুখী চাপের ফলে শরীরের কষ্টকর কতগুলো উপসর্গ এসে হাজির হয়। তাই হাইপ্রেসারের রোগীদের খাদ্য এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে তা সহজে হজম হয়, কোষ্ঠবদ্ধতা না জন্মাতে পারে এবং প্রত্যহ কোষ্ঠ সাফ হয়।

আমরা যে খাদ্য গ্রহন করি তা পরিপাক হওয়ার পর ক্ষার এবং অম্ল এই দুই প্রকারের দ্রব্যে পরিনত হয়ে থাকে। এই দুইটি পদার্থের স্বাভাবিক একটি নির্দিষ্ট অনুপাত আছে। স্বাভাবিক অনুপাতের অভাবে রক্তে যদি ক্ষারধর্মের ন্যূনতা দেখা দেয় তবে হাইপ্রেসার এবং অন্যান্য কিছু আনুসঙ্গিক উপসর্গ ক্রমশঃ প্রকাশ পেতে থাকে। তাই অম্লধর্মীখাদ্য খুব কম পরিমানে গ্রহন করাই স্বাভাবিক, শতকরা ২০ ভাগের মত অম্লধর্মী খাদ্য গ্রহনই যথেষ্ট। বেশী মাত্রায় টাটকা শাকসব্জী, ফলমূল, দুধ ইত্যাদি হাইপ্রেসারের রোগীর পক্ষে সুপথ্য। সাধারণতঃ প্রোটিন খাদ্যেতে অর্থাৎ মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদিতে অম্ল অধিক মাত্রায় বর্তমান থাকে। সুতরাং হাইপ্রেসার রোগীর পক্ষে এই সকল আমিষ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য

একেবারেই নিষিদ্ধ। কিন্তু নিরামিষ প্রোটিন অর্থাৎ দুধ ছানা ডাল ফলমূল ইত্যাদি বর্জন করার প্রয়োজন নেই।

যেহেতু ক্ষারধর্মী খাদ্যই এই রোগে সুপথ্য তাই যত অধিক পরিমানে ক্ষারধর্মী খাদ্য গ্রহন করা যায় ততই মঙ্গল। শাকসব্জী, দুধ, ঘোল ও ফলমূলাদিই ক্ষারধর্মী খাদ্য, টক, মিষ্টি রসাল, শুষ্ক ইত্যাদি সমুদয় ফলই এই রোগে একাধারে পথ্য এবং আরোগ্যকারী ভেষজরূপেই গন্য। আর যদি কারও শরীরে অতিরিক্ত মেদ থাকে তবে তারা দুধ খেলে তার মধ্যকার মাটা (fat) তুলে বা ঘোল করে খেলে অধিকতর উপকার পাবে। কাঁচা লবন কখনও পাতে নেওয়া উচিৎ নয়। চিনি তো একেবারেই পরিত্যাগ করতে হবে। নুন ও চিনি এই রোগে বিষ খাওয়ার সমান। চিনির পরিবর্তে তালমিছরি বা মধু কিংবা গুড় তাও খুব কম পরিমানে খাওয়া যেতে পারে। বারে বারে কিছু খাওয়া ঠিক নয়। অল্প ক্ষিদে পাওয়া মাত্রই কিছু না খেয়ে রুটীন মাফিক খাদ্য গ্রহন করতে হবে। অক্ষুধায় তো জোর করে খাওয়াই উচিৎ হবে না। তবে অধিক পরিমানে জলপান এই রোগে বিশেষ হিতকর।

সুষম পথ্য বিধি লঙ্ঘন না করলে রক্ত কখনই অশুদ্ধ বা বিযাক্ত হতে পারেনা। মানব দেহযন্ত্রগুলি রক্ত থেকেই আপন আপন খাদ্য সংগ্রহ করে নিজেদের পরিপুষ্ট ও শরীরকে যথাযথ ভাবে পোষন ও পালন করে থাকে। সুতরাং রক্ত যত শুদ্ধ ও নির্দোষ হবে, শরীরও তত বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্টতা লাভ করবে। আবার এই রক্তের বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণরূপে খাদ্যের উপরই নির্ভরশীল। মানব দেহের রক্তের ধারা দুইভাগে বিভক্ত। ভূক্ত খাদ্য জীর্ণ হয়ে শরীরে দুই শ্রেনীর রক্ত উৎপাদন করে। প্রথম হল ক্ষারধর্মী রক্ত এবং দ্বিতীয় শ্রেনী হল অম্লধর্মী রক্ত। শরীর পরিচালক যন্ত্র সমূহকে তথা স্নায়ুপেশী, গ্রন্থি, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতিকে সুগঠিত করা এবং সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করা, দেহমনকে সুস্থ সবল রাখা এবং শরীরের রোগবিষ নষ্ট করে দেহকে নীরোগ রাখা ক্ষারধর্মী রক্তের প্রধান কাজ। আর অম্লধর্মীরক্ত শরীরকে শক্তিমান রাখে এবং শরীরের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে। সুতরাং দুইপ্রকার রক্তের ভূমিকাই সুস্থসবল স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এদের একটা স্বাভাবিক অনুপাত আছে। যথাযথ অনুপাত রক্তে বর্তমান থাকলে তাকেই বলা হবে বিশুদ্ধ রক্ত। এই বিশুদ্ধ রক্ত যাদের শরীরে প্রবাহিত তাদের শরীর ও মন হয় দেবতার ন্যায় নির্মল ও পবিত্র। আর্য্য ঋষিদের মতে রক্তে যদি ৬০ থেকে ৭০ ভাগ পর্য্যন্ত ক্ষারধর্মী এবং ৪০ থেকে ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত অম্লধর্মী রক্ত থাকে তবে তা সাত্বিক রক্ত নামে অভিহিত হবে। এই প্রকার সাত্বিক রক্ত যুক্ত মানুষের স্বভাব আচার আচরন ও দৈহিক স্বাস্থ্য সম্পাদন হয় ত্রুটিহীন, নির্মল ও পবিত্র। নিরোগ মানুষের শরীরে এই প্রকার সাত্বিক রক্তেরই প্রাধান্য বর্তমান। আর যদি রক্তে ক্ষার অংশ ৫০ থেকে ৬০ ভাগ এবং অম্ল অংশ ৫০থেকে ৪০ ভাগ বর্তমান থাকে তবে ঐ প্রকার রক্তকে আর্য্য ঋষিগন রাজষিক রক্ত নামে অভিহিত করেন। মধ্যবর্তী সাধারণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন মানুষের শরীরে এই রাজসিক রক্তেরই প্রাধান্য

থাকে। রক্তের এই প্রকার অনুপাতে শরীর যন্ত্র মাঝে মধ্যে সুস্থ অসুস্থ উভয় প্রকার ভাবে চলতে থাকে। এদের মানসিকতায় কখনও দেবভাবের কখনও বা পশুভাবের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। আর যদি রক্তের ক্ষার অংশ ৫০ থেকে ৬০ ভাগের মত হয় এবং অম্ল অংশ ৪০ থেকে ৫০ ভাগের মত হয় তবে তাকে আর্য্যশাস্ত্রে তামসিক রক্ত নামে অভিহিত করা হয়েছে। যাদের দেহ নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত, রোগপ্রবন এবং বিভিন্ন ভাবে মানসিক ও দৈহিক উপসর্গে জর্জরিত তাদের শরীরে এই প্রকার তামসিক রক্তের প্রাধান্য। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্যদেশে বহুগবেষণা দ্বারা আবিস্কৃত হয়েছে যে শরীরে এই দুইপ্রকার রক্তের যথাযথ আনুপাতিক বিপর্যয়ই অধিকাংশ রোগের মূল কারণ। কিন্তু এই অনুপাত কিরূপ হওয়া উচিৎ অর্থাৎ স্বাভাবিক রক্তে কতভাগ ক্ষারধর্মী রক্ত এবং কত ভাগই বা অম্ল ধর্মী রক্ত উপস্থিত থাকা উচিৎ এই বিষয়ে তারা কেউই একমত হতে পারেন নি। তবে William Howard Hey সাহেব Health via Food নামক গ্রন্থে মত প্রকাশ করেছেন যে স্বাভাবিক রক্তে ক্ষারধর্মী রক্তের পরিমান হওয়া উচিৎ ৮০ ভাগ এবং অম্লধর্মী রক্তের পরিমান হওয়া উচিৎ ২০ ভাগ। আবার Clifford, J. Barbrake এবং অন্যান্য গবেষকগনের মতে স্বাভাবিক রক্তে ক্ষারধর্মী রক্তের পরিমান হওয়া উচিৎ ৭৫ ভাগ এবং অম্লধর্মী রক্তের পরিমান হওয়া উচিৎ ২৫ ভাগ। তবে এক বিষয়ে তারা সকলেই একমত যে রক্তে অম্লের পরিমান ২৫ ভাগের থেকে যত বেশী থাকবে ততই ঐ রক্ত বিভিন্ন রোগের কারণ হয়ে দাড়াবে এর নাম দেন অত্যধিক অম্লযুক্ত রক্ত। আর ক্ষারধর্মী রক্ত যদি মোটরক্তের ৮০ ভাগের বেশী হয় তাও রোগের সংঘটক। সুতরাং আধুনিক যুগে যাকে অত্যধিক অম্লধর্মী খাদ্যরূপে অভিহিত করা হয়েছে আর্য্যশাস্ত্রের মতে তাই তামসিক রক্ত। শরীরে এই প্রকার রক্তের পাধান্যতা বশতঃই মানুয বিভিন্ন রোগের শিকার হয়।

সুতরাং শরীরকে নিরোগ ও ব্যাধিমুক্ত রাখতে হলে কোন কোন খাদ্য পরিপাক হয়ে ক্ষারধর্মী রক্তের উৎপাদন করে এবং কোন কোন খাদ্য পরিপাক হয়ে ক্ষারধর্মী রক্ত উৎপাদন করে এই বিষয়ে যদি সকলের একটি সুস্পষ্ট ধারনা থাকে তবে সকলে অনায়াসেই কেবলমাত্র খাদ্য নিয়ন্ত্রনের দ্বারা শরীরে ক্ষারধর্মী রক্তের প্রাধান্যতা বজায় রেখে দেহকে নির্মল ও ব্যাধিমুক্ত হতে সাহায্য করতে পারেন।

ভারতীয় আর্য্যঋষিগন এবং আধুনিক যুগের খাদ্য বিজ্ঞাণীরা এই বিষয়ে একমত যে যাবতীয় ফল, সর্ববিধ সবুজ শাক এবং সবরকমের সবুজ ও টাটকা সবজী বিভিন্ন প্রকারের ডাল, বাদাম এবং দুধ, জীর্ণ হয়ে ক্ষারধর্মী রক্তে উৎপাদন করে অধিক মাত্রায়। আর পেয়াজ, ডিম, পক্ষীমাংস (মাছ, মাংসও) প্রভৃতি আমিষ জাতীয় খাদ্য এবং ভাত ও রুটী, সাবু, চিনি ইত্যাদি শর্করাজাতীয় খাদ্য জীর্ণ হয়ে অধিক মাত্রায় অম্ল রসের সৃষ্টি করে। সকল প্রকার চর্বিজাতীয় খাদ্য অর্থাৎ ঘি, মাখন, তেল ইত্যাদি ভীষণমাত্রায় উত্তেজক ও গুরুপাক। এরা স্বাভাবিক নিয়মে হজম হয়না। এদের দ্বারাও অধিক মাত্রায় অম্লধর্মী রক্ত উৎপাদিত

হয়। ... ম খাদ্য হলেও ঐ দুগ্ধকে বিকৃত করে ছানা, ঘি, মাখন, রসগোল্লা সন্দেশ ইত্যাদি তৈরী করা সমস্ত খাদ্যই গুরুপাক এবং স্বাভাবিক নিয়মে হজম হয় না। এরা অধিক পরিমানে অম্লধর্মী রক্ত সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং এরূপ বিকৃত খাদ্য যথাসম্ভব অল্পমাত্রায় গ্রহন করতে হবে। প্রত্যেকেরই একটি জিনিস যথাযথ ভাবে অনুধাবন করতে হবে যে যদি কোন খাদ্য প্রোটিন সমৃদ্ধ, ক্যালসিয়াম, আয়রন ইত্যাদি বিভিন্ন খাদ্যপ্রান সমৃদ্ধ হয় তবেই যে তা সকলের পক্ষে সুপথ্য এবং উপকারী তা কিন্তু নয়। ঐ খাদ্য অম্লবিষ উৎপাদন দোষ থেকে মুক্ত কিনা এবং মানব দেহ তা সহজভাবে গ্রহন করতে পারবে কিনা সে বিষয়েও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মানব শরীরকে সুস্থ সবল রাখার জন্য যতটুকু খাদ্য প্রান, প্রোটিন, ধাতবলবন বা শর্করার প্রয়োজন খাদ্য থেকে তা পরিমিত মাত্রায় গ্রহন করার নামই সুসম পথ্যবিধি। এই সুসম পথ্যবিধি যথাযথ অনুসরন করলে আর বিভিন্ন রোগে ভূগতে হয় না। আমরা যে খাদ্য গ্রহন করি তার ১/৩ অংশ যদি অম্লধর্মী হয় এবং ২/৩ অংশ যদি ক্ষারধর্মী হয় তবে তার মধ্যেই আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সমুদয় উপাদানই সুসমভাবে পেতে পারি। সুতরাং যারা আমিষখাদ্য গ্রহন করেন তাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে— মাছ মাংস ডিম ঘি, মিষ্টি মিটাই ভাত রুটী ইত্যাদি পথ্য যেন দৈনিক সমুদয় খাদ্যের ১/৩ অংশের অধিক না হয়। বাকী ২/৩ অংশ টাটকা সবুজ শাক সব্জী, ডাল ফল ও দুধ দ্বারা পূরন করতে হবে। আবার যারা নিরামিষাশী তাদেরও লক্ষ্য রাখতে হবে যে ভাত রুটী ইত্যাদি শর্করাজাতীয় খাদ্য তেল ঘি মিষ্টি মিঠাই ইত্যাদি গুরুপাক খাদ্য যেন দৈনিক খাদ্যের ১/৩ অংশের বেশী না হয়। তাদের খাদ্যের বাকী ২/৩ অংশ ডাল শাক সব্জী দুধ ঘোল, দই ফল ও বাদাম জাতীয় খাদ্য দ্বারা পূরণ করতে হবে।

হাইপ্রেসারের রোগীদের অধিক পরিমানে (২/৩) এর ও অধিক ক্ষারধর্মী খাদ্য কিছুদিন গ্রহন করাই বাঞ্ছনীয়। কমলালেবু, আপেল, বেদানা, পাকাপেপে, পাকাবেল, ফুটি, কাকুড়, পাকা পেয়ারা ইত্যাদি হাইপ্রেসার রোগীর সুপথ্য। সর্বপ্রকার নেশা—তামাক মদ, গাঁজা, আফিং, ভাং, চা, কফি, গুড়াখু, দোক্তা ইত্যাদি এই রোগে বিশেষভাবেই বর্জনীয়। রক্তের চাপ যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তবে কিছুদিন কেবল মাত্র ক্ষারধর্মী খাদ্য গ্রহন এবং উপবাস ও যোগাসন মুদ্রাদি পালন করলে রক্তের চাপ অবশ্যই নেমে আসবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

ডায়েবেটিস (DIABETES)

- ডায়েবেটিসের তাত্ত্বিক আলোচনা।
- প্রকৃত উৎস ও কারণ।
- ডায়েবেটিস রোগ লক্ষণ।
- ডায়েবেটিসের উপসর্গ।
- রোগনির্ণয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা।

ডায়েবেটিস (Diabetes)

ডায়েবেটিস রোগটি পরিপাকতন্ত্রের বিকৃতি প্রসূত একটি ব্যাধি। এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত রোগীব সংখ্যা ক্রমশঃই বিস্তারলাভ করে চলেছে। কিছুদিন আগে একটি আন্তর্জাতিক মেডিকেল সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে বর্তমানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩ থেকে ১২ ভাগ মানুষই ডায়েবেটিস রোগের শিকার। বর্তমানে প্রায় ৭৫,০০,০০০ জন ভারতবাসী এই রোগে ভুগছে। আশাকরা যায় এই শতাব্দীর শেষভাগে অর্থাৎ ২০০০ সালে এই সংখ্যা এক কোটিকেও ছাড়িয়ে যাবে। সুতরাং এই রোগটি যে একটি জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক সমস্যা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই সমস্যার প্রকৃত উৎস এবং কারন সম্পর্কে জনসাধারণের অজ্ঞতা এবং উদাসীনতাই এর জন্য দায়ী। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিদের মোট মৃত্যুসংখ্যার ৪০ শতাংশই এই রোগে আক্রান্ত। দেশ তথা জাতির অধিকাংশ ক্ষণজন্মা পুরুষকেই অসময়ে এই রোগের কবলে পতিত হয়ে অল্পবয়সে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। যে সকল প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব দীর্ঘ্যজীবি হলে দেশ তথা জাতির অগ্রগতি ও সার্বিক কল্যান সাধিত হত সে সকল সম্ভাবনাময় প্রতিভার অকালমৃত্যুতে শুধু দেশই নয় সার্বিককল্যানের হানি হয়। অথচ ডায়েবেটিস রোগ সম্পর্কে প্রথম থেকে একটু সচেতনতা, সতর্কতা এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে এবং অভিভাবকগন আপন আপন শিশুকে শৈশবাবস্থা থেকেই যদি এমনভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন যাতে তারা সময় থাকতে এই রোগটির প্রতিকার প্রতিরোধ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহনে পারদর্শী হয় তবে আর ভবিষ্যতে এই রোগের আক্রমনে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জ্ঞানীগুনি ব্যক্তিগনকে অকালে প্রানত্যাগ করতে হবে না।

প্রথম অধ্যায়

ডায়েবেটিস কি? (What is Diabetes?)

ডায়েবেটিসকে বাংলায় বলা হয় বহুমূত্র। এই রোগটি একটি মারাত্মক ব্যাধি। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রখ্যাত কবি ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক কেশবচন্দ্র সেন, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ইত্যাদি বহু খ্যাতনামা মনিষী এই রোগে অকালে দেহত্যাগ করেছেন। সুতরাং এই রোগটিকে অবহেলা করার পরিনাম অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু।

ডায়েবেটিস বা বহুমূত্র রোগ দ্বিবিধ। শর্করাযুক্ত বহুমূত্র (Diabetes Mellitus) এবং শর্করা বিহীন বহুমূত্র (Diabetes insipidas) শর্করাযুক্ত বহুমূত্রকে আয়ুর্বেদের ভাষায় বলা

হয় সোমরোগ বা মধুমেহ (Diabetes melitus)। এই মধুমেহই প্রকৃত ডায়েবেটিস রোগ। এতে প্রস্রাবের সঙ্গে গ্লুকোজ নামক (Glucose) শর্করা বর্তমান থাকে। এই রোগটি অতি ভয়ানক ও বিপদজনক। আর শর্করাবিহীন বহুমূত্রকে আয়ুর্বেদের ভাষায় বলে মূত্রাতিসার। এতে প্রস্রাবের পরিমান বেশী হলেও তার মধ্যে গ্লুকোজ খুব কম থাকে বা থাকেই না। এই মূত্রাতিসারকেই বলা হয় মূত্রমেহ (diabetes insipidas)। এই রোগ ততটা বিপদজনক নয়। আবার যে বহুমূত্র অতি দ্রুত প্রাণনাশ করে তাকে তরুন বহুমূত্র বলে (Acute Diabetes) এবং যে বহুমূত্র রোগ ধীরে ধীরে আক্রমন করে রোগীর একের পর এক কোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বিকৃত করে ক্রমশ পরিপূর্ণভাবে তার জীবন অতিষ্ঠ ও দুর্বিসহ করে তোলে যার পরিনামে মৃত্যুবরন করতে বাধ্য হয় তাকে পুরাতন বহুমূত্র (Chronic Diabetes) বলে। বহুপর্যবেক্ষণ পরীক্ষনের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে এই রোগটির প্রধানতম কারণ হল অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের কুফল। এই কারনেই বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর সর্বত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবিধ সমস্যা উপস্থিত হওয়ার ফলে এই রোগ ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে চলেছে। প্রধানতঃ অধ্যয়নশীল, চিন্তাশীল এবং সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগনই অর্থাৎ উকিল, বিচারক, চিকিৎসক অধ্যাপক, গবেষক, গ্রন্থকার ইত্যাদিগন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন অধিক। বহুমূত্র রোগে প্রচুর পরিমানে প্রস্রাব হয়ে থাকে এবং পরীক্ষা করলে এই প্রস্রাবে শর্করা পাওয়া যায়। তবে এই রোগটি কিন্তু কিডনী থেকে উৎপন্ন কোন রোগ নয়। আগে মনে করা হত যে বহুমূত্র রোগটি একটি মূত্রগ্রন্থি বা কিডনি প্রসূত পীড়া। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে বহু পর্যবেক্ষন ও পরীক্ষনের মাধ্যমে প্রমান পাওয়া গেছে যে এটি আসলে পরিপাক তন্ত্রের দুর্বলতা প্রসূত ক্লোম গ্রন্থি (Pancreas Gland) এবং যকৃৎ (Liver Gland) এই দুটি গ্রন্থির ক্রিয়া বিপর্যয়ের ফল।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রে এই রোগ সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক হওয়ার জন্য বলা হয়েছে যে মূত্রের সঙ্গে যখনই চিনি নির্গত হতে আরম্ভ করবে তখনই তাতে পিপড়ে বা মক্ষিকাদি উপবেশন করবে। সুতরাং মূত্রে মাছি বা পিপড়া বসতে দেখলেই এই রোগ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক উপসর্গ হিসাবে ঘন ঘন পিপাশা, ঘন ঘন মূত্রত্যাগ মুখে মিষ্টি মিষ্টি একটা স্বাদ অনুভব, আবার কখন কখন সারা শরীরে অসহ্য চুলকানির অনুভূতি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শরীরে দুষ্টব্রনের উদ্ভব ঘটে। এই অবস্থা দীর্ঘ্যদিন যাবৎ চলতে থাকলে অর্থাৎ এই লক্ষণগুলি দেখা দিলেও সতর্কতা অবলম্বন বা সচেতন না হলে রোগ ক্রমশঃ জটীল ও কঠিন অবস্থায় উপনীত হয়। কঠিন অবস্থায় সর্বদামাথা ঘোরা, মাথা ধরা দুর্বলতা, মূর্ছা, মূত্রাশয় প্রদাহ প্রভৃতিকতগুলো কষ্টকর উপসর্গ প্রকাশ পায়। এই রোগে কিছুদিন ভুগতে থাকলে দেহটি কতগুলো বিশেষ বিশেষ রোগের অনুকুল পরিবেশ হিসাবে অবাধ ও উর্বর বিচরনভূমিতে পরিনত হয়ে ওঠে। এর ফলেই পরবর্তীকালে বিশেষ বিশেষ রোগগুলো তার অনুকূল ক্ষেত্র ও পরিবেশ পেয়ে মহা আনন্দে

সারা দেহ ব্যাপী অবাধে বিচরন করবার সুযোগ পায়। সুতরাং ডায়েবেটিসের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেবার সাথে সাথেই সতর্কতা অবলম্বন করলে আর এই সমস্ত রোগ গুলি প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হবে না।

আগে মনে করা হত যে বহুমূত্র রোগটি মনে হয় কিডনীর পীড়া। এই ভ্রান্ত ধারনার বশবর্তী হয়ে দীর্ঘ্যকাল মানুষের চিকিৎসাও চলে এসেছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে আজ প্রমানিত হয়েছে যে এই রোগের প্রধান কারন ইনসুলিন (Insuline) নামক একপ্রকার অন্তর্স্রাবী একটি গ্রন্থি রসের অভাব। এই Insuline উৎপন্ন হয় Pancreas বা ক্লোমগ্রন্থি নামক একটি গ্রন্থি থেকে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী পল ল্যাঙ্গারহ্যানস আবিষ্কার করেন যে শরীরে চিনির পরিপাক ক্রিয়ায় আইলেট সেল (Islet Cells) নামক এক প্রকার তন্তুর ভূমিকাই সর্বাগ্রগণ্য এবং সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ। এই সেলগুলো রয়েছে সূর্যগ্রন্থি বা Pancreas এর মধ্যে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানবিদ অস্কার মিঙ্কোস্কি কৃত্রিম উপায়ে একটি কুকুরকে Pancreas Gland বাদ দিয়ে ডায়েবেটিস রোগ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু আমাদের আয়ুর্বেদে হাজার হাজার বছর আগেই আয়ুর্বেদাচার্যগন গবেষনা করে বলে দিয়েছেন যে বহুমূত্র রোগ দুরারোগ্য কঠিন অজীর্ন রোগেরই প্রকার বিশেষ। তারা আরও ঘোষনা করেছেন যে সূর্যগ্রন্থি (Pancreas) এবং যকৃৎ (Liver) এই দুটি গ্রন্থির ক্রিয়া বিপর্যয়ের ফলেই বহুমূত্র রোগ সৃষ্টি হয়। যাই হোক ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে D' Mayer এই গ্রন্থি রসকে Insuline নামে অভিহিত করেন। এই Insuline এর উৎস আইলেট সেলস (Islet Cells) গুলোকে প্রথম পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষনকারী পল ল্যাঙ্গারহ্যানসের নামানুসারে নামকরণ করা হয় Langerhans Islets. ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানী Fredrick Banting এবং Charles Best সূর্যগ্রন্থির নির্গতরস (Pancreatic Extract) থেকে সতন্ত্রভাবে Insuline কে পৃথকীকরণ করে সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। তিনি পরীক্ষা করে দেখান যে এই Insuline কোন বহুমূত্র রোগাক্রান্ত পশুর শরীরে ইনজেকশন করে প্রয়োগ করলে তাদের রক্ত থেকে অতি দ্রুত চিনির পরিমান হ্রাস পায়। এর পর থেকে আজ পর্যন্ত এই উপায়েই অধিকাংশ বহুমূত্র রোগীর চিকিৎসা চলে আসছে। গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি জীবজন্তুর সূর্য্যগ্রন্থি থেকে Insuline সংগ্রহ করে তা বহুমূত্র রোগীর শরীরে Injection এর মাধ্যমে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই ইনজেকশন নিলে সাময়িকভাবে রক্তে চিনির অংশ হ্রাস পায় একথা ঠিকই, কিন্তু এর দ্বারা কখনই বহুমূত্র রোগ আরোগ্য হয় না। তবে রোগের প্রবলতার সময় ঘন ঘন Insuline প্রয়োগের মাধ্যমে রোগীকে কিছুকাল বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম লঙঘন করার ফলে ইনসুলিন প্রযুক্ত রোগীর রোগ পরবর্তীকালে এতই বিকৃত ও ভয়াবহ হয়ে ওঠে যা আর কোন অবস্থায়ই আয়ত্তে আনা সম্ভব হয় না।

কি করে রক্তে সুগার জমে?

পরিপাক তন্ত্রের দুর্বলতাই বহুমূত্র রোগের প্রধান কারণ। সূর্য্যগ্রন্থি (Pancreas) এবং যকৃৎ (Liver) এই দুটি গ্রন্থিই পরিপাক তন্ত্রের অন্তর্গত প্রধান দুই কাণ্ডারী। এই গ্রন্থি দুটির দুর্বলতা ও বিকৃতির ফলেই বহুমূত্র রোগের আবির্ভাব ঘটে। সূর্যগ্রন্থি থেকে দুই প্রকারের রস ক্ষরণ হয়। প্রথমটি বহিঃস্রাব (External Secretion) এবং দ্বিতীয়টি অন্তঃস্রাব (Internal Secretion)। বহিঃস্রাবী রসের নাম ক্লোমরস (Pancreatic Juice). এই ক্লোমরস উর্দ্ধঅন্ত্রে সঞ্চিত খাদ্য দ্রব্যকে হজম করায়। আর অন্তঃস্রাবীরসের নাম সোমরস (Insuline). এই সোমরস খাদ্যবস্তু থেকে গ্লুকোজ বা চিনি তৈরী করে তা Pancreas এর কোষে সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করে। এই চিনিই প্রয়োজনমত দগ্ধ হয়ে দেহের তাপ, দেহযন্ত্রের প্রতিটি কোষ, তন্তু, পেশী ও স্নায়ুর জীবনীশক্তি অটুট রাখে। দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সবলতা সজীবতা সম্পাদন করে।

মানুষ যখন ভাত, রুটি, আলু ইত্যাদি শর্করাযুক্ত খাদ্য খায় এবং তার সঙ্গে গুর চিনি ইত্যাদি মিষ্টিজাতীয় (Can Sugar) খাদ্য গ্রহন করে তখন তা অন্ত্রে পরিপাক হয়ে রসরূপে রসবাহীনাড়ী (Thoracic duct) এর মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন স্থান ঘুরে আবার যকৃতে (Liver) আসে, তখন লিভার তাকে গ্লাইকোজেনে (glycogen) সুগারে পরিনত হওয়ার পূর্ব অবস্থা বিশেষ) পরিনত করে। এই গ্লাইকোজেনকে লিভার তার আপন কোষের (Cell) মধ্যেই ধরে রাখে। পরে সেই গ্লাইকোজেন লিভার থেকে পোর্টাল ভেনে (Portal Vein) প্রবেশ করে এবং সেখানে তা সুগারে পরিনত হয়। পোর্টাল ভেন থেকে আবার ঐ সুগার ইনফিরিয়র ভেনাকেভা দিয়ে হৃৎপিণ্ডে (Heart), হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে (Lungs) ফুসফুস থেকে ফের ঘুরে এসে রক্তের সঙ্গে হৃৎপিণ্ডে এবং শরীরের সকলস্থানে আবশ্যকমত সরবরাহ হয়। পরিপাক তন্ত্রের দুই দিক্‌পাল Pancreas এবং Liver যখন দুর্বল হয়ে পরে তখন Liver আর প্রয়োজনানুসারে বন্টনের জন্য চিনি নিজকোষে (Cell) সঞ্চয় করে ধরে রাখতে পারে না। তখন এই চিনি যথেচ্ছ ভাবে রক্তে প্রবেশ করে অবাধরূপে বিচরণ করে।

সুগার প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হয় কি করে?

সুস্থ অবস্থায় সুগার দ্বারা শরীরের তেজ শক্তি ও সবলতা সম্পাদন হয়। কিন্তু যখন পাচক ক্রিয়ার অন্তর্গত প্রধান দুটি গ্রন্থি দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন ঐ গ্রন্থি দুটির সুশৃঙ্খল ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটার ফলে এরা উৎপাদিত চিনি আপন আপন কোষে ধরে রাখতে পারে না। তাই এই চিনি রক্তে যথেচ্ছভাবে প্রবেশ করে রক্তের ক্ষারভাব নষ্ট করে দেয়। রক্তের এই ক্ষারভাবনষ্ট হবার ফলে ঐ রক্ত আর তখন সমস্ত দেহ যন্ত্রকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগান

দিতে পারে না। রক্তের ক্ষারধর্ম নষ্ট হলে রক্তের রোগবিষ প্রতিরোধ করার যে ক্ষমতা আছে তাও ক্রমশঃ হ্রাস পায়। দেহ প্রকৃতি তখন রক্তে আগত এই অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকারক চিনিকে তরল করে কিডনি বা মূত্রগ্রন্থির সাহায্যে ছেঁকে প্রস্রাবের সঙ্গে শরীর থেকে বার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। রক্তস্থ চিনিকে তরল রাখার জন্য প্রচুর পরিমানে জলের প্রয়োজন হয়—এই জন্যই প্রকৃতিদেবীর নিয়ন্ত্রনকারীর নিয়মানুসারে বহুমূত্ররোগীর বারে বারেই জল পিপাশা পায় এবং এই জলই আবার প্রস্রাব রূপে শরীর থেকে অনিষ্টকারী চিনিকে বার করে দেয়। যখন লিভার গ্লাইকোজেনকে সুগারে পরিনত করতে পারে না এবং আপন কোষে। তাকে ধরে রাখার ক্ষমতাও হারায় তখনই তা সমস্ত প্রস্রাবপথে বেরিয়ে যায়। এই অবস্থাকেই ডায়েবেটিস মেলিটাস বলে। সুস্থ অবস্থায় কারওই প্রস্রাবের সঙ্গে সুগার প্রায় নির্গত হতে পারে না, কিন্তু ডায়োবেটিস হলে দেখা যায় কেউ কেউ যতটুকুই শর্করাজাতীয় খাদ্য বা গুড় চিনি ইত্যাদি মিষ্ট দ্রব্য খায় সেই সেই পরিমান সুগারই তার প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হয়ে যায়। সুতরাং ডায়েবেটিস রোগে যে চিনির পরিপাক শক্তি একেবারেই লোপ পায় একথা নিশ্চিৎ রূপেই সত্য। আবার কোন কোন রোগী কোন রকম শর্করা জাতীয় বা মিষ্টজাতীয় খাদ্য না খেলেও তাদের প্রস্রাবে সুগার নির্গত হতে দেখা যায়। এই অবস্থা কিন্তু অতি ভয়ানক, এই ক্ষেত্রে চিনি কিন্তু লিভারেই প্রস্তুত হয়। লিভারের এটাও একটা প্রধান কাজ যে স্বয়ং চিনি সৃষ্টি করে সারা শরীরে যোগান দেওয়া। তাই শর্করাজাতীয় বা মিষ্টিজাতীয় দ্রব্য খাওয়া বন্ধ করে দিলেও যে কোন খাদ্য থেকেই লিভার আপনা আপনি চিনি উৎপাদন করে।

সুস্থ মানুষের প্রস্রাবে চিনি পাওয়া যায় না কেন? (Why absent the suger in Healthy Human Urine?)

আমরা রোজ যে শর্করা জাতীয় খাদ্য বা গুড় চিনি ইত্যাদি মিষ্ট জাতীয় খাদ্যের মাধ্যমে চিনি গ্রহন করি তা প্রস্রাবের সঙ্গে আসতে দেখা যায় না কেন? এর উত্তর হল আমরা যে চিনি বা শর্করাজাতীয় খাদ্য খাই তা লিভারের মধ্যে গিয়ে গ্লাইকোজেনে পরিনত হয়। তারপর তার মধ্যে দহন ক্রিয়ার ফলে ঐ গ্লাইকোজেন গ্লুকোজে পরিনত হয়, অতঃপর উক্ত গ্লুকোজ কৈশিক রক্তবাহী নাড়ীরমধ্যে বিশ্লিষ্ট ও বিধ্বংস হয়ে আমাদের শরীরের তেজ ও শক্তি উৎপন্ন করে। তেল বা পেট্রোল যেমন তাপ উৎপন্ন করতে গিয়ে নিজে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় অনুরূপ ঐ চিনি শক্তি উৎপাদন করতে গিয়ে নিজেই বিধ্বংস হয়। এই জন্যই আমরা প্রত্যহ খাদ্যের সংগে চিনি খেলেও তা প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হয় না।

মূত্র পর্যবেক্ষন পরীক্ষণ (Observation and Experiment of Urine)

বহুমূত্র রোগীর রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে মূত্রলক্ষণের একটি বিশাল ভূমিকা রয়েছে। তাই এখানে মূত্রসম্বন্ধীয় আলোচনা করা হচ্ছে।

পরিমান (Quantity)

সাধারণতঃ সুস্থ অবস্থায় একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ ২৫ থেকে ৫০ আউন্স পরিমান প্রস্রাব ত্যাগ করে থাকে। তবে শীত প্রধান দেশের মানুষ সুস্থ অবস্থায় দিনে ২৫ থেকে ৪০ আউন্সের মত এবং গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মানুষ বেশী পরিমাণ জল পান করে বলে তারা সারাদিনে ৩০ থেকে ৫০ আউন্সের মত মূত্র ত্যাগ করে থাকে। দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিতে প্রস্রাবের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হয়। আবার তরল পানীয় গ্রহনের পরিমানের সঙ্গে সঙ্গেও প্রস্রাবের পরিমাণ কম বেশী হয়ে থাকে। প্রবল গরমে, কনকনে ঠান্ডায় বা প্রচন্ড ঝড় বা জোলো আবহাওয়ার জন্যও প্রস্রাবের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে থাকে।

বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি দিনে ১৫০ থেকে ৮০০ আউন্স পর্যন্ত মূত্র ত্যাগ করে থাকে।

স্বাভাবিক মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity of Normal Urine)

স্বাভাবিক মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব সাধারনতঃ ১০১০ থেকে ১০২০ পর্যন্ত হয়। তবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষের প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব শীতপ্রধান দেশের মানুষের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম হয়। কারণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষেরা তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী পরিমানে জনপান করে থাকে এবং উভয় দেশের আহার্য্য দ্রব্যেরও বহু পার্থক্য রয়েছে। তার প্রভাবও মূত্রের ওপর পতিত হয়।

বহুমূত্ররোগীর প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০৩০ থেকে ১০৪৫, আবার কখন কখন বা ১০৬০ থেকে ১০৭০ পর্য্যন্তও হয়ে যেতে পারে। ডায়েবেটিস রোগে রোগীর প্রস্রাবে যে কোন পরিমান শর্করা থাকাই বিশেষ হানিকর।

মূত্রের প্রকৃতি (Nature of Urine)

প্রস্রাবের বর্ণ (Colour) ঃ স্বভাবিক মূত্রের রং সাধারনতঃ শুস্ক বিচালী বা খড় ধোয়া জলের মত (Amber colour)। কিন্তু যখন প্রচুর পরিমানে হয় তখন তা একেবারে জলের ন্যায় সাদা ও পরিস্কার হওয়াই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক মূত্রে প্রস্রাবের পর পাত্রে কোনরূপ ইউরেটস্ জমে না। যদি কোনরূপ সেডিমেন্ট পড়ে বা ইউরেটস জমে তবে তা অস্বাভাবিক লক্ষণ বলে অনুমান করতে হবে।

গন্ধ ও স্বাদ ঃ (Odour & Test)

স্বাভাবিক মূত্রের গন্ধ মৃদু, সামান্য নোনতা স্বাদের এবং ক্ষীণ এসিড ও প্রতিক্রিয়াযুক্ত।

বহু মূত্র রোগীর মূত্র মিষ্টি স্বাদযুক্ত এবং গন্ধ আপেল বা আতার ন্যায়। যদি অনেক্ষণ পর্যন্ত মূত্র ধরে রাখা হয় তবে তাতে ইষ্ট প্ল্যান্ট উদ্ভুত হয় একে টেরিউলা সেরিভিসিও বলে। বহুমূত্র রোগীর জ্বর হলে আর মূত্রে শর্করা দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ জ্বর হলে যকৃতের মধ্যে গ্লাইকোজেন পাওয়া যায় না। গ্লাইকোজেন উৎপাদন যকৃতের একটি অন্যতম প্রধান কাজ।

মূত্রে সাময়িক শর্করাধিক্য
(Temporary aggravation of Sugar in Urine)

অনেক সময় বহুমূত্র রোগ না হয়েও সাময়িক ভাবে মূত্রে শর্করা উপস্থিত থাকতে পারে। কোন কারণে মূত্রাশয় আহত হলেও যকৃৎ কোষের কিছু চিনি মূত্রাশয়ে এসে মূত্রাশয়ের আহত স্থান দিয়ে প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হয়। সুতরাং আঘাতের ফলেও প্রস্রাবে সুগারের উপস্থিতি সম্ভব। কিন্তু বলা বাহুল্য যে এটা বহুমূত্র নয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে এর নাম রেনাল গ্লাইকোসুরিয়া (Renal Glycosuria)। সুতরাং প্রস্রাবে চিনি পাওয়া গেলেই যে ডায়েবেটিস হয়েছে এর উপর ভিত্তি করে সব সময় রোগীর চিকিৎসা করা ঠিক নয়। পেভি, ব্রুক ইত্যাদি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগন বলেন যে স্বাভাবিক রক্তের জলীয় ভাগে (সিরাম) অল্প পরিমান শর্করা বর্তমান। সেইজন্য ঐ শর্করাকে তারা ফিজিওলজিক্যাল গ্লাইকোসুরিয়া আখ্যা দিয়েছেন। খুব বেশী পরিমানে শর্করাযুক্ত খাবার বা গুড় চিনি ইত্যাদি মিষ্টি দ্রব্য আহারের পর মূত্রে শর্করা পাওয়া যায়। মধ্য বয়স্কদের 'গাউট' রোগ কিংবা পরিপাক যন্ত্রের দোষ থাকলে প্রস্রাবে শর্করা পাওয়া যায়। হুপিং কাশিগ্রস্থ রোগীদের হাঁপানী বা মৃগী হলে এবং গর্ভাবস্থায় আঘাত বা মস্তিস্কে আঘাত লাগলে গ্লাইকোসুরিয়া হয়ে থাকে। আবার ক্লোরোফরম বা ইথারসেবীদেরও গ্লাইকোসুরিয়া হতে দেখা যায়। তবে

এগুলো সাময়িক। কারণটি দুর হলে আবার বন্ধ হয়ে যায়। তবুও আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে প্রস্রাবে সুগার বিভিন্ন কারণেই নির্গত হতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ডায়েবেটিসের শ্রেণীভিত্তিক আলোচনা

ডায়েবেটিস দুই প্রকার—১) ডায়েবেটিস মেলিটাস (Diabetes melitus) এবং ২) ডায়েবেটিস ইনসিপিডাস (Diabetes Insipidus).

রক্তে যে সুগার বা চিনি থাকে তার পরিমান যদি উপযুক্ত মাত্রার থেকে অধিক হয় এবং রক্তস্থ সুগার যদি প্রস্রাবের সঙ্গে অধিক মাত্রায় নির্গত হয় এবং এইজন্য যদি শরীরের পুষ্টি সাধনে বাধা পড়ে, আর বহু পরিমানে বারম্বার স্বচ্ছ জলের মত প্রস্রাব হয় তবে তাকে ডায়েবেটিস মেলিটাস বলা হবে।

আর যদি দেখা যায় বহু পরিমানে ঘন ঘন প্রস্রাব হচ্ছে কিন্তু প্রস্রাবের সঙ্গে সুগার বা অন্য কোন প্রকার দূষিত পদার্থ নির্গত হচ্ছে না তবে তাকে ডায়েবেটিস ইনসিপিডাস বলা হবে।

এই উভয় প্রকার ডায়েবেটিসই আবার দুই প্রকারের হতে পারে। প্রথমথঃ Acute বা তরুণ অবস্থা এবং দ্বিতায়তঃ chronic বা জটিল অবস্থা। তরুণ অবস্থার বাড়াবাড়ির সময় ডায়েবেটিস মেলিটাসের ক্ষেত্রে অতিবিপদজনক ও ভায়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। রোগ যখন Chronic বা জটিল অবস্থায় পৌছায় তখন সে প্রায়সই বিভিন্ন জটিল ও ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে বিভিন্ন অঙ্গহানিও ঘটিয়ে থাকে এবং রোগীকে মৃত্যুর কবলে ঠেলে দেয়। কিন্তু ডায়েবেটিস ইনসিপিডাসের বেলায় রোগ ততটা বিপদজনক হয়ে উঠতে দেখা যায় না।

ডায়েবেটিস মিলিটাসের বেলায় রোগীর বিভিন্ন কষ্টকর লক্ষণের দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখা যায়। লক্ষণভেদে এই মিলিটাস ডায়েবেটিসকে আবার দুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়— ১) Simple diabetes Melitus বা সাধারণ প্রকারের বহুমূত্র। এবং ২) Critical Diabetes Melitus বা জটিল প্রকারের বহুমূত্র।

সাধারণ প্রকারের রোগে রোগী বেশ সবল সুস্থ বা হৃষ্টপুষ্টই থাকে, বাহ্যিক চেহারাতে রোগ উপসর্গের খুব একটা ছাপ পড়ে না। রোগী বিশেষ দুর্বল ও হয় না, শরীরের রক্ত অধিক পরিমানে ক্ষয় হয় না, চেহারার ও ততটা পরিবর্তন ঘটে না। অতিরিক্ত পিপাসা, অতৃপ্তিকর ক্ষুধা, ঘন ঘন প্রচুর পরিমানে প্রস্রাব ইত্যাদি ডায়েবেটিসের কষ্টকর উপসর্গাবলীর কোনটিই এতে উপস্থিত থাকে না। কেবল মাত্র প্রস্রাব বা রক্ত পরীক্ষায় সুগার পাওয়া যায়। এই প্রকারের পীড়া প্রায়ই চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধে দেখতে পাওয়া যায়। এটা অতি

সহজপ্রকারের পীড়া এবং এতে শুধু ডায়েট কন্ট্রোল করলেই অর্থাৎ শর্করা জাতীয় খাদ্য এবং গুড় চিনি ইত্যাদি মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য খাওয়া বন্ধ করে দিলেই প্রস্রাবের সঙ্গে সুগার নির্গত হওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

আর জটিল প্রকারের রোগে—রোগী অতি দ্রুত দুর্বল হয়, শরীর ক্রমশই শীর্ণ আকার ধারন করে এবং অতি দ্রুত শুকিয়ে আসে, চেহারা রক্তশূন্য ফেকাশে হয়। রোগীর অত্যধিক ক্ষুধা, অসহ্য গায়ে জ্বালা, Pancreas এবং Liver এর ক্রিয়া বিকৃতি হেতু পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত এবং প্রবল জল পিপাসা, প্রচুর পরিমানে বারে বারে স্বচ্ছ বর্ণশূন্য জলের মত প্রস্রাব ইত্যাদি কতকগুলো লক্ষণ প্রকাশিত হয়। রোগ অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পেতে ভয়ানক এবং সাংঘাতিক হয়ে ওঠে, যে কোন মুহূর্তে রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে। এই রোগে সাধারণতঃ রোগীর nerve বা স্নায়ু সমূহ অধিক আক্রান্ত হয়। ডাঃ বার্নাড বলেন—মস্তিষ্কের চতুর্থ ভেন্ট্রিকেল কিংবা সিম্প্যাথেটিক নার্ভ উত্তেজিত হলে এই প্রকারের ডায়েবেটিসের আক্রমণ ঘটে এবং উক্ত অবস্থায় উপযুক্ত চিকিৎসা ও পথ্যের উপর লক্ষ্য রাখলে রোগী অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু ডায়েবেটিস কোমা হলে রোগী শীঘ্রই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। কোমা হওয়ার আগে যদি এই চারটি লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে অনুমান করতে হবে যে রোগীর ভাবীফল শুভ নয়। লক্ষণ চারটি হল—১) ভয়ঙ্কর কোষ্ঠ বদ্ধতা। ২) প্রস্রাবের পরিমাণ একেবারে কমে যাওয়া। ৩) প্রস্রাবে সুগার নির্গত হওয়া একেবারেই বন্ধ। এবং ৪) ক্ষুধা মান্দ্য ও আহারে অরুচী। এই অবস্থায় শরীর হিমাঙ্গ হয়। নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ হয়, হাত, পা, আঙুল নীলবর্ণ ধারণ করে, চেহারা যেন চুপসে যায়, চোখ শিবনেত্র হয়ে থাকে। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, জ্ঞান অতি অল্পই থাকে। নিঃশ্বাস অতি জোড়ে জোড়ে নেয়। তাছাড়া রক্তে এসিটোন জন্মাবার ফলে রোগীর মুখ ও বিছানা থেকে একপ্রকার দুর্গন্ধ বার হয়। এর প্রায় তিনচারদিন পর ঐ গন্ধ চলে যায় ও রোগীর মৃত্যু হয়। এই অবস্থায় রোগী প্রায়ই বাঁচে না।

তৃতীয় অধ্যায়

ডায়েবেটিস রোগের কারণ (Causes of Diabetes)

একদা ডায়েবেটিসকে ধনী ব্যাক্তিদের রোগ বলে মনে করা হত। এই রোগ শহরের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, গ্রামে এই রোগ প্রায় হতই না বলে একে শহুরে রোগ বলে অভিহিত করা হত। বস্তুতঃ কিন্তু একথা যথার্থ নয়। বর্তমানে ডায়েবেটিস রোগ ধনী দরিদ্র, শহর গ্রাম, শিশু যুবক কিছুই মানে না। সর্বত্রই তার অবাধ বিচরন।

যদিও এই রোগের যথাযথ এবং সমস্ত কারণ নির্নয় করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি, তবুও গবেষনার দ্বারা যতটুকু জানতে পারা গেছে তা এখানে একটু আলোচনা করা হচ্ছে।

১) বংশানুক্রমিকতা (Heredity)

কিছুদিন আগে ব্যাপকহারে এক মেডিকেল সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে বর্তমানে যত ডায়েবেটিসের রোগী আছে তার মধ্যে ৪৬% শতাংশ রোগীরই পারিবারিক ইতিহাস নিয়ে জানা গেছে যে তাদের বংশে মা বাবা কারও না কারও ডায়েবেটিস ছিল বা আছে। কি করে মা-বাবার এই রোগ সন্তানে সংক্রামিত হয় এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে বিভিন্ন মত পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু কেউই আজ পর্যন্ত সঠিক রূপে ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি যে কি করে বংশানুক্রমিক ডায়েবেটিস রোগ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানকে আক্রমন করে।

প্রজনন বিজ্ঞান শাস্ত্রের তত্বানুসারে ডায়েবেটিসের বংশানুক্রমিক ধারার প্রকৃতি সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশিত হয় তা হল—

ক) যদি কোন মা-বাবা দুজনেই ডায়েবেটিস রোগে আক্রান্ত হন তবে তাদের সকল সন্তানের মধ্যেই এই রোগ সঞ্চারিত হবে।

খ) যদি পিতা মাতার মধ্যে একজন ডায়েবেটিস রোগাক্রান্ত হন এবং অপরজন ডায়েবেটিক স্বভাবের হয়ে থাকেন তবে তাদের সন্তানের মধ্যে অর্দ্ধসংখ্যক সন্তান এই রোগ পাবে।

গ) যদি পিতা মাতা উভয়েই ডায়েবেটিক স্বভাবের হয়ে থাকেন তবে তাদের এক চতুর্থাংশ সংখ্যক সন্তান এই রোগে ভুগবে এবং

ঘ) যদি পিতা মাতার মধ্যে একজন ডায়েবেটিক স্বভাবের হন এবং অপরজন সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকেন তবে তাদের মধ্যে কোন রূপ বংশানুক্রমিক ডায়েবেটিস রোগের ধারা সঞ্চারিত হবে না।

কিন্তু প্রজনন বিজ্ঞানের এই মত যে সর্বাংশে সত্য নয় তা এক বিশদ পর্যবেক্ষন পরীক্ষণ মূলক সমীক্ষা দ্বারা প্রমানিত হয়েছে। সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে কোন কোন ডায়েবেটিসে রোগাক্রান্ত মাতা পিতার সন্তান রয়েছে সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক ও সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন। আবার কোন সুস্থ স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যবান মা-বাবার সন্তানকে ভুগতে হচ্ছে অস্বাভাবিক ডায়েবেটিস রোগে। সমীক্ষা চালিয়ে এও দেখা গেছে যে যমজ সন্তানের মধ্যে একজন সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক আর একজন ডায়েবেটিস রোগের শিকার অথচ তাদের মা-বাবা একই। আবার এমন অনেক ডায়েবেটিস রোগীও পাওয়া গেছে যাদের বংশেতে আদৌ কারও এই রোগের ইতিহাস নেই।

কোন কোন গবেষক মনে করেন যে ডায়েবেটিস কখনও মা-বাবার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিকৃত ক্রোমোসোমের দ্বারাই সন্তানগণের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। এরা সঞ্চারিত হয় মা-বাবার থেকে সেই টাইপের ক্রোমোসোম গ্রহনের অক্ষমতা থেকে যে টাইপের ক্রোমোসোম ডায়েবেটিস রোগের প্রতিকারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করার মত ক্ষমতা

সম্পন্ন।

সুতরাং সংক্ষেপে এটাই বলা যায় যে যদিও ডায়েবেটিস রোগ একটি বংশানুক্রমিক রোগ এবং এই রোগের পেছনে যেহেতু বংশানুক্রমিক ধারার একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, কিন্তু কিভাবে এই বংশানুক্রমিকতা কাজ করে এবং কতদুর তার বিস্তার এসকল তথ্য বৈজ্ঞানিকদের কাছে আজও রহস্যে ঢাকা।

তবে এটা লক্ষ্য করা গেছে যে বংশানুক্রমিক ধারা কোন ব্যক্তির উপর তখনই বিশেষ ভাবে ক্রিয়াশীল হবার সুযোগ পায় যখন তার দেহটি অতিস্থূলত্ব, অনিয়মিত ও অসংহত খাদ্য গ্রহন, অতিরিক্ত মানসিক শ্রম, দৈহিক শ্রম বিমুখতা ইত্যাদি কতগুলো কারনে ডায়েবেটিস রোগের আক্রমনের উপযোগী একটি অনুকূল পরিবেশ রূপে গড়ে ওঠে।

২) অতিস্থূলত্ব (Obesity)

একটা প্রবাদ আছে যে বহুমূত্র রোগের ক্ষেত্রে বংশগত ধারা কামানে গোলা বারুদ বোঝাই করে এবং দৈহিক স্থূলত্ব ঐ কামানের ঘোড়া টেপে। কথাটা একেবারে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। বাস্তবিকই দৈহিক স্থূলত্ব এবং ডায়েবেটিসের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে, এর থেকে সহজে তা অনুমান করা যায়। অস্বাভাবিক ওজন গ্রস্ত ও খুব বেশী স্থূল শরীরের ওপর ডায়েবেটিস রোগ অনায়াসে ও সহজেই ক্রিয়া করতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে শতকরা ৬০ থেকে ৮৫ শতাংশ ডায়েবেটিস রোগীই অতিস্থূল ও অস্বাভাবিক ওজন প্রাপ্ত।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে যত বেশী স্থূল ডায়েবেটিস রোগাক্রমনের দরুন তার আয়ুও তত কম। যাদের শরীর পাতলা ও হাল্কা তাদের যেমন কর্মক্ষমতা অধিক এবং ডায়েবেটিস হওয়ার পক্ষেও তেমনি প্রতিকূল। এই জন্যই এই রকমের ব্যক্তিরা ক্বচিৎ ডায়েবেটিসে আক্রান্ত হয়, এই জন্যই বলা হয়ে থাকে যে ডায়েবেটিস হল দৈহিক স্থূলত্বের আইন সঙ্গত সহধর্মিনী।

৩) অসঙ্গত পথ্য অভ্যাস বিধি (Incorrect dietary habits)

খাদ্যের যথাযথ ব্যবহারের ফলে যেমন মানব শরীর বেঁচে থাকে, সুশৃঙ্খলরূপে ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে কাজ করে, অনুরূপ এই খাদ্যের অপব্যবহারের ফলেই আবার এই শরীর ধ্বংসীভূত হয় বিকৃত ও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে ওঠে, যথার্থ খাদ্য শরীরের সুশৃঙ্খল ক্রিয়া, রোগ প্রতিরোধ ক্রিয়া এবং জৈবীক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ওষুধের ন্যায় সবলতা ও সুস্থ্যতা সম্পাদন করে, এই খাদ্যই আবার অযথার্থ হলে বিষ প্রয়োগের ন্যায় শরীরের জৈবীক ক্রিয়ায়

ব্যাঘাত ও বিভিন্ন উপসর্গ সৃষ্টি করে তাকে ধ্বংসীভূত করে থাকে।

আমরা আজ নিজেদেরকে সভ্য ও উন্নত বলে গর্ববোধ করতে পারি কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মাবলী খাদ্যবস্তুর গুনগত এবং পরিমানগত মানের কাছে আমরা ক্রমশঃই উপহাসের পাত্রে পরিনত হতে চলেছি। প্রকৃতিদত্ত খাদ্যবস্তুকে আজ সভ্যতার অভিমানে চাকচিক্য ও সুদর্শনীয় করতে গিয়ে আমরা তাদের গুনগত মান প্রায় একেবারেই বিকৃত করে এনেছি। এর প্রতিক্রিয়া আমাদের ওপর পতিত হতে চলেছে। চাল, ডাল, গম ইত্যাদি খাদ্যশস্যকে যন্ত্রপাতির সহায়তায় চাকচিক্য করতে গিয়ে তার আসল গুনগত মূল্য আজ আর প্রায় অবশিষ্ট নেই বললেই চলে। গুরকে বিকৃত করে আমরা রিফাইণ্ড চিনি খাচ্ছি। দুধ বাদ দিয়ে তাকে বিকৃত করে মণ্ডা মেঠাই খাচ্ছি। এর কুফল আমাদের তো ভোগ করতে হচ্ছেই পরবর্তী প্রজন্মের মানুষও এর হাত থেকে নিস্তার পাবে না। সুতরাং নিরোগ হতে হলে বিকৃত খাদ্য নয় চাই প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্ট অবিকৃত খাদ্য। হালে এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে অবিকৃত খাদ্য খায় বলে কানাডা এবং আয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা প্রায় ডায়েবেটিস রোগে আক্রান্ত হয় না বললেই চলে। আর যারা যত অধিক বিকৃত খাদ্য গ্রহন করে তাদেরই অধিক সংখ্যায় ডায়েবেটিসের দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

আমরা আজ সভ্যমানুষ কৃত্রিম চকলেট, বিস্কুট, লজেন্স, কেক আইসক্রীম ইত্যাদি খাবার আদর করে বাচ্চাদের দিয়ে আনন্দ উপভোগ করি। এখন তো আবার ফ্যাসান হয়েছে রেফ্রিজারেটরে রেখে যে কোন টাটকা খাদ্যও বিকৃত করে খাওয়া এবং কাউকে দেওয়া। কিন্তু এর পরিনতি যে কি ভয়াবহ এবং কতটা সাংঘাতিক তা কি আমরা একবারও ভেবে দেখি। এই বিকৃত খাদ্য বাচ্চাদের দিয়ে আমরা কিন্তু প্রকারান্তরে স্থূলত্ব এবং ডায়াবেটিসকেই আমন্ত্রন জানাচ্ছি যার ফলে মানুষের গড় আয়ু আজ ক্রমশঃই হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে।

খাওয়ার একটা নির্দিষ্ট সময়, পরিমান এবং শরীরের প্রয়োজনানুসারে খাদ্যের গুনগত মান নির্বাচন করে খাদ্য গ্রহন করা উচিৎ। যখন তখন, যেখানে সেখানে, লোভের বশবর্তী হয়ে যা তা খাদ্য গ্রহন এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহন সর্বদাই ডায়েবেটিস রোগের ক্ষেত্র প্রস্তুতের উপযোগী একথাটা কিন্তু সর্বদা স্মরনে রাখতে হবে।

৪) দাম্পত্যজীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা

দাম্পত্য জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতায় রক্ত নিস্তেজ হয়ে Pancreas এবং Liver এর ক্রিয়া দুর্বল হয়ে এই রোগের সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মাসে একদিনের অধিক দাম্পত্য সুখ ভোগ করতে নেই। এই নিয়ম লঙঘনের ফলেই রক্ত ক্রমশঃ হীনবল হয় এবং Pancreas ও Liver দুর্বল হয়ে Diabetes রোগের সৃষ্টি হয়।

৫) দৈহিক শ্রম বিমুখতা

দৈহিক শ্রম বিমুখতাও ডায়েবেটিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারন। অলস ও কুড়ে ব্যক্তির শরীরে ডায়েবেটিস বেশ সুন্দর ভাবে ক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে। দৈহিক পরিশ্রমে রক্তের মধ্যস্থ গ্লুকোজের যথার্থ সৎব্যবহার হয়, কারন দৈহিক শ্রমে শক্তির প্রয়োজন, আর শক্তির উৎস হল রক্তস্থ গ্লুকোজের দহন ক্রিয়া। কিন্তু দৈহিক শ্রম না করলে এই দহন ক্রিয়া না হওয়ার ফলে তা ক্রমশঃ রক্তে জমতে থাকে। অপরদিকে দৈহিক পরিশ্রমের ফলে রক্তে যে গ্লুকোজ রয়েছে তা দহন করার জন্য ইনসুলিনের প্রয়োজন হয় তাই ইনসুলিন যোগান দেবার জন্য pancreas কে কম পরিশ্রম করতে হয়। এই ইনসুলিন Glucose কে দাহ করে শক্তি উৎপাদন করে। সুতরাং রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজ জমতে পারে না। তাই দৈহিক পরিশ্রম ডায়েবেটিস রোগের প্রতিষেধও বলা চলে।

৬) রোগজীবানুর আক্রমন

কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে ডায়েবেটিস রোগোৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু Virus বা রোগ জীবানুর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কোন কোন শিশুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে তারা Mumps নামক এক প্রকার জীবানু আক্রমন ঘটিত রোগে ভোগার পর ডায়েবেটিসে আক্রান্ত হয়েছে। কারন এই সমস্ত জীবানু Pancreas এর Insulin সৃষ্টির উৎস স্বরূপ Beta cell কে ধ্বংস করে। অপর দিকে শরীর সৃষ্ট Anti Body এবং Virus এই Beta cells এর সঙ্গে fight করে, ফলে Diabetes রোগের বৃদ্ধি ঘটে।

৭) কিছু গ্রন্থিরসের অতিক্ষরণ

কতগুলো গ্রন্থিরসের Insuline এর প্রতি বিরুদ্ধ আচরনের ক্ষমতা রয়েছে। তারা রক্তে গ্লুকোজের পরিমান বাড়িয়ে ডায়েবেটিস রোগ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন glucagon, Cortisone, Growth hormone, adrenaline, thyroxine. যদি এই গ্রন্থিরসগুলো অধিক মাত্রায় ক্ষরণ হয় তবে তারা Insuline এর ক্ষরনের মাত্রা কমিয়ে দেয় ফলে blood এ glucose এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

৮) কিছু নির্দিষ্ট ওষুধের প্রতিক্রিয়া

দীর্ঘদিন যাবৎ সেবনীয় কতগুলো নির্দিষ্ট ওষুধ pancreas এর ক্ষতি সাধন করে থাকে। যেমন হাঁপানী বা শ্বাস যন্ত্রের রোগে ব্যবহৃত কতগুলো ওষুধ রয়েছে যা রোগীকে দীর্ঘদিন ধরে সেবন করতে বলা হয়ে থাকে। আবার জন্ম নিরোধক Contraceptive pills এবং

Thyroid Group এর ওষুধ ইত্যাদি ওষুধগুলো Pancreas এর ক্রিয়া বিকৃতি ঘটিয়ে Diabetes রোগের সৃষ্টি করে থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

ডায়েবেটিস রোগের জটিল উপসর্গ (Complications of Diabetes)

ডায়েবেটিস রোগটি নিজে যতটা ভয়াবহ ও মারাত্মকই হোক না কেন তার থেকেও অধিক সাংঘাতিক এবং ভয়ঙ্কর হল তার জটিল উপসর্গ সৃষ্টি প্রবনতা ও রোগীর জীবনকে কষ্টকর উপসর্গ রচনা দ্বারা দুর্বিসহ করে তোলা। এই রোগটি নিজে যতটা না পীড়া দেয় তার থেকে শতগুন মানসিক ও দৈহিক যাতনা ভোগ করায় তার আনুসঙ্গিক জটিল উপসর্গসমূহ। এই রোগ চলাকালে রোগীর শরীরে যে কোন মুহুর্তে তরুন জটিল উপসর্গাবলী উদয় হতে পারে, যেহেতু পুরাতন জটিল উপসর্গাবলী আরও অধিক সাংঘাতিক ও ভয়াবহ তাই তারা ধীরে ধীরে নিজেদের আত্মপ্রকাশ করে থাকে। অনেক সময়ই দেখা যায় যে ডায়েবেটিস আক্রমনের ফলে প্রকাশিত কোন একটি বিশেষ জটিল উপসর্গ রোগ নির্নয়ের ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক রূপে কাজ করে। ডায়েবেটিস আক্রমনের প্রথম ধাপেই যদি ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করা যায় তবে সুদুর ভবিষ্যতে আগত জটীল উপসর্গসমূহের সহজেই প্রতিরোধ করা সম্ভব। কিন্তু যদি অধিক বিলম্ব হয়ে যায় তবে জটিলতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া মুস্কিল। এই জন্যই যথাসময়ে এর প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা অবশ্য কর্তব্য। এখানে ডায়েবেটিসের তরুন (Acute) উপসর্গ এবং জটিল উপসর্গ (Chronic Complications) সমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে।

ডায়েবেটিসের তরুন উপসর্গসমূহ (Acute Complication of Diabetes)

1) ডায়েবেটিক কোমা (Diabetic Coma) ঃ শিশু বা তরুন বয়সে ডায়েবেটিস আক্রমন করলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে Diabetic Coma লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত রোগীর ক্ষেত্রে এরূপ অবস্থা সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। ডায়েবেটিক কোমা হলে রোগী শিবনেত্রে নিদ্রা যায়, চারদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা জানতে পারে না কিংবা কেউ ডাকলে উত্তর দিয়ে পুনরায় অচেতন অবস্থায় থাকে। রক্তে শর্করার ভাগ বেশী হয়ে বিকার হলে তাকে এসিটোনিমিয়া বলে। রোগীর শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ হয় তখন রোগীর মুখে মিষ্ট মিষ্টি একটা স্বাদ অনুভূত হয় এবং অল্পদিন মধ্যে কোমা হয়ে মৃত্যু হয়।

2) প্রুরাইটিস ভাল্ভি (Prurites Vulvi) ঃ স্ত্রীলোকদের ডায়েবেটিস হলে প্রুরাইটিস ভালভি নামক এক প্রকার উপসর্গ দেখা দেয়। এতে যোনিদ্বারে এক প্রকার দুর্নিবার কণ্ডুয়নশীল একজিমা প্রকাশ পায়। আর পুরুষদের ডায়েবেটিস হলে লিঙ্গ মুণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘা হয়ে চুলকানি হয়। প্রস্রাবের শর্করা লেগে সাধরণতঃ এরূপ হয়ে থাকে বলে অনেকের ধারনা। কিন্তু এই প্রুরাইটিস ভালভি মেয়েদের বেলায় অধিক ভ্যাবহ ও মারাত্মক আকার ধারন করে থাকে। সুতরাং ডায়েবেটিস রোগীর এরূপ কোন লক্ষণ দেখা দিলে প্রথম থেকেই সচেতন হতে হবে, তা না হলে এই সামান্য উপসর্গই দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে রোগীর মৃত্যুর কারন হয়ে দাড়াবে।

3) ক্ষুদ্র ফোড়া ও কার্বংকল (Boils and Carbuncle) ঃ ডায়েবেটিসে আক্রান্ত হলে এক প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া এবং দুষ্টব্রন হতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই প্রকার লক্ষণই নির্দেশ করে যে রক্তে শর্করার ভাগ অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়ে গেছে । এরূপ অবস্থা ঘটার আসল কারণ হল চর্মের রক্তবাহী নালীকার মধ্যস্থ রক্তে শর্করার ভাগ অতিশয় বৃদ্ধি পাওয়া এবং পূজ উৎপাদনে বাধাদানকারী জৈবীক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলির অত্যাধিক দুর্বলতা। ডায়েবেটিস রোগীর ক্ষুদ্র ফোড়া বা দুষ্টব্রণ হলে অতি ভয়ের কথা এবং ভাবীফল খুবই আশঙ্কাজনক। ডায়েবেটিক কার্ব্বাংকল হওয়া বড়ই অশুভ লক্ষণ, বিশেষতঃ ডায়েবেটিস যুক্ত এলবুমিনুরিয়া রোগীদের কার্বাংকল হলে জীবনের আশা খুবই কম। রোগী যদি স্থূলকায়া হয় তবে সে এই রোগেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং এই সকল রোগীদের বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

4) পচনশীল ঘা (Gangrene) ঃ ডায়াবেটিস রোগীর কোন প্রকার ঘা হওয়া খুবই অনিষ্টকর লক্ষণ। তাদের ঘা হলে কিছুতেই সারতে চায় না। এই ঘা ক্রমশঃ দ্রুত পচনশীল ঘা বা গ্যাংগ্রীনে পরিণত হতে দেখা যায়। পচনশীল ঘা হল কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তন্তু বা কোষ পূর্নরূপেই মরে যাওয়া। সুতরাং মৃত কোষকে আর কোনদিনও বাঁচানো সম্ভব নয় বলে ঐ কোষের পচন ধরে। আর ঐ পচনশীল কোষটি ক্রমশ তার পার্শ্বস্থ জীবিত কোষকে পচন ধরায়। এরূপে ক্রমশঃ এই ঘায়ের বিস্তার লাভ হয়ে থাকে। ডায়েবেটিস রোগীদের এরূপ ঘা হলে খুবই আশঙ্কাজনক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং রোগীকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই উপসর্গেই মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হতে হয়। সাধারনতঃ এই প্রকার পচনশীল ঘা আক্রমন করে পায়ের পাতা বা পায়ের গোড়ালীতে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে ডায়েবেটিস রোগী ছাড়া সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পায়ের পাতা বা গোড়ালীতে ঘা খুব কমই হয়। সুতরাং যদি পায়ের গোড়ালী বা পাতায় ঘা হতে দেখা যায় তবে প্রথম থেকেই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কারণ এরুপ অবস্থার অবহেলা করে যে কোন মুহুর্তে তা পচনশীল ঘা বা দুষ্টঘাতে পরিণত হতে পারে। রক্তবাহী ধমনীগাত্রের অনমনীয়তা এবং সংকীর্নতা, স্নায়বিক সিষ্টেমের দুর্বলতা এর উত্তেজক কারণ। বলা বাহুল্য এই কারণ গুলিও ডায়েবেটিস রোগ থেকেই উদ্ভূত।

ডায়েবেটিসের পুরাতন উপসর্গ
(Chronic Complications of Diabetes)

1) স্নায়বিক তন্ত্রের বিশৃঙ্খলা (Diabetic neuropathy) ঃ ডায়েবেটিস রোগ আক্রমন ঘটলে রোগীর স্নায়বিক তন্ত্রের গোলযোগ উপস্থিত হয়। দেখা গেছে অধিকাংশ রোগীই (প্রায় ৯৫ ভাগ) স্নায়বিক চাপ এর অধীন এবং অন্যান্য স্নায়বিক পীড়ার শিকার হয়ে থাকেন। তাদের মধ্যে আবার ৩০ থেকে ৪০ ভাগ রোগীই এই উপসর্গে এত অধিক আক্রান্ত হন যে তারা প্রায় মানসিক ভার সাম্যও প্রায় বজায় রাখতে পারেন না। কেউ অতিরিক্ত রাগী কেউ বা খিটখিটে কেউ বা বিমর্ষ, উদ্বিগ্ন ইত্যাদি উপসর্গে ভোগেন। এই স্নায়বিক লক্ষণ সমূহ স্পর্শ অনুভূতিকে আক্রমন করে। কখন কখন দেখা যায় কারো কারো স্পর্শানুভূতি অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায় বা কমে যায়. যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে সামনে কাউকে দেখলেই মনে করে তার অঙ্গ মনে হয় স্পর্শ করল এরূপ বোধের ফলে আৎকে ওঠে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় চিমটি কাটলেও সে টেরই পায় না যে কেউ তাকে স্পর্শ করেছে। রোগী তার হাত পায়ে একটা জ্বালার অনুভুতি অনুভব করে। রোগীর এরূপ অনুভূতি দিনের থেকে রাত্রেই অধিক বৃদ্ধি পায়, এবং সামান্য হাল্কা কোন ঢাকাও সহ্য করতে পারে না বলে শীতের সময়ও হাত পা লেপের বাইরে রাখতে বাধ্য হয়।

2) প্রস্রাব সংক্রান্ত ব্যাধি (Complications of Urinary'system) ঃ ডায়েবেটিস আক্রমনের পাচ ছয় বছর পর থেকেই মূত্র গ্রন্থি গুলো ক্রমশঃ দূর্বল ও হীনবল হতে আরম্ভ করে। কারণ রক্ত মধ্যস্থ অতিরিক্ত চিনিকে filter করতে করতে মূত্র গ্রন্থির মধ্যস্থ glomeruli নামক অতিসূক্ষ্ম জালিকা যার মাধ্যমে filter কার্য্য সমাধা হয় সেগুলোর অন্তর্গাত্র অনমনীয় ও কঠিনতা প্রাপ্ত হতে থাকে। এরুপ অবস্থাকে 'glomerulosolerosis' বলে। এর সঙ্গে সঙ্গে মূত্রগ্রন্থির রক্তবাহী নালীকা সমূহও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত ও অনমনীয় হয়ে ওঠে। এর ফলেই মূত্রের সঙ্গে চিনি বা শর্করা জাতীয় পদার্থ নির্গত হতে থাকে, সারা শরীরে জল জমে শরীর ফুলে ওঠে এবং মূত্রগ্রন্থিদ্বয় তাদের কার্যক্ষমতা হারিয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটায়। ডায়েবেটিসে যদি কিডনী আক্রান্ত হয়ে স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারায় তবে Serum Urea এবং Creatanine এর স্তর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মাথা ঘোরা, গা পাক দেওয়া এবং বমির উদ্রেক হয় এবং রোগী ক্রমে ক্রমে চেতনা শক্তি দুর্বল হতে হতে অচৈতন্য হয়ে পরে। এই অচৈতন্য অবস্থা দেখেই রোগের গুরুত্ব এবং ভাবীফল সম্পর্কে আগে থেকেই অবহিত হওয়া যায় যে রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। এরূপ অবস্থাকে ইউরিমিক কোমা নামে অভিহিত করা হয়।

3) হৃৎপিন্ডের রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার বিকৃতি (Complications of the Cardio Vascular) ঃ ডায়েবেটিস দ্বারা আক্রান্ত হলে রক্তবাহী নালীগুলির মধ্যকার গাত্র

কোলেষ্টরল ও ক্যালসিয়ামের তলানি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শক্ত ও সঙ্কুচিত হতে থাকে এই সঙ্কুচিত ও অনমনীয় নালীকাগুলির মাধ্যমে রক্ত চলাচল অনায়াসে ও সহজভাবে করতে পারেনা বলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং হস্ত পদাদিতে উপযুক্ত পরিমান পুষ্টি যোগান দিতে পারে না। এর ফলে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্রমশঃ শীর্ন হতে থাকে এবং কিছুমাত্র পরিশ্রম করলেই বা সামান্য হাটাহাটী করলে শরীরের মাংস পেশীতে যন্ত্রনা অনুভূত হয়।

রক্তবাহী নালীগুলিতে যথাযথভাবে রক্ত সঞ্চালনের বিঘ্ন উপস্থিত হলে তাকে peripheral arterial disease বলে। এই অবস্থা প্রায় বেশীর ভাগ ডায়েবেটিস রোগীরই হয়ে থাকে। এই রোগ যদি অধিক বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তবে তা দুষ্টঘা বা Gangrene এ পরিনত হয়। রক্তবাহীনালীর সংকোচনতা এবং অনমনীয়তা বশতঃ ডায়েবেটিস রোগীর রক্তচাপ ক্রমশঃই বৃদ্ধিপেতে থাকে। করোনারী আর্টারীর ক্রিয়াবিশৃঙ্খলতা এবং বিকৃত অবস্থা বেশীর ভাগ ডায়েবেটিস রোগীর মধ্যেই দেখা যায়। এই জন্যই বেশ কিছু সংখ্যক ডায়েবেটিস রোগীকে Coronary Arterey রোগে আক্রান্ত হয়ে মরতে দেখা যায়। Coronary Artyry যখন সঙ্কুচিত হতে আরম্ভ করে তখন হার্ট আর তার প্রয়োজীনয় পুষ্টি রক্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারে না। এরূপ অবস্থায় বুকের বা দিকে এক প্রকার ঘিনঘিনে যন্ত্রনা অনুভব হয়। এই যন্ত্রনাকে বলা হয় Anjina pectoris। আর যদি Coronary Artery তে সম্পূর্ণরূপে রক্ত চলাচল বন্ধ হয় তবে Heart attack হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটে। এই জন্যই সাধারনতঃ অন্য রোগে আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে ডায়েবেটিস রোগীর তুলনা মূলক ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে ডায়েবেটিসের রোগী শতকরা ৭/৮ ভাগ বেশী সংখ্যায় হার্ট এ্যটাকে মারা যায়। সাধারনতঃ স্ত্রীলোকেরা হৃৎরোগের শিকার কম হন, কারণ পুরুষের তুলনায় তাদের Heart অধিক শক্তিশালী হয়। কিন্তু ডায়েবেটিসে আক্রান্ত স্ত্রীলোক Heart attack এ পুরুষদের সমানই ফলভোগ করে থাকেন।

4) চোখের উপসর্গ (Complications of Eye) ঃ ডায়েবেটিক রেটিনোপ্যাথি অন্ধত্বের একটি মুখ্য কারণ। উন্নতিশীল দেশগুলোতে চোখের ছানি এবং ভিটামিন এর অভাব অন্ধত্বের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ। আমেরিকাতে প্রতি ছয় জন অন্ধের মধ্যে একজন্ই ডায়েবেটিক রেটিনোপ্যাথির শিকার।

বস্তুত ডায়েবেটিস চোখের মধ্যস্থ সূক্ষ্মরক্তবাহী নালীকাকে বিকৃত করে। রেটিনার মধ্যস্থ এই সমস্ত Capillary গুলো অস্বাভাবিক ভাবে বিকৃত ও আহত হবার ফলেই চোখের এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এর ফলেই ক্রমশঃ দৃষ্টি শক্তির বিকৃতি ঘটে।

এরূপ অবস্থা বেশ কিছুদিন চলতে থাকলে Capillary গুলো ক্রমশঃও পাতলা হতে থাকে এবং rupture হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এর ফলে retinal heamorrhage হয়ে থাকে। Ratina তে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হলে detachment of ratina উপসর্গ সৃষ্টি হয় এবং হঠাৎ দৃষ্টি শক্তি লোপ পায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ডায়েবেটিস রোগে

সিলিয়ারী পেশীর দুর্বলতার জন্য দৃষ্টিশক্তির বৈলক্ষন্য হয়ে থাকে।

5) অন্যান্য লক্ষণ ঃ— ডায়েবেটিস রোগীর এক প্রকারের থাইসিস বা যক্ষ্মা রোগ হতে দেখা যায়। তবে ঐ থাইসিস টিউবার কুলার নয়, ক্রনিক ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া। মৃত্যুর ২/৩ মাস আগে আরম্ভ হয়ে অতি শীঘ্রই ঐ রোগ ভীষণ আকার ধারণ করে । প্রথম একটি ফুসফুস এবং পরে অপরটিও আক্রান্ত হয়। ডায়েবেটিস রোগীর এরূপ নিউমোনিয়া হলে বাঁচার আশা খুবই কম থাকে। তবে এই রোগে আক্রান্ত রোগীর বেশীরভাগই মৃত্যু কার্বাংকল ও গ্যাংগ্রীন হতেই হয়ে তাকে। সামান্য একটু কেটে বা ছড়ে গেলে ঐ ঘা আর কিছুতেই শুকাতে চায় না। ক্রমশঃ ঐ ঘা গ্যাংগ্রিনে পরিনত হয়। সুতরাং ডায়েবেটিস রোগীর অতি সতর্ক ভাবে থাকা উচিৎ যাতে শরীরে কোনরূপ কাটা ছেড়া না হয়ে থাকে। দাড়ি কামানো চালফেরা ইত্যাদিও খুব সচেতন ভাবে করাই বাঞ্ছনীয়।

6) পরিপাক তন্ত্রের উপসর্গ (Complications of digestive System) ঃ ডায়েবেটিস রোগীদের বিভিন্ন প্রকারের পাকাশয়িক উপসর্গে প্রায়ই কষ্টপেতে হয়। মাঝে মাঝেই এরা মাথাঘোরা গা পাক দেওয়া এবং বমি করা ইত্যাদি উপসর্গে কষ্ট পায়। আমাশয় এবং পাতলা পায়খানা ও এদের সাধারণ উপসর্গ। শিশুরোগীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রায় ৩০ শতাংশ ডায়েবেটিসে আক্রান্ত শিশুরই যকৃৎ বৃদ্ধি (enlargement of liver) হতে দেখা গেছে। আবার বহু পর্যবেক্ষণ পরীক্ষনে এও ধরা পড়েছে যে পিত্ত থলিতে পাথর জমা (Stone in gallbladder) উপসর্গটি ডায়েবেটিস রোগীর একটি Common উপসর্গ। মোট gall stone রোগীর ৮০ শতাংশই ডায়েবেটিস রোগী।

পঞ্চম অধ্যায়

ডায়েবেটিসের লক্ষণ (Symptoms of Diabetes)

ডায়েবেটিস মেলিটাসের লক্ষণ ঃ

1) ঘন ঘন এবং প্রচুর পরিমানে শর্করা মিশ্রিত জলের মত বর্ণশূন্য প্রস্রাব (Polyurea) ঃ এটাই ডাবেটিসের প্রধান লক্ষণ। রোগ সামান্য প্রকারের হলে প্রতিদিন (২৪ ঘন্টায়) ১৪০ থেকে ১৭০ আউন্সের মত প্রস্রাব হয়। আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০২০ থেকে ১০৪০ পর্য্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু রোগ কঠিন আকার ধারন করলে ২৪ ঘন্টায় ৫০০ থেকে ৮০০ আউন্সের মত প্রস্রাব হয়ে থাকে, এবং প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫০ থেকে ১০৭০ পর্যন্ত হতে দেখা যায়। প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব অল্প থাকলেও অর্থাৎ ১০১৫ থেকে ১০২০র মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও প্রস্রাবে শর্করা থাকে। শর্করা প্রস্রাবের সঙ্গে প্রতি আউন্সেতে ৪/৫ গ্রেন থেকে ৪০/৫০ গ্রেন পর্যন্ত নির্গত হতে পারে।

ডায়েবেটিস রোগীর প্রস্রাবের সঙ্গে সুগার ছাড়া এলবুমেন ও কাইল বা অন্নরসও নির্গত হয়।

2) মুখের শুষ্কতা ও অত্যধিক পিপাশা (dryness of mouth and excessive thirst) ঃ (Polydipsia)

ডায়েবেটিস রোগীর অত্যধিক প্রস্রাবের নিমিত্ত রোগীর মুখ শুষ্ক ও আঠাআঠা মত হয়, মুখ মিষ্ট বা অম্ল স্বাদ যুক্ত হয়। অত্যধিক প্রস্রাবের নিমিত্ত রোগের আরম্ভ থেকেই রোগীর প্রবল জল তৃষ্ণা দেখা যায় এবং রোগের শেষ পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকে। প্রতিদিন রোগী ১২ থেকে ২৫ পাইট পর্য্যন্ত জল পান করে। এত অধিক পরিমানে জল পান করার কারন রোগীর জিভ প্রায়ই শুকনো থাকে, এমন কি জিভ শুষ্কতার দরুন কথা বলার সময় মুখের কথা আটকে যায়। ডায়েবেটিস রোগগ্রস্ত বক্তা তৃষ্ণার আতিশয্যে ৫/১০ মিনিট পর পর একটু জলপান না করলে আর বক্তৃতা দিতে পারে না। ঐ সময় জিভ এত বেশী শুকিয়ে যায় যে তা গরুর জিভের ন্যায় কাঁটা কাঁটা বোধ হয়। এরূপ অবস্থাকে বলা হয় 'বিফি-টাঙ্গ'। জিভ কখন কখন ফাটাযুক্ত দেখায়।

3) অত্যধিক ক্ষুধা (Polyphgia) excessive hunger : ডায়েবেটিস রোগে গ্লুকোজের পরিপাক হয় না। গ্লুকোজ দহনের ফলেই শরীরের শক্তি উৎপাদিত হয়। এই অবস্থায় শরীরের বিভিন্ন কোষেতে গ্লুকোজ প্রবেশ করতে না পারার ফলে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দেওয়ার রসদ হিসাবে শরীরের বিভিন্ন কোষগুলি গ্লুকোজপূর্ণ সিরামের জন্য আর্তনাদ করে। তাদের এই আর্তনাদই ক্ষুধারূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু যতই খাকনা কেন চিনি যুক্ত খাদ্য খেলেই চিনির পরিপাক না হওয়ার ফলে ঐ চিনি শক্তির যোগান দিতে পারে না ফলে তাদের ক্ষুধারও প্রতিনিবৃত্তি ঘটে না। এর ফলে সুগারের রোগী প্রতিনিয়তই ক্ষুধা অনুভব করে। পেট সর্বদাই খালি (empty) বোধ হয়, তারজন্য পুনঃ পুনঃ খেতে চায়, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কখনওই শান্তি হয় না।

4) শরীর শীর্ণ হওয়া ও ওজন কমে যাওয়া (Mearasmus and Loss of Weight) ঃ ডায়েবেটিস রোগে রোগী শীঘ্র শীঘ্র দুর্বল হয়, শরীর দ্রুত শীর্ণ হয় ও শুকিয়ে আসে, চেহারা রক্তশূন্য ফেকাসে হয়। শরীরের কোষসমূহ গ্লুকোজের যথাযথ উপযোগিতা ভোগ করতে না পারায় তারা শরীরের সুরক্ষিত চর্বি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করতে থাকার ফলে রোগীর চর্বি ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ দুর্বল হতে থাকে। এর ফলেই সে ক্রমশঃ ওজনে হাল্কা হতে থাকে।

5) দুর্বলতা, অবসন্নতা ও শরীর যন্ত্রনা (Weakness, fatigue and body-ache) ঃ শরীরযন্ত্র প্রয়োজনীয় পুষ্টি মাংসপেশীতে জমানো পুষ্টি থেকে সংগ্রহ করতে শুরু করে। এই কারনে ডায়েবেটিস রোগী দুর্বলতা ও গা-হাত-পায়ে ব্যাথা অনুভব করে থাকে। ক্রমশঃই সে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে।

6) মানসিক অবসন্নতা ও মনোযোগের অভাব (Mental faatigue and lack of concentration) ঃ ডায়েবেটিস রোগীর মানসিক অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হতে থাকে। কারন চিন্তা করার স্থূল উপকরন মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্কের কোষসমূহ সম্পূর্ণভাবে রক্তের উপর নির্ভরশীল। তারা রক্তস্থ গ্লুকোজ থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করে সতেজ ও সক্রিয় হয়। কিন্তু ডায়েবেটিস রোগীর রক্ত থেকে এরা প্রয়োজনীয় গ্লুকোজ সংগ্রহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে হীনবল হয়। এই দুর্বল মস্তিষ্ক তখন আর সুস্থ চিন্তা বা উচ্চ ভাবনার উপযোগি হয় না। এই জন্যই ডায়েবেটিস রোগীর অত্যধিক মানসিক অবসন্নতা, সুস্থ চিন্তার অভাব, অমনোযোগিতা, খিটখিটে মেজাজ ইত্যাদি মানসিক লক্ষণ গুলো প্রকাশ পায়।

7) স্বল্পেতেই চর্ম্ম, দাঁতের মাড়ি ও শ্বাসযন্ত্রে সংক্রামক ব্যাধি আক্রমনের প্রবনতাঃ ডায়েবেটিস রোগীর দাঁতের মাড়ি, চর্ম ও শ্বাসযন্ত্রে স্বল্পতেই এবং অনায়াসেই ঘা বা ইনফেকস হওয়ার প্রবনতা দেখা যায়। এর প্রধান কারণ হল ডায়েবেটিস রোগীর গ্লুকোজ পূর্ণ রক্ত রোগসৃষ্টিকারী জীবানু সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা উপযোগী এবং অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে। অপর পক্ষে রক্তে শর্করাধিক্যতা বর্তমান থাকলে কতগুলি গ্রন্থি ঠিক রূপে ক্রিয়া করতে না পারায় রক্তেতে যথোপযুক্ত গ্রন্থিরসের মাত্রার ভারসাম্যহীনতার ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার হ্রাস পেতে থাকে। এর ফলেই ডায়েবেটিস রোগী অনায়াসেই রোগ সংক্রামক জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হয়। এর জন্যই ডায়েবেটিস রোগীকে অনায়াসে চর্ম, মাড়ি এবং শ্বাস যন্ত্রের পীড়ায় ভুগতে দেখা যায়। এই জন্যই এরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ফোড়া, কার্বাংকল, দুষ্টক্ষত পায়োরিয়া , সর্দি ও কাশি ইত্যাদি রোগে কষ্ট পায়।

8) যে কোন কাঁটাছেঁড়া ঘায়ে পরিনত হয় এবং সারতে দেরী লাগে ঃ ডায়েবেটিস রোগীর শরীর যদি সামান্য একটুও কেটে বা ছড়ে যায় তবে তা কিছুতেই সারতে চায় না। ক্রমশঃ ঐ স্থান দিয়ে রস গড়ায় এবং ঘায়ে পরিনত হয়। এর প্রধান কারণ হল শর্করাপূর্ণ রক্ত হল পূঁজ উৎপাদক জীবানুর পক্ষে একটি উপযুক্ত ও অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টিকারী মাধ্যম। অপরদিকে ডায়েবেটিস রোগে চর্মে রক্ত যোগানদানকারী সূক্ষ্ম রক্ত নালীসমূহ এবং চর্মের অনুভূতি উৎপাদনকারী সূক্ষ্ম স্নায়ু সমূহ আক্রান্ত হয়। এদের আক্রমনের ফলে ক্রিয়া বিকৃতি ঘটায় এই সূক্ষ্ম রক্তনালী বা স্নায়ু সমূহ সহজ সরলভাবে চর্মে রক্ত যোগান বা অনুভূতি পরিবহন করতে পারে না। এর ফলে ডায়েবেটিস রোগীর ছোটখাটো কাটা ছেড়াও সহজে সারতে চায় না এবং তা পরবর্তীকালে ক্ষত বা ঘায়ে পরিনত হয়ে যায়।

9) দৃষ্টি শক্তির এবং চশমার পাওয়ারের ঘন ঘন পরিবর্তন ঃ ডায়েবেটিস রোগীর দৃষ্টিশক্তি ঘন ঘন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এর প্রধান কারণ হল চোখের মধ্যে এক প্রকার স্বচ্ছ তরল পদার্থ থাকে যা দৃষ্টি শক্তিকে নিয়ন্ত্রন করে। রক্তে শর্করা অধিক জমলে চোখের ঐ স্বচ্ছ তরল পদার্থ ঘনীভূত হয়ে ক্রমশঃ অস্বচ্ছ হতে থাকে। এর ফলে রোগীর দৃষ্টিশক্তির ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটে এবং চশমার পাওয়ার ও মুহুর্মুহু পরিবর্তন করতে হয়।

10) সারা শরীরে এক প্রকারের চুলকানি বিশেষ করে যৌন অঙ্গে।

ডায়েবেটিস রোগির অধিকাংশ ক্ষেত্রে সারা শরীরে এক প্রকারের চুলকানি লক্ষ্য করা যায়। নার্ভের শেষ প্রান্তে অর্থাৎ চর্মের একটু নীচে এই প্রকার উত্তেজনা ও চুলকানি হয়ে থাকে। রক্তে শর্করার ভাগ অধিকাংশ হওয়ার ফলে এরূপ ঘটে থাকে। বিশেষ করে স্ত্রী রোগিনীদের ক্ষেত্রে যৌন অঙ্গে একপ্রকার Pruritis Valva নামক চুলকানি প্রকাশ পেয়ে থাকে, যা, জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। আর পুরুষ রোগীদের ক্ষেত্রে যৌন অঙ্গের ওপর দিকটা চুলকানি প্রকাশ পায়, তবে এই রোগে স্ত্রী রোগীদেরই কষ্ট দেয় অধিক।

11) যৌন সংসর্গে অক্ষমতা বা ধ্বজ ভঙ্গ ঃ ডায়েবেটিস রোগিদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌনসংসর্গে অক্ষমতা বা ধ্বজভঙ্গ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। মাংসপেশীর পুষ্টির ক্রম হ্রাস মানতা, দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা, মানসিক চাপ, রক্ত সংবহন তন্ত্রের এবং স্নায়বিক তন্ত্রের আকস্মিক পরিবর্তন ও বিকৃতি এই রোগের মূখ্য কারণ।

12) ডায়েবেটিস কোমা বা অচৈতন্যতা ঃ ডায়েবেটিস আক্রমনের প্রথম অবস্থায় শরীরের কোষগুলি প্রয়োজনীয় খাদ্য রক্তে না পেয়ে জমানো চর্বি থেকে বিশ্লেষন করে সংগ্রহ করে নিজ পুষ্টি সাধন করে থাকে। চর্বি বিশ্লেষন কার্যের ফলে রক্তে Ketone এর উদ্ভব ঘটে। অতিরিক্ত Ketone রক্তকে দূষিত ও এসিডিক করে তোলে। এই দূষিত রক্ত মস্তিস্কে পরিচালিত হয়ে দ্বারে দ্বারে অচৈতন্য অবস্থার সৃষ্টি করে। এই অচৈতন্য অবস্থাই (ডায়েবেটিক কোমা) নামে অভিহিত হয়।

এছাড়াও এই রোগ আক্রমনের প্রথম অবস্থা থেকেই রোগীর বমন, বিবমিষা মুখ আঠা আঠা, শিরপীড়া, অনিদ্রা, মানসিক চাঞ্চল্যতা, ক্রমশ মূত্রের পরিমান বৃদ্ধি, মূত্রের বর্ণ ক্রমশঃ জলবৎ হওয়া, মূত্রের নীচে কোনরূপ তলানি না জমা, মূত্রে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ, পেশীর দুর্বলতা, রমনকার্যে অক্ষমতা, স্নায়বিক দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এই রোগ আক্রমণ করলে রোগীর ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উভয়ই অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। প্রস্রাবে চিনির ভাগ যত বৃদ্ধি পায় জল পিপাসাও তত অধিক বাড়তে থাকে। প্রস্রাবে শর্করা যত অধিক নির্গত হবে রোগীও সেই পরিমানে মিষ্টি দ্রব্য খেতে চাইবে। কোন কোন রোগীর দাঁতের মাড়ী ফুলে উঠে ঘা হয়। অনেকের শীঘ্র শীঘ্র দাঁত পড়ে যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ডায়েবেটিস রোগ নির্ণয় পদ্ধতি (DIAGNOSIS OF DIABETES)

ডায়াবেটিস রোগ বিভিন্ন লক্ষণাবলী, রোগীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, দৈহিক চেহারার পরিবর্তন ইত্যাদি দ্বারা সহজেই নির্ণয় কার যায়। কিন্তু এই লক্ষনাবলী তরুন অবস্থায় আত্ম প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু জটিল ও পুরাতন রোগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু

রোগীকে দেখা যায় যে তাদের ডায়েবেটিস রোগ এত ধীরে ধীরে এবং নিরবে আক্রমন করতে থাকে যা তাদের কোন প্রকার লক্ষণ উপসর্গ বা বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা প্রকাশিত হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে রোগীর প্রস্রাব ও রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে সহজেই রোগ নির্ণয় করা যায়। তাছাড়া রোগের তরুন অবস্থায় যে সমস্ত লক্ষণ এবং উপসর্গের দ্বারা রোগ নির্ণয় করা হয়ে থাকে, অনুরূপ লক্ষণ ও উপসর্গ অপর বিভিন্ন প্রকার রোগেও উপস্থিত থাকে। সুতরাং ঐ লক্ষনাবলী কি সত্যিই ডায়েবেটিস রোগ জ্ঞাপক না অন্য রোগ সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যও প্রস্রাব ও রক্ত পরীক্ষা করা উচিৎ।

প্রস্রাব পরীক্ষা দ্বারা সন্দেহ যুক্ত রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয়ে সহায়তা হয় এবং প্রস্রাবের সঙ্গে কি পরিমাণে শর্করা নির্গত হচ্ছে তা নির্ণয় করা যায় ফলে রোগীর যথাযথ ওষুধ নির্বাচন, পথ্যনির্বাচন, ও আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ অতি সহজ সাধ্য ও সঠিক হয়। আবার মাঝে মাঝে রক্ত পীরক্ষা দ্বারা রক্তে অবস্থিত শর্করার পরিমান এবং প্রস্রাব পরীক্ষা দ্বারা মূত্রের সঙ্গে নির্গত শর্করার পরিমান জেনে নিলে রোগের গতি ও ভাবীফল সহজেই নির্ণয় কার যায়।

রোগ নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা

1) Fehling's Test (ফেলিংস এর পীরক্ষা) এই পরীক্ষাতে প্রথমে Fehling's Test Solution নিতে হয়। এই Solution এর মধে টার্টারেট অফ্পটাস, কষ্টিক সোডা ও সালফেট্ অফ কপার আছে।

একটা টেষ্টটিউবে এই Solution ১ ড্রাম নিয়ে উত্তপ্তকরতে হবে, Solution ফুটতে আরম্ভ করলে তৎক্ষনাৎ তাতে ২/১ ফোঁটা প্রস্রাব ঢেলে দিতে হবে। মূত্র দেবার পরেও Solution এর রং যদি ঠিকমত থাকে অর্থাৎ রঙের কোনরূপ পরিবর্তন না হয় তবে তার মধ্যে এক ড্রাম পরিমান মূত্র ঢেলে পুনরায় উত্তপ্ত করতে হবে। ফুটতে আরম্ভ করলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ টেষ্ট টিউবটিকে ঠান্ডা করতে হবে। মূত্রে যদি শর্করা বর্তমান থাকে তবে ঠাণ্ডা হবার আগে টিউবের নিচে লাল বা হলুদ রঙের 'অক্সাইড্ অফ্ কপার' এর একটি স্তর জমা হবে। যদি মূত্রে অতি অল্প পরিমান শর্করা বর্তমান থাকে তবে তাতে অধিক পরিমান Fehling's Solution মিশিয়ে ফোটালে ঐ মূত্র তখনই অস্বচ্ছ গাঢ় হলুদরঙের হবে এবং উজ্বল হলুদ রঙের পদার্থ সমূহ টিউবের নিচে ক্রমশঃ জমতে থাকবে।

তবে মূত্রে যদি এলবুমেন, ক্লোরোফরম্ স্যালিসিলিক এসিড ও ইউরিক এসিড ইত্যাদি থাকে তবে এই পরীক্ষায় একটু বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তাই বিজ্ঞান বিদ পেভি বলেন যে, সকল মূত্রে এলবুমেন মিশ্রিত শর্করা থাকে সে সকল প্রস্রাব পরীক্ষা করতে হলে আগে মূত্র থেকে এলবুমেন বার করে তারপর এই প্রানালীতে পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। এলবুমেন মিশ্রিত মূত্রকে এসেটিক এসিড সংযোগে ফুটিয়ে নিয়ে ফিল্টার করে নিলে ঐ মূত্র এলবুমেন

মুক্ত হবে। এর পর তাতে সামান্য পরিমান কষ্টিক সোডা মিশ্রিত করলে মূত্রস্থ মিশ্রিত এসিডের প্রতিক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে। এরপর ঐ মূত্রকে যথা নিয়মে পরীক্ষা করে অনায়াসে ডায়েবেটিস রোগীর রোগ নির্ণয় করা যাবে।

মূত্রে সুগার আছে কিনা তা নির্ণয়ের আর একটি সহজ পদ্ধতি—

2) Benedict's Test

মূত্রে সুগার বা গ্লুকোজের বর্তমানতা পরীক্ষার এটা একটা সহজ ও সরল পদ্ধতি। এই প্রনালীতে মূত্রে গ্লুকোজের পরিমান ও অতি সহজে নির্ধারণ কার যায়। এই পরীক্ষাটি রোগী বাড়িতে বসেও সহজেই করতে পারেন।

এই পরীক্ষাকার্যে যে সকল সাজ সরঞ্জাম প্রয়োজন তা হল টাটকা Benedict's Solution (যেন তিনমাসের থেকে বেশী দিনের পুরাতন না হয়) ড্রপার, টেষ্ট টিউব, টেষ্টটিউব হোল্ডার, স্পিরিটল্যাম্প।

পরীক্ষাপ্রনালী (Procedure) ঃ প্রথমে টেষ্টটিউবে এক ড্রাম (5 ml Benedict's solution নিতে হবে। এখন স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে এই solution কে ক্রমাগত উত্তপ্ত করতে হবে যতক্ষণ না ঐ Solution উথলে ওঠে। এরপর Solution ফুটন্ত অবস্থায় ৮/১০ ফোটা মূত্র ঢেলে দিতে হবে। এই মিশ্রনকে পুনরায় ফুটিয়ে ঠান্ডা করতে হবে। হবার সময় এই মিশ্রনের বর্ণ ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে থাকবে। মূত্রের এই বর্ণ পরিবর্তনই মূত্রে উপস্থিত সুগারের পরিমান নির্দেশ করবে। যদি মূত্রের রঙ নীল হয়ে যায় তবে বুঝতে হবে যে তাতে সুগার নেই। যদি সবুজ বর্ণ ধারণ করে তবে বুঝতে হবে তাতে ০.৫% ভাগ সুগার উপস্থিত আছে। মূত্রের রঙ যদি হলুদ হয় তবে বুঝতে হবে তাতে ১% ভাগ সুগাব বর্তমান। আর যদি মূত্রের রং সমলা হয় তবে বোঝা যাবে তাতে ১.৫% ভাগ শর্করা রয়েছে। মূত্রের রং যদি ফ্যাকাসে লাল আকার ধারণ করে তবে বুঝতে হবে ঐ মূত্রে ২.০ ভাগ শর্করা বর্তমান আছে।

মূত্রস্থ ঘনীভূত সুগারের পরিমান নীচের ছবির রঙের সঙ্গে ঐ মূত্রের রং মিলিয়ে সমকক্ষ ছবির পার্শ্বে লিখিত শর্করার পরিমান নির্ণয় করা সহজ হবে।

নীলসবুজ	হলুদ	সামলা	লাল	
সুগার নেই	০.৫% সুগার	১% সুগার	১.৫% সুগার	২.০% সুগার

এখানে একটা কথা জেনে রাখতে হবে যে এই পরীক্ষা করতে যে মূত্র নেওয়া হবে তা কিন্তু পূর্ণ আহারের ২ ঘন্টা পর সংগ্রহ করতে হবে। কারণ রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ডায়েবেটিস রোগী খালিপেটে থাকাকালীন তার মূত্রে কখনও সুগার নির্গত হয় না। সুতরাং মূত্রের Benedict's Test যদি উপোষ কালীন (Festing state) মূত্র সংগ্রহ করা হয়ে থাকে তবে কিন্তু আসল তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না।

Benedict's Test এ মূত্র পীরক্ষা করে তাতে সুগার যদি পাওয়া যায়ও তবে যে রোগীর ডায়েবেটিস হয়েছেই এরূপ কোন কথা নেই। কারণ কখন কখন রক্তে চিনির তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধি না পেলেও প্রস্রাবের সঙ্গে সুগার নির্গত হতে দেখা যায়। এটা কিডনী সংক্রান্ত ব্যাধি। সুতরাং মূত্র পরীক্ষায় সুগার ধরা পড়লে ডায়েবেটিস রোগ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবার জন্য রক্তও পরীক্ষা করে নিতে হবে।

3) Clinitest

মূত্রে শর্করার উপস্থিতি এবং পরিমান নির্ণয়ের আরো সহজ ও সরল পদ্ধতি হল clinitest, এই প্রনালী দ্বারা অতি সহজেই প্রতিটি গৃহস্থ মানুষই আপন মূত্রে শর্করার উপস্থিতি বা পরিমান নির্ধারণ করতে পারবেন। এরজন্য clinitest নামক এক প্রকার Tablet প্রয়োজন। এই Clinetest tablet বাজারে সর্বত্রই পাওয়া যায়।

প্রথমে একটি Test Tube এ ৫ ফোঁটা মূত্র এবং ১০ ফোটা জলের একটি মিশ্রন তৈরী করতে হবে। এরপর ঐ মিশ্রনে একটি Clinitest tablet দিয়ে মিশিয়ে তা স্পিরিট ল্যাম্পে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করতে হবে। এখন এই মিশ্রনটি উত্তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বর্ণ ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে থাকবে। এই মিশ্রনের রঙ দেখে প্রস্রাবে সুগারের উপস্থিতি ও পরিমান নির্ণয় করতে পারা যাব। পরিমান নির্ণয় পদ্ধতি আগের মতই অর্থাৎ মিশ্রনের রঙ নীল হলে অনুমান করতে হবে তাতে সুগার নেই। রং যদি সবুজ হয় তব বুঝতে হবে ১/২% শতাংশ সুগার রয়েছে। মিশ্রনটির রং হলুদ হলে ১% শতাংশ এবং লাল হলে 2% শতাংশ সুগার প্রস্রাবে উপস্থিত রয়েছে বলে বুঝতে হবে।

4) Glucose Oxidose Test

আর একটি পদ্ধতিতে মূত্রে সুগারের উপস্থিতি এবং পরিমান নির্ধারন করা যায়। এই পদ্ধতিটি আগের পদ্ধতিগুলোর থেকে আরও অধিক সহজ ও সরল। এই পদ্ধতি অনুসারে Diastix দ্বারা নিমেষের মধ্যে মূত্র পরীক্ষা করা যেতে পারে। এই Diastix হল এক প্রকার কাগজ বা প্লাষ্টিকের ষ্ট্রিপ। একে Testape ও বলে। এই testape বাজারে পাওয়া যায়। এই Strips এর সঙ্গে বিভিন্ন রঙের একটি তালিকা দেওয়া থাকে। প্রস্রাবে সুগারের উপস্থিতি এবং পরিমান নির্ণয় করতে হলে রোগীকে পেটভরে পুর্ণরূপে আহার কারনোর দুই ঘন্টা পড়ে প্রস্রাব করতে হবে। প্রস্রাব করার সময় এই Tes-tape টিকে কিংবা একটি diastix Strip কে এমন ভাবে ধরতে হবে যাতে প্রস্রাব তার উপর পতিত হয়। ২/১ সেকেণ্ডের মধ্যেই Strip এর রং পরিবর্তিত হতে শুরু করবে। ৩০ থেকে ৬০ সেকেণ্ডের মধ্যে Strip এর রঙ তালিকায় দেওয়া রঙের যে কোন একটার সমকক্ষ হবে। ঐ তালিকায় যে রঙে যত শতাংশ সুগার বর্তমান আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে Strip টি তার সঙ্গে মিলিয়ে সহজেই মূত্রে সুগারের পরিমান নির্ধারণ করা যাবে।

রক্তে সুগার পরীক্ষা (Blood sugar Test)

আমাদের একটা কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে একটা নির্দিষ্ট পরিমান চিনি রক্তের উপাদান হিসাবে রক্তে সর্বদা থাকবে। কিন্তু যখন এই নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করবে তখনই চিন্তার কারণ হয়ে উঠবে। এইজন্য রক্ত পরীক্ষা করে জেনে নিতে হবে যে ঐ মাতার অতিক্রম করেছে কিনা। Blood Sugar Test এ যদি দেখা যায় যে চিনির পরিমান নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে তবে তা DIABEETES রোগের নির্দেশক বলে গন্য করতে হবে।

খালিপেটে রক্ত শর্করা পরীক্ষা (Fasting Blood Sugar Test)

এই পদ্ধতিতে রক্ত পরীক্ষা করতে হলে খালিপেটে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে এবং ঐ রক্ত রীক্ষা করে তাতে উপস্থিত রক্তের পরিমান নির্ণয় করে রোগীর রক্তে শতকরা কত ভাগ চিনি রয়েছে তা নির্ধারণ করতে হবে।

কেবল মাত্র এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করে ডায়েবেটিস রোগ নির্ধারণ করা সব সময় ঠিক নয় কারণ খালিপেটে রক্তে চিনি পরিমান স্বাভাবিকও থাকতে পারে। সুতরাং শুধু এই একটি পদ্ধতির উপর নির্ভর করে ডায়েবেটিস রোগ নির্ধারণ ঠিক নয়। তবুও একথা ঠিক যে যদি দুইটি স্বতন্ত্র ব্যাপারে রক্তে সুগারের পরিমান খালি পেটে একশ চল্লিশ মিলিগ্রাম এর বেশী হয় তবে এটা নিশ্চিৎই ডায়েবেটিস রোগের নির্দেশক।

ভোজনান্তর রক্ত শর্করা পরীক্ষা (Post-Prandial Blood Sugar Test)

এই পদ্ধতিতে রক্ত পরীক্ষা করতে হলে পূর্ণরূপে ভোজনের দুঘন্টা পর কিম্বা পঁচাত্তর গ্রাম গ্লুকোজ খাবার পর রক্তের নমূনা সংগ্রহ করতে হবে। ঐ রক্ত পরীক্ষা করে তাতে চিনির পরিমান নির্নয় করে রোগীর রক্তে শতকরা কত মিলিগ্রাম চিনি রয়েছে তা নির্ধারন করতে হবে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা মনে পূর্ণভোজনের দুঘন্টা বাদে নেওয়া রক্তেতে চিনির পরিমান শতকরা দুশ মিলিগ্রামের অধিক হয় তবে রোগীর ডায়েবেটিস হয়েছে। আর রক্তে সুগারের পরিমান যদি একশ চল্লিশ থেকে দুশ মিলিগ্রামের মধ্যে থাকে তবে তাকে 'Impaired Glucose Tolerance' বলে। এটাই রক্তে শর্করার পরিমান নির্ধারণের সর্বাধিক বিশ্বস্ত পদ্ধতি এবং ডায়েবেটিস রোগ নির্ধারণের ক্ষেত্রে Fasting বা খালিপেটে রক্ত পরীক্ষার পদ্ধতির থেকে এই পদ্ধতিটি অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য।

ডায়াবেটিস রোগ নির্ধারণে সাহায্যকারী অপর কয়েকটি পরীক্ষা (Other investigations which may help the diabetic)

(1) Rothera's test for acetone : মূত্রে acetone উপস্থিত আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করা হয়েছে। এহি পদ্ধতি অনুসারে Acetone পরীক্ষা করতে হলে প্রথমে একটি টেস্ট টিউব নিতে হবে। এই টেস্ট টিউবটিতে এক তৃতীয়াংশ এমোনিয়াম সালফেট দ্বারা পূর্ণ করতে হবে। এই মিশ্রণের মধ্যে আট থেকে দশ ফোঁটা ০.০৫% সেডিয়াম নাইট্রোপ্রু সাইড সলিউশন মিশ্রিত করতে হবে। অবশেষে টেস্ট টিউবে সর্বশেষ এক থেকে দুই মিলি লিটার ঘন এমোনিয়া সলিউশন যোগ করতে হবে।

যদি মূত্রে উপস্থিত থাকে তবে টেস্ট টিউবের মধ্যে অবস্থিত এই মিশ্রনটি বেগুনী বর্ণ ধারণ করবে।

2) Sulpnosalicylic test for albumin (মূত্রে albumin উপস্থিত আছে কিনা তার পীরক্ষা) প্রথমে মূত্রকে ভাল করে ছেঁকে নিতে হবে। এরপর একটি টেস্ট টিউবে এই পরিষ্কার মূত্রের এক মিলি লিটার পরিমান নিতে হবে। এবার একে এক এম. এল (মিলি লিটার) পরিমান Sulho salicylic cid যোগ করতে হবে। এখন এই মিশ্রনটিকে ১০ মিনিট রেখে দিতে হবে। ১০ মিনিট পর যদি মিশ্রনটি ধোঁয়াটে রঙ ধারণ করে কিংবা অনেকটা দুধের মত বর্ণের হয় তবে বুঝতে হবে মূত্রে Albumir রয়েছে। আর যদি ১০ মিনিট পরেও মিশ্রয়ি প্রস্কার বর্ণের থাকে তবে বুঝতে হবে যে মূত্রে Albumin নেই।

3) Gerhardt's test for aceto-ccietic acid :

(মূত্রে aceto--acetic acid আছে কিনা তার পরীক্ষা)

এই পরীক্ষার জন্য একটি Test Tube এ একড্রাম পরিমান মূত্র নিতে হবে, এবার এতে ৩% Ferric Chooride Solution একবিন্দু একবিন্দু করে ঢালতে হবে। কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে যে Test tube এর নিচে সাদারঙের Ferric phosphate এর একটি তলানি জমেছে। এতে আরও Ferric Chdoride এর Solution ঢেলে দিতে হবে এবং মিশ্রনটিকে একটি filter paper এর দ্বারা ছেঁকে নিতে হবে।

এখন মিশ্রনটি যদি বেগুনি রং কিংবা গাঢ় বাদামী রঙ ধারণ করে তবে বুঝতে হবে মূত্রে aceto-acctic-acid বর্তমান রয়েছে।

4) Test for Chlorides (মূত্রে Chloride আছে কিনা তার পরীক্ষা)

টেষ্টটিউবে ২৫ এম. এল. মূত্র নেওয়া হল এতে অতি ধীরে ধীরে ১০ ফোটা ঘন Nitric Acid ঢালা হল। পরিশেষে এই মিশ্রনে আবার % Silver Nitrate Solution মেশানো হল। এব পর লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে Test Tube এর নিচে দই এর মত সাদা একটি তলানী জমেছে। যদি তলানী না জমে বুঝতে হবে তাতে Choerides নেই

5) Test for Specific Gravity (মূত্রের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বা আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপা)

মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপার জন্য বাজারে Urinomiter বলে একটি যন্ত্র পাওয়া যায়। যন্ত্রটি আর কিছুই নয় একটি মোটা Test Tube এবং তাতে একটি Thermomiter বা দুধ মাপার Lactomiter এর মত একটি কাচের নল রয়েছে। মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপতে হলে প্রথমে মোটা টেষ্টটিউবটিতে মূত্র ঢালতে হবে। এবার ঐ মূত্রে ইউরিনোমিটার,যন্ত্রটি ডুবিয়ে লক্ষ্য করতে হবে তার গায়ে যে দাগ কাটা রয়েছে তার ক সংখ্যা পর্যন্ত জলমগ্ন হয়েছে। ইউরিনোমিটারে গায়ে অঙ্কিত যত চিহ্ন জলমগ্ন হবে মূত্রের অপেক্ষিক গুরুত্ব তত বলেই জানতে হবে। প্রস্রাবের স্বাভাবিক আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০২০ থেকে ১০৩০ পর্যন্ত। প্রস্রাবে যদি সুগার বা ইউরিক এসিড থাকে তবে তার আপেক্ষিক গুরুত্ব বেড়ে যায়। মূত্রে সুগার থাকলে Specidic Gracity বেড়ে ১০৩০ থেকে ১০৭০ পর্যন্ত হতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

ডায়েবেটিস-ইনসিপিডাস (Diabetes Insipidus)

এই রোগটিতে ঘন ঘন ও পরিমানে অধিক প্রস্রাব হলেও প্রস্রাবে চিনি বর্তমান থাকে না। প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব স্বাভাবিক অপেক্ষা কম হয়।

ডায়েবেটিস ইনসিপিডাসের লক্ষণ ঃ (Symptoms of Diabetes Insipidus) :

এই রোগের প্রধান লক্ষণ প্রস্রাব ঘন ঘন এবং পরিমানে অত্যন্ত অধিক হয়। রোগের উপসর্গ সমুহ ক্রমশঃ ও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়। প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব সাধারণ অপেক্ষা কম হয়ে যায়। ১০০০ থেকে ১০১০ এর মধ্যে থাকে। প্রস্রাব কলের জলের ন্যায় স্বচ্ছ ও বর্ণশূন্য হয়। প্রস্রাবে ইউরিয়া নির্গত হয়। প্রস্রাবের পরিমান অনুসারে জল পিপাসা কম বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন প্রচুর পরিমানে প্রস্রাব হয় তখন জলপিপাসা প্রবল থাকে আর যখন প্রস্রাবের মাত্রা কম হয় তখন জল পিপাসাও কমে যায়। ক্ষুধা বেস তীব্র থাকে। পেট খালি হলে রোগী খুব দুর্ব্বল ও অস্বস্তিবোধ করে, কিছু খেলেই সুস্থ অনুভব হয়। জিভ প্রায়ই শুষ্ক অনুভূত হয়, জিভে লালা নিঃসরণ কম হয়, জিভ লালবর্ণ ও চকচকে দেখায়, শরীরের তাপ স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশী কমে যায়। রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় হজম শক্তি হ্রাস পায়, মাথা যন্ত্রণা, অত্যাধিক দুর্বলতা, বিভিন্ন প্রকারের স্নায়বিক উপসর্গ দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ডায়েবেটিস মেলিটাসের প্রায় সমস্ত জটিল লক্ষণগুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হতে থাকে।

এই রোগটি দীর্ঘকাল ব্যাপী চলতে থাকে এবং একবার আক্রমন করলে আরোগ্য হতে বেশ বিলম্ব হয়। যদি রোগীর শারীরিক কোন যন্ত্রের ক্রিয়াতে ভীষণ ভাবে ব্যাঘাত উপস্থিত না হয় তবে সহজে রোগীর মৃত্যু হয় না। থেকে থেকে রোগটি মনে হয় যেন ভালো হয়ে গেল, কিছুদিন অতিক্রম করার পর পুনঃ প্রকাশিত হয়। রোগটির বিরাম কালে প্রস্রাবে সুগার নির্গত হয়।

এই সময়ে প্রস্রাব পরীক্ষা করলে তাতে সামান্য পরিমানে এলবুমেন ও বেশী পরিমানে ফসফেট অকজ্যালেট ও ইউরেট্স পাওয়া যায়, এই রোগের মূলে স্নায়বিক কোন গোলযোগ বর্তমান থাকে তাই স্নায়ুর দুর্বলতা বশতঃ বিভিন্ন স্নায়বিক লক্ষণ সমূহ দ্বারাও এই রোগীকে চেনা যায়।

ডায়েবেটিস ইনসিপিডাস রোগের কারণ (Cause of Diabetes Insipidus)

এই রোগটি উৎপত্তির প্রকৃত কারণ আজ পর্যন্ত কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানীই আবিষ্কার করতে পারেন নি। তবে অধিকাংশ চিকিৎসকের মতে স্নায়ুর গোলযোগই এই রোগের প্রধান কারণ। এতে শরীরের কোন যন্ত্রাদির পরিবর্তন হয় না। তাছাড়াও আনুসঙ্গিক যে সকল কারনে এই রোগটি সংঘটিত হয় বলে আজ পর্যন্ত জানা গেছে তা হল—

বংশানুক্রমিক আক্রমণঃ একে বলা হয় বংশগত দোষ। কোন ব্যক্তিকে একবার এই রোগ আক্রমণ করলে তার পরবর্তী ৩/৪ পুরুষ পর্যন্ত পর পর এই রোগে আক্রমণ করতে দেখা যায়।

তাছাড়া কোন কঠিন প্রকারের ব্যাধিতে আক্রমণ করলে বা তরুন রোগে ভোগার বা ভীষণ প্রকারের জ্বরের আরোগ্য অবস্থায় এই রোগের আক্রমণ হতে দেখা যায়।

নার্ভাস সিষ্টেমে প্রবল আঘাত (Shock) ও এই রোগের একটি অন্যতম মুখ্য কারণ। যেমন শোক তাপ, ভয়, মর্মাহত, মাথায় আঘাত ইত্যাদি কারণে এই রোগ দেখা দিয়ে থাকে।

মস্তিষ্কের কোন কঠিন পীড়া যেমন মস্তিষ্কে টিউমার, মস্তিষ্কে আঘাত, টিউবার কুলার মেনেনজাইটিস স্নায়বিক পক্ষাঘাত ইত্যাদির ফলে মস্তিষ্কের ওপর প্রবল আলোড়ণ ইত্যাদি কারনেও ডায়েবেটিস ইনসিপিডাস রোগাক্রমণ ঘটে থাকে।

পেটের মধ্যে কোন কোন সাংঘাতিক পীড়ার আক্রমণ যেমন পেটে টিউমার, টিউবারকুলার পেরিটোনাইটিস, পেটে এনিউরিজম ইত্যাদি কারনে ডায়েবেটিস এনসিপিডাস রোগের আক্রমণ ঘটে।

অষ্টম অধ্যায়

ডায়েবেটিস রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা (Prevention of Diabetes)

প্রথম থেকে সতর্কতা অবলম্বন করলে এই রোগের প্রতিরোধ করা সম্ভব। যেহেতু মাতাপিতা উভয়েরই যদি ডায়েবেটিস রোগ থাকে তবে তাদের সন্তানের এই রোগ হবেই সুতরাং যার ডায়েবেটিস রোগ রয়েছে তার বিয়ের ব্যাপারে এমন সম্বন্ধ দেখতে হবে যার মাতা পিতার উভয়েরই এই রোগ নেই। ডায়েবেটিস মুক্ত মানুষের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলে পরবর্তী বংশধরগণ উত্তরাধিকার সূত্রে এই রোগের আক্রমণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

যেহেতু খাদ্যের উপর ডায়েবেটিস রোগ অনেকাংশেই নির্ভরশীল তাই প্রথম থেকেই এই বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করলে এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব, সুসমপথ্য বিধি লঙঘন করার ফলেই এই রোগ প্রবেশের অধিকার পায়। প্রথম থেকেই খাদ্য বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান অর্জন এবং তা প্রতিপালন এই রোগের একটি উত্তম প্রতিষেধক ব্যবস্থা। সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে বর্তমানে যত ডায়েবেটিসের রোগী রয়েছে তার ৬০ ভাগই সুসম পথ্য বিধি লঙঘনকারী। সুতরাং এটা যে এই রোগের মূলে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শৈশবকাল থেকেই সন্তানকে সুসম পথ্যবিধি প্রতিপালন ও যথাযথ খাদ্য গ্রহনের একটা অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করা প্রতিটি সুমাতা পিতার একটা নৈতিক কর্তব্য হওয়া উচিৎ। কোন শিশুকেই আইসক্রীম, কেক, ডিম, পেয়াজ, জ্যাম, জেলি, চকলেট ইত্যাদি খাওয়ানো উত্তম মা-বাবার কর্তব্য নয়। তাদের প্রথম থেকেই যদি এই বিষয়ে সতর্ক করা হয় তবে কিন্তু এই সমস্ত অসম পথ্য গ্রহণকালে শিশুর একটা মানসিক নিয়ন্ত্রণ অনায়াসে গড়ে উঠবে। তাই ইচ্ছা হলেও এই সমস্ত রোগসৃষ্টিকারী কুখাদ্য সমূহ যথেচ্ছভাবে গ্রহণে বাধা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক মানুষেরই দৈনিক রুটিনে কিছু দৈহিক ব্যায়ামের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় রাখা প্রয়োজন। যেহেতু দৈহিক শ্রম বিমুখতা এই রোগের একটি বিশিষ্ট উৎপাদক কারণ তাই প্রত্যহ কিছু না কিছু দৈহিক শ্রম রুটীন মাফিক অবশ্যই করতে হবে। সম্ভব হলে প্রাতঃভ্রমণ, কিছু যৌগিক আসন প্রানায়াম ইত্যাদিরও অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

যে সমস্ত সন্তান মাতৃগর্ভে বেশীদিন থেকে অধিক পুষ্ট হয়ে বেশ বড়সড় হয়ে ভূমিষ্ট হয় তাদের স্বাস্থ্য দেখে আনন্দিত হওয়ার কোন কারন নেই। এর প্রধান কারণ হল তার মায়ের শরীরে সুপ্তভাবে ডায়েবেটিস রোগ অবস্থান করছে। যা শিশুতে সঞ্চারিত হয়েছে। সুতরাং এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হলে একেবারে প্রথম থেকেই সন্তানকে সুসম পথ্য বিধি এবং

আনুসঙ্গিক নিয়ম কানুন ঠিক মত পালন না করালে তার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ ডায়েবেটিসের আক্রমণ ঘটবেই ঘটবে।

অধিক স্থূলত্ব ও অধিক ওজন ডায়েবেটিস রোগের অন্যতম প্রধান কারন। সুতরাং এই দুইটি লক্ষণের কোন একটি লক্ষণ দেখা দিলেই যদি সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয় তবে আর রোগ জটিল আকার ধারণ করে খাল কেটে কুমীর আনার সুযোগ পায় না। যখনই দেখা যাবে স্বাভাবিক ওজন অপেক্ষা কারও ওজন অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে খাদ্যের দিকে। যে সকল খাদ্য তেল বা অধিক Fat যুক্ত এবং অধিক শর্করা যুক্তঐ সকল খাদ্যকে সর্বাগ্রেই বর্জন করা বাঞ্ছনীয়। এর পরেই যে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সেটা হল দৈহিক পরিশ্রম বা যোগ আসন, খালি হাতে ব্যায়াম, প্রাতঃভ্রমণ ইত্যাদি। তবে আর পরবর্তী ভয়াবহ অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে না।

ডায়েবেটিস রোগের সর্বপ্রধান কারণ কিন্তু Pancreas gland এর ক্রিয়া বিপর্জয়। Pancreas gland সাধারণতঃ দুই প্রকারের রস (Hormons) ক্ষরণ করে। প্রথমতঃ বহিঃক্ষরণ (external secretion) এবং দ্বিতীয়তঃ অন্তঃক্ষরণ (Internal secretion) বহিঃস্রাবী রসকে বলে Pancreatic Juice. এই রস তেল জাতীয় দ্রব্যকে Fat এ পরিণত করতে সহায়তা করে। অধিক পরিমানে আমিষ খাদ্য, অধিক পরিমানে তেলজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করলে এই রসের মাত্রা Pancreas gland কে খুব বেশী বাড়াতে হয় ফলে সে ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়ে। সুতরাং অতিরিক্ত তেল, ঘি, মাখন, সন্দেশ, বিকৃত মিষ্টি দ্রব্য ইত্যাদি খাদ্য গ্রহণ এই রোগের প্রধান উৎপাদক কারণ। আবার Pancreas gland এর অন্তঃস্রাবীরস (Inter secretion) চিনি জাতীয় দ্রব্যকে পরিপাক করতে সহায়তা করে। চিনিকে গ্লুকোজে পরিণত করে ঐ গ্লুকোজকে দহন করে তার থেকে শক্তি উৎপন্ন করে সারা শরীরে ছড়িয়ে দেয়। এই অন্তঃস্রাবী রসকে বলে Insuline. এই রসের অভাব বশতঃই ডায়েবেটিস হয়। Pancreas দুর্বল হলে এই রস যথাযথ ক্ষরণের ক্ষমতাও তার কমে যায় ফলে শর্করার যথাযথ পরিপাক না হয়ে ডায়েবেটিস রোগ উৎপন্ন হয়। চিনি, গুড়, মিষ্টিকুমড়া, মিষ্টি আলু, রসগোল্লা, সন্দেশ ভাত, আলু ইত্যাদি শর্করা জাতীয় দ্রব্য যত অধিক আহার করা যাবে, ঐ শর্করা জাতীয় দ্রব্যের অন্তস্থ শর্করাকে যথাযথ পৃথকী করন করতে না পারায় এর থেকে শর্করা যথেচ্ছভাবে রক্তে চলে আসে। সুতরাং ডায়েবেটিস রোগকে যথাযথ প্রতিরোধ করতে হলে যথাসম্ভব শর্করা জাতীয় দ্রব্য সমূহকে বর্জন করে চলতে হবে।

নবম অধ্যায়

ডায়েবেটিস রোগের চিকিৎসা (Treatment of Diabetes)

হোমিওপ্যাথিক মতে মানসিক, দৈহিক, চারিত্রিক ইত্যাদি সর্ববিধ লক্ষণাবলী বিচারপূর্বক যে ওষুধটি উপযুক্ত বলে মনে হবে সেটি প্রয়োগ করলে রোগীর ধাতুগত পরিবর্তন হয়ে রোগটি সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য হবে। এই জন্যই হোমিওপ্যাথিতে কোন রোগেরই বাধাধরা কোন ওষুধ নেই। যে ওষুধের লক্ষণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকবে সেই ওষুধটি যে কোন রোগেই ব্যবহার করতে হবে। তবে কোন কোন ওষুধে এমন কতগুলো লক্ষণ রয়েছে যা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষ কোন রোগে উপস্থিত থাকে। এই জন্যই অনেকের ধারণা হয়ে আছে যে Nux Vomica পায়খানার ওষুধ, Belladonna মাথা যন্ত্রনার ওষুধ। আসলে কিন্তু তা নয়, আসল কথা হল Nux ওষুধটিতে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত আছে তা অধিকাংশ পায়কানার উপসর্গে দেখতে পাওয়া যায়, এই জন্যই আমাদের চোখ বুজে পায়খানার ক্ষেত্রে Nux দেওয়ার রীতি চালু হয়ে রয়েছে। আসলে এটা ঠিক নয়। বেশীর ভাগ ডায়েবেটিস রোগের লক্ষণ গুলি যে সকল ওষুধে রয়েছে তা এখানে আলোচনা করছি। ওষুধ প্রয়োগের আগে ঐ ওষুধটির মানসিক ও অন্যান্য লক্ষণাবলী মিলিয়ে নিলে আরও অধিক উপকার হবে। এই পুস্তকের সর্বশেষে রেপাটারী অংশ সংযোজিত হল। সেখান থেকে মানসিক ও আনুসঙ্গিক লক্ষণাবলী সংগ্রহ করে নিতে হবে।

ডাঃ গুডনো বলেন এসিড্ ফস, ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম ও ক্রিয়োজোট এই রোগের শ্রেষ্ঠ ওষুধ। তারপর অরম মিউর আর্সেনিক, প্লাম্বাম আয়োড, নাক্স, ব্রায়োনিয়া ল্যাপ্‌টেন্ড্রা, পোডোফাইলম, ফেরাম ফস ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, সাইলিসিয়া, ষ্ট্রিকনি, আর্স মার্কসল, কেলি হাইড্রো, আর্স-ব্রোস, আর্ম ফ্রেবাস ইত্যাদি লক্ষণ অনুসারে ব্যবস্থা করতে হবে।

অষুধ ব্যবস্থা

১। Acid phos 2c এই ওষুধটি ডায়েবেটিস রোগের একটি অব্যর্থ ওষুধ। শর্করা যুক্ত ও শর্করা বিহীন উভয় প্রকার ডায়েবেটিস রোগেই এই ওষুধটি বেশ ভালো কাজ করে। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়চালনা যেমন স্বপ্ন দোষ, সাদা স্রাব, হস্তমৈথুন ইত্যাদি কারনে দুর্বল হয়ে রোগ উৎপত্তি হলে কিংবা ধাতু দৌর্বল্য ও রেতঃক্ষয় জনিত পীড়ায় এই ওষুধটি মন্ত্রের ন্যায় কাজ করে।

ডায়েবেটিস রোগে এই ওষুধটি প্রয়োগ লক্ষণ হল রোগীকে অনেকবার রাত্রে প্রস্রাব ত্যাগ করতে উঠতে হয়, রাত্রেই প্রস্রাব অধিক হয়, জল পিপাসা খুব বেশী, রোগী ক্রমশঃই জীর্ণ শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এর আর একটি লক্ষণ হল নিদ্রিত অবস্থায় এবং প্রস্রাবের

কিংবা বাহ্যের জন্য বেগ দেওয়ার পর অসাড়ে শুক্র ক্ষরণ। ডাঃ কাউপারথোয়েট বলেন শর্করা যুক্ত বহুমূত্রের এটি একটি অমোঘ ওষুধ। প্রস্রাব দুধের মত দেখায় তৎসহ এলবুমেন বর্তমান থাকে।

২। Uranium Nitricum ঃ

এই ওষুধটিও ডায়েবেটিস রোগের একটি নির্ভরযোগ্য ওষুধ। ডাক্তার ব্লেক এই ওষুধটা সর্বপ্রথম পরীক্ষা করেন। ডায়েবেটিস মেলিটাস অর্থাৎ শর্করা যুক্ত বহুমূত্র রোগের এটি একটি প্রথম শ্রেণীর ওষুধ। এই ওষুধটি প্রয়োগের লক্ষণ হল প্রস্রাবে অধিক পরিমানে সুগার নির্গমন, দিন অপেক্ষা রাত্রে অনেক বার প্রচুর পরিমানে প্রস্রাব, প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি হওয়া, অতিরিক্ত ক্ষুধা, অদম্য পিপাসা, অতিরিক্ত আহার সত্বেও দিন দিন শরীর ক্ষীণ ও কৃশ হয়। শরীরের তাপ কমে যাওয়া, পেটে বায়ু জমা, পেট ফাঁপা, শরীরে ও জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত হওয়া ইত্যাদি ডায়েবেটিস রোগের যাবতীয় লক্ষণই এই ওষুধটিতে দেখতে পাওয়া যায়। ডাক্তার হিউজেস বলেন ডিসপেপসিয়া যে বহুমূত্র পীড়ার মূল কারণ তাতে এই ওষুধটি দ্বারা উপকার হবেই হবে। একদিন সকালে খালি পেটে এই ওষুধটি ৩০ শক্তির ১ মাত্রা সেবন করতে দিয়ে সাত আট দিন অপেক্ষা করলে এর উপকার বুঝতে পাওয়া যাবে। উপকার না হলে সাত-আট দিন পর আর ১ মাত্রা পুনঃ প্রয়োগ প্রয়োজন। পাকস্থলী ও ডিওডিনামে ক্ষত, পাকস্থলীতে জ্বালা, গায়ে জ্বালা, অত্যন্ত পিপাসা, পেটে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ গুলো এই ওষুধের সিদ্ধি প্রদ লক্ষণ। কোন ডায়েবেটিস রোগীর এই লক্ষণ গুলো উপস্থিত থাকলে এই ওষুধটি মন্ত্রবৎ কাজ করবে।

৩। Kreasote ঃ

এই ওষুধটি ডায়েবেটিস রোগের একটি মহা উপকারী ওষুধ। কৃশ, শীর্ণ, লম্বা দেহ, এবং দীর্ঘাঙ্গী স্ত্রী এই ওষুধটির প্রধান ক্রিয়া ক্ষেত্র। ডাঃ হেল বলেন এই এষুধটির দ্বারা তিনি অনেক ডায়েবেটিস রোগী চিরকালের নিমিত্ত আরোগ্য করেছেন। ডাঃ আর্নড বলেন তিনি ১ম শক্তির ১০ ফোঁটা ওষুধ জলের সঙ্গে দিনে ৪ বার সেবন করিয়ে একটি রোগীর প্রস্রাবের সুগারের পরিমান কমিয়ে আনতে সমর্থ হন। ডায়েবেটিস রোগে এই ওষুধটি প্রয়োগ লক্ষণ হল রাত্রে ঘন ঘন প্রস্রাব হয়। এবং প্রতিবার অনেকটা পরিমানে প্রস্রাব হয়। খুব শীঘ্র শীঘ্র প্রস্রাব হয়ে পড়ে, হঠাৎ এত বেগে প্রস্রাব পায় যে উঠতে বিলম্ব সয় না। রোগী বিছানায় প্রস্রাব করে, মনে করে সে ঠিক জায়গাতেই প্রস্রাব করছে। কিন্তু ঘুম ভেঙে দেখে সবই স্বপ্ন। প্রথম একদিন সকালে খালি পেটে ২০০ শক্তির ওষুধ ঠাণ্ডা জল সহ সেবন করলে ১৫ দিন অপেক্ষা করতে হবে।

৪। Syzygium Jambo ঃ

ডায়েবেটিস রোগে এই ওষুধটি একটি Specific ওষুধ বললেও হয়। এটি আমাদের ভারতীয় কালজাম থেকে তৈরী হয়েছে। শর্করাযুক্ত ডায়েবেটিসের পক্ষে এটি অধিক

উপযোগি। সকলমতের চিকিৎসকগনই একমত যে প্রস্রাবে শর্করা নির্গমন হ্রাস বা বন্ধ করতে এই ওষুধের সমকক্ষ ওষুধ আর দ্বিতীয়টি নেই। ডায়েবেটিস রোগে এই ওষুধটি প্রয়োগ লক্ষণ হল প্রস্রাবে অধিক পরিমান সুগার নির্গমন, প্রচণ্ড জলপিপাসা ক্রমশঃ দুর্বলতা ও শীর্ণতা, অধিক পরিমানে বার বার প্রস্রাব ত্যাগ, প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি, শরীরে ক্ষত ইত্যাদি উপসর্গ। এই ওষুধটি সাধারনতঃ নিম্নক্রমেই অধিক ক্রিয়া করে। (মূল অরিষ্ট) বা ১× শক্তি অধিক ফলপ্রদ। ৫ ফোঁটা করে দিনে চারবার প্রযোজ্য।

৫। Cephalandra Indica ঃ এই ওষুধটিও আমাদের ভারতীয় ভেষজ থেকে উৎপন্ন। এর বাংলা নাম তেলাকুচা। একটি লতানো গাছ। এই তেলাকুচা পাতা থেকে ওষুধটি তৈরী হয়েছে। সর্বপ্রকার ডায়েবেটিস রোগেই এই ওষুধটি বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যাদের অল্পেতেই বায়ু বা পিত্তবৃদ্ধি হয়ে মাথা গরম হয় মাথা ধরে, রাত্রে ভালো ঘুম হয় না চোখ হাতে পায়ে জ্বালা তাদের পক্ষে এই ওষুধটি আর অধিক উপযোগি।

প্রথমে, ১× শক্তির ওষুধ ৫ ফোঁটা মাত্রায় দিনে চার বার কিছুদিন ব্যবহার করার পর ক্রমশঃ মাত্রা কমাতে হয় এবং শক্তি বৃদ্ধি করতে হয়। যেমন দিনে চারবার থেকে তিনবার দুইবার, একবার একদিন অন্তর এরূপ মাত্রা কমাতে হবে। আর ১×, ২×, ৩×, ৬×, ৩০, ২০০ ইত্যাদি ক্রমে শক্তি বৃদ্ধি করন করা প্রয়োজন।

(সাধারনতঃ এই পাঁচটি ওষুধেই সময়মত ব্যবস্থা করতে পারলে এই রোগ আরোগ্য করা যায়। তাছাড়া, Blood Pressure চিকিৎসায় যে সকল ওষুধ ব্যবস্থা করা হয়েছে সে সকল লক্ষন মিললে ডায়েবেটিসেরও ওষুধ। পুস্তকের শেষভাগে অবস্থিত রোপাটারী অংশ থেকে মানসিক লক্ষনাবলী সংগ্রহ করে আনুসঙ্গিক লক্ষনাবলী সহ একটি পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করে তা প্রয়োগ করলে রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যের ব্যাপারে নিশ্চিৎ হওয়া যাবে। এখানে কয়েকটি ওযুধের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ উল্লেখ করা হচ্ছে। এই লক্ষণটি মিললে পরবর্তী লক্ষণাবলী পূর্ববর্নিত উপায়ে সংগ্রহ করতে হবে।

ডায়েবেটিসের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ

১। Helonias dioica 200 ঃ এই ওষুধটি ডায়েবেটিস ইনসিপিডাস (অর্থাৎ শর্করা বিহীন বহুমূত্র) এর একটি সুন্দর ওষুধ। এতে অধিক পরিমানে ঘন ঘন প্রস্রাব তার সঙ্গে ইউরিয়া (Urea)নির্গমন লক্ষণ বর্তমান থাকে। আবার ডায়েবেটিস মেলিটাস (অর্থাৎ শর্করা যুক্ত বহুমূত্রের) ও এটি ভালো ওষুধ। প্রস্রাবে সুগার নির্গমন তৎসহ প্রবল পিপাসা, শীর্ণতা, অস্থিরতা, ডান কিডনীতে নিরন্তর বেদনা। এই লক্ষণ গুলি এর প্রয়োগ লক্ষণ।

২। Jaborandi Q

ডায়েবেটিস ইনসিপিডাস রোগে তলপেটে ও মূত্রনালীতে বেদনা, ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ ও প্রস্রাব, প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Spicific Gravity) কমে যাওয়া ইত্যাদি এর প্রয়োগ লক্ষণ। প্রথমে মুল অরিষ্ট দিনে চারবার ৫ ফোটাকরে এবং পরে 3x, 6x ও 30 মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়।

৩। Lac Defloratum 200

ডায়েবেটিস মেলিটাসে এই ওষুধটি বিশেষ কার্যকরী, পোযনাভাবে দুর্বলতা, শিরঃপীড়া ও তৎসৎ অত্যাধিক প্রস্রাব, ভীষণ কোষ্ঠবদ্ধতা এবং দুগ্ধে অরুচী এই লক্ষণগুলি থাকলে এটি অব্যর্থ।

৪। Kali Bromatum 200,

এই ওষুধটিও ডায়েবেটিসের একটি উৎকৃষ্ট ওষুধ। ডায়েবেটিস, অত্যন্ত পিপাসা সহ বহু পরিমানে প্রস্রাব, প্রস্রাবের সঙ্গে সুগার বা ফসফেট নির্গমন, প্রস্রাবের বেগ ধারনে অক্ষম রোগী ক্রমশঃ দুর্বল ও রক্তহীন হয়ে পড়ে ইত্যাদি লক্ষণগুলো বর্তমান থাকা চাই।

৫। Acetic Acid 200

প্রস্রাবে অত্যাধিক শর্করা, তৎসহ অত্যাধিক পিপাসা, শীতল জল পান করলে পাকস্থলীতে ভারবোধ, রোগীর মুখের চেহারা ফ্যাকাশে, শুষ্ক, মাংসহীন, চোখের ভাব অস্বাভাবিক, ভয়ানক গাত্রদাহ, সেই সঙ্গে গায়ের চামড়া খসখসে। প্রচুর জলপানের পর রোগী জলের ন্যায় অনেকবার প্রস্রাব করে। যখন ডায়েবেটিস রোগে প্রচুর সাদা জলের ন্যায় প্রস্রাব, অসহনীয় পিপাসা ও গাত্রের শুষ্কতা পাওয়া যায় তখন এই ওষুধ বিশেষ কার্যকরী হয়।

৭। Acid Carbolic 200

এই ওষুধটিও ডায়েবেটিস রোগের একটি বিখ্যাত ওষুধ। এর প্রস্রাব কাল রঙের। ডায়েবেটিস রোগীতে কালরঙের প্রস্রাব দেখতে পেলে এই ওষুধটিকে একবার স্মরণ করা উচিৎ। প্রস্রাব প্রচুর পরিমানে হয়। পেট ফোলা এবং অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বহুমূত্রে ও এলবুমেনুরিয়ারোগে বেশ সুন্দর কাজ করে। এতে যেমন কাল প্রস্রাব আছে, তেমনি আবার বর্ণহীন প্রস্রাব লক্ষণও পাওয়া যায়। রোগীর জল পিপাসা খুব বেশী, তৎসহ অত্যন্ত ক্ষুধা, আলস্যভাব, দুর্বলতা ও শুষ্ক কাশিও বর্তমান থাকে।

৮। Acid Lactic 200

ডায়েবেটিস রোগে ঘোল একটি বিশেষ ফলপ্রদ পথ্য। এই ওষুধটি দুধের ঘোল থেকে তৈরী হয়েছে। ডায়েবেটিস রোগ এই ওষুধটি দ্বারা সম্পূর্ণরুপে আরোগ্য না হলেও এটি এই রোগের একটি উপশমকারী ওষুধ। যে সকল ডায়েবেটিস রোগীর অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, কিছুতেই মল নিঃসরণ হয় না, তাদের পক্ষে এই ওষুধটি বিশেষ ফলপ্রদ। অত্যাধিক জলপিপাসা, জলপানের পর মুহুর্মুহু প্রচুর প্রস্রাব, জিভ আঠা আঠা, তৎসহ পরিপাক যন্ত্রের বিকৃত ভাব, দুর্বলতা ও বাতের বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ গুলো এই ওষুধের বিশেষ সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ।

৯। Acid picric 20

এই ওষুধে মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কের অবসাদ অত্যাধিক— বিশেষতঃ অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনার জন্য অবসাদ ও দৌর্বল্য নিবারনার্থে এই ওষুধ প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গন্য হয়। পুরুষ জননেন্দ্রিয়ের উপর এই ওষুধটির ক্রিয়া খুব প্রবল, রোগীর প্রস্রাবে শর্করা ও এলবুমেন বর্তমান থাকে। মূত্রে লাল সাদা ও ফেনিল, কখন কখন সূত্রবৎ পদার্থ বিদ্যমান থাকে। অত্যন্ত পিপাসা, রোগী অনবরত ঠাণ্ডা জল পান করতে চায়।

১০। Amyl Nitrate 30 ঃ

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই ওষুধটি সুস্থ শরীরে বেশী পরিমানে ব্যবহার করলে প্রস্রাবে শর্করা পাওয়া যায়। সুতরাং বহুমূত্র রোগে এর দ্বারা উপকার হওয়ার কথা। এই ওষুধটির প্রধান লক্ষণ—মাথাভার, পুরাতন মাথাধরা, মাথাব্যাথা, হৃৎপিণ্ডের দ্রুতগতি ও ভয়ানক জ্বালা কোমর থেকে আরম্ভ করে সমস্ত পিঠে ও ক্রমশঃ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, এমন কি শীতকালেও রোগী গায়ে কাপড় রাখতে পারে না, সব ফেলে দেয়।

১১। Berberis Vulgaris 30 ঃ

যদি মূত্রস্থলিতে বেদনা সহ প্রতিমুহূর্তে প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা এবং অতি ধীরে প্রস্রাব নির্গমন লক্ষণ বর্তমান থাকে তবে ডায়েবেটিস রোগে এই ওষুধটি বেশ কাজ করে। এর মূত্রস্থলী ও কটিদেশের বেদনা, বিশ্রামে হ্রাস হয়। রোগীর মুখ আঠা আঠা ও শুষ্ক, পিপাসা ও ক্ষুদা অত্যাধিক। নাড়ী মৃদু ও দুর্বল, সর্বশরীরে জ্বালা বোধ।

১২। Plumbum Met 200, 1000 ঃ

ডায়েবেটিস রোগে হেরিং এবং গুড়নো এই ওষুধটির প্রশংসা করেন। সীসা দ্বারা বিষাক্ত হয়ে বহুমূত্র হলে এই ওষুধটি বিশেষ উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে। জল পিপাসা, অত্যধিক মানসিক উদ্বেগ স্ফুর্তির অভাব, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, জিভ শুষ্ক ও ফাটা ফাটা কামেচ্ছার অভাব ও মৃদু জ্বর ইত্যাদি লক্ষণ বর্তমান থাকলে এই ওষুধটি কার্যকরী।

১৩। Bovista 200 ঃ

রোগীর সর্বদাই প্রস্রাব করতে ইচ্ছা প্রস্রাব করার পর মুহূর্তেই আবার প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা কিন্তু প্রস্রাব হয় ২/৪ ফোটা। প্রস্রাবের বর্ণ উজ্বল লাল, তৎসহ হৃৎস্পন্দন ও দুর্বলতা।

১৪। Lycopus Verginea Q, 1x ঃ

এই ওষুধটি ডায়েবেটিস রোগী যখন অতিরিক্ত প্রস্রাবের জন্য অতি শীঘ্র ক্ষীণ ও শীর্ণ হয়ে পড়ে তখন খুব কাজে আসে। এর প্রধান লক্ষণই হল অতিরিক্ত প্রস্রাব নিঃসরনের নিমিত্ত শীঘ্র ক্ষীন ও শীর্ণ হওয়া এবং প্রস্রাবে অত্যাধিক শর্করা নির্গমন, রোগীর জল পিপাসা খুব প্রবল থাকে প্রস্রাবও বেশী।

১৫। Nuxvomica 1M

অত্যাধিক অধ্যয়শীল, বিষণ্ন, অম্ল ও অজীর্ণ রোগ গ্রস্ত ব্যক্তির Diabetes হলে উচ্চ শক্তির একমাত্রা এই ওষুধ প্রয়োগে আরোগ্য হয়ে থাকে।

১৬। Magnesia Sulph 30 ঃ

প্রচুর, পাতলা, হরিদ্রাবর্ণের প্রস্রাব, অথচ কোন পাত্রে ধরে রাখলে পাত্রের নীচে লালবর্ণের ঘোলা তলানী পড়ে। রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হয়ে পড়ে, কোন কার্যে মন নাই— অবসাদ গ্রস্ত। কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক, তিক্ত ও ঈষৎ মিষ্ট স্বাদ যুক্ত।

১৭। Murex 3x ঃ

রাত্রে বিছানায় শুয়ে থাকে, বেশ ঘুমায় হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ আসে, বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে, প্রস্রাব পরিমানে অধিক হয়। প্রস্রাবে দুর্গন্ধ থাকে। রাত্রে অনেকবার প্রস্রাব হয় রাত্রে যখন হঠাৎ প্রস্রাব পায়, তখন বিছানা থেকে উঠে প্রস্রাব করতে যাওয়ার অবসরটুকু সহ্য হয় না।

১৮। Phosphorus 200 ঃ

Diabetes রোগীর তৈলাক্ত বাহ্যে ও যক্ষ্মা। প্রস্রাব ফ্যাকাসে ও জলের ন্যায় প্রচুর পরিমানে হয়। কখন সাদা ঘোলের ন্যায় ঘন, আবার কখন বা লাল ইটের গুড়ার মত তলানীযুক্ত প্রস্রাব, তৎসহ গাত্র দাহ, পিপাসা ও ছটফটানি।

১৯। Rhus aromatics 30 ঃ

এই ওষুধের প্রধান লক্ষণ হল পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমান প্রস্রাব, কিন্তু প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) স্বাভাবিক অপেক্ষা কম। ডায়েবেটিস রোগীর বলক্ষয়, শরীর ক্ষয়, কোমরে ব্যথা, অতিশয় পিপাসা, মাঝে মাঝে উদরাময় ও আমাশয়, প্রস্রাবের বেগ ধারনে অক্ষমতা অসাড়ে প্রস্রাব নির্গমন ইত্যাদি লক্ষণে এর মূল অরিষ্ট ৩ ফোঁটা মাত্রায় দিনে তিনবার দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। রোগের প্রাবল্য কমে এলে ৩০ শক্তি একমাত্রা দিয়ে অপেক্ষা করতে হয়।

২০। Senna 3x ঃ

ডায়েবেটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে যখন রোগী দিন দিন কৃশ ও শীর্ণ হয়ে পড়ে, এমনকি খুব হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিও যদি ঐরূপ কৃশ হয়ে ভয়ানক দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ে তখন এই ওষুধ বিশেষ কার্যকরী হয়।

দশম অধ্যায়

ডায়েবেটিস রোগের আনুসঙ্গিক উপসর্গের চিকিৎসা
Treatment of some Diabetic complications.

দুষ্টব্রন (Carbuncle) ঃ

১। Anthraxinum 200 ঃ

এই ওষুধটি দুষ্টব্রণ বা কার্বাঙ্কলের একটি অমূল্য ওষুধ। কার্বঙ্কলের ওপর ভয়ানক জ্বালা, এত জ্বালা যে অনবরত ঐ স্থানে জল বা বরফ লাগাতে চায় এবং ছট্‌ফট্‌ করে, কার্ব্বাঙ্কলে বহু ছোট ছোট ছিদ্র হয়ে ঘন পূজের পরিবর্তে জলের ন্যায় পদার্থ বার হয় তৎসহ জ্বর ও গাত্র দাহ।

২। Arsenic alb 200 ঃ

দুষ্টব্রনের এই ওষুধটিও একটি প্রথম শ্রেণীর ওষুধ এর লক্ষণ হল ভয়ানক জ্বালা। গরম সেক দিলে উপশম। গায়ের জ্বালা থাকা সত্বেও রোগী গায়ের আবরণ কিছুতেই খুলতে চায় না, গায়ের আবরণ খুললেই শীত শীত বোধ হয় অথচ রোগীর ভয়ানক গাত্রদাহ ও পিপাসা থাকে। তৎসহ অত্যন্ত ছটফটানি, অন্তর্যাতনা, মৃত্যুভয় অত্যধিক দুর্বলতা, স্থানত্যাগের ইচ্ছা ও রাত্রি দুই প্রহরের পর রোগের বৃদ্ধি।

আর্সেনিক কার্ব্বাঙ্কল রোগের একটি মূল্যবান ওষুধ। এই ওষুধটি দ্বারা বহুমৃতকল্পরোগী মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এসেছে। ডায়েবেটিস রোগীর বা এলবুমেন ও হাইলিন কাষ্ট যুক্ত বহুমূত্র রোগীর পক্ষেও এটা প্রয়োজনীয় ওষুধ। এই লক্ষণ গুলো বিদ্যমান থাকলে ডায়েবেটিস রোগ সহ আনুসঙ্গিক লক্ষণ সমূহেরও আরোগ্য লাভ ঘটে।

৩। Apis Mel 200 ঃ

কার্বাঙ্কল হয়ে যখন ইরিসিপেলাস বৃদ্ধিপেতে থাকে এবং আক্রান্ত স্থানে জ্বালা, তা ঠাণ্ডায় উপশম, জল পিপাসার অভাব, আবদ্ধঘরে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি, প্রস্রাবের অভাব বা স্বল্প মূত্র ইত্যাদি লক্ষণ পাওয়া যায় তখন এই ওষুধটি খুব সুন্দর কাজ করে।

৪) Calcaria Hypophos 3x ঃ দুষ্ট জাতীয় ব্রন হয়ে যখন ডায়েবেটিস রোগীর অস্থির আবরন অর্থাৎ পেরিয়েষ্টাম বিনষ্ট হয় এবং ক্ষতযুক্ত অস্থি উচু হয়ে আছে এরূপ মনে হয় তখন এই ওষুধটি মন্ত্রের ন্যায় কাজ করে। ডাঃ ন্যাস বলেন যে খুব প্রকাণ্ড প্রাদাহিক স্ফীতির মধ্যে যদি পুঁজ জমে তবে তাও এই ওষুধে আরোগ্য করতে পারে।

৫) Carbo Veg 200 ঃ কার্বাঙ্কল থেকে যখন দুর্গন্ধ যুক্ত পুঁজ ও রস নির্গত হতে থাকে এবং আক্রান্ত স্থানে ভয়ানক জ্বালা অনুভূত হয় ও সে জ্বালা ঠাণ্ডা বাতাসে উপশম

হয়, তখন কার্বোভেজ যাদুমন্ত্রের মত কাজ করে। এই লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকলে গ্যাংগ্রিন যুক্ত কার্বাঙ্কলেও এই ওষুধ প্রয়োগে উপশম হয়। কার্বোভেজ আর্সেনিক এবং এনথ্রাসিনাম এই তিনটি ওষুধেই জ্বালা আছে। কিন্তু প্রয়োগ করার সময় এদের পার্থক্য বিচার করে প্রয়োগ করতে হবে। আর্সেনিকের জ্বালা গরমে উপশম হয়, তার সঙ্গে অস্থিরতা ও ছটফটানি থাকে। কার্বোভেজের জ্বালা ঠাণ্ডা হাওয়ায় উপশম হয়, অস্থিরতা ও ছট্‌ফটানি আর্সেনিকের মত হয়। আর্সেনিকের রোগ লক্ষণ দিন ১টার পর এবং রাত্রি ১২টার পর বৃদ্ধি হয়ে থাকে। আর্সেনিক প্রয়োগে যদি জ্বালা যন্ত্রনার উপশম না হয়, তবে এনথ্রাক্সিনাম প্রয়োগ করতে হয়।

৬) Lachesis 200 ঃ এই ওষুধটিও রোগের খুব জটিল অবস্থায় বেশ সুন্দর কাজ করে। এর প্রয়োগ লক্ষণ হল পীড়িত স্থান কৃষ্ণাভ লালবর্ণের বা বেগুনে রঙের মত দেখায়। পীড়ার গতি ধীর, সহজে পুঁজ হয় না, যদি বা পুঁজ হয় তা অল্প এবং রক্তে মিশ্রিত। এতেও আর্সেনিকের মত ভয়ানক জ্বালা আছে। এর সমস্ত লক্ষণ নিদ্রার পর বা নিদ্রার উপক্রমেই বৃদ্ধি হয়। কার্বাঙ্কল যখন গ্যাংগ্রিনে পরিনত হবার উপক্রম করে বা কার্বাংকলের ঘা গ্যাংগ্রিনে পরিনত হয় তখন ল্যাকেসিসই একমাত্র ওষুধ।

৭) Tarantula 200 ঃ যদি কার্বাঙ্কল হয়ে হঠাৎ ভয়ানক কম্প ও জ্বর, সেই সঙ্গে ছটফটানি, গাত্রদাহ, অত্যাধিক পিপাসা, আক্রান্ত স্থলে জ্বালা এবং অন্তর্দাহ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয় তবে আমরা সচরাচর একোনাইট ব্যবস্থা করে থাকি কিন্তু এই স্থলে একোনাইট ব্যবস্থা না করে ট্যারেন্টুলা প্রয়োগ করা কর্তব্য, কারন ফোড়া বা কার্বাঙ্কল উঠে গেলে আর একোনাইট দেওয়া উচিৎ নয়। ডাঃ এলেন বলেন প্রদাহ বা ফোড়াদি বার হবার পূর্বে যদি অত্যাধিক ব্যাথা ও একোনাইটের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তখন একোনাইট না দিয়ে এই ওষুধ প্রয়োগ করা বিধেয়। ভয়ানক জ্বালা এত জ্বালা যে রোগী কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, তার সঙ্গে গায়ের তাপ ১০৪-৫ ডিগ্রী, গাত্রত্বক খসখসে, ইত্যাদি লক্ষণ পেলে এই ওষুধ প্রয়োগে, কার্বাঙ্কল, দুষ্টব্রণ আঙুলহারা ইত্যাদি ডায়েবেটিস রোগীর ক্লেশ সাধ্য চর্মপীড়া অতি শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হয়।

বিসর্প (Erysipleosus)

1) Aconite Nap 30 ঃ এই ওষুধটি রোগের প্রথম অবস্থায় যখন অত্যন্ত জ্বর, অস্থিরতা, পিপাসা, মৃত্যুভয় ও ঘর্ম্মের অভাব ইত্যাদি লক্ষণ গুলো প্রকাশ পায় তখন বেশ ভালো কাজ করে। সংঘাতিক বিসর্পের প্রথম অবস্থায় একোনাইট ঘন ঘন প্রয়োগ করলে রোগের তীব্রতা কমে অনেকটা শান্ত ভাবাপন্ন হয় এবং রোগী শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হয়ে থাকে।

2) Anacardium Ox 200 : বিসর্প হয়ে প্রথমে ফোস্কার মত টোপা টোপা উদ্ভেদ বার হয়ে পরে লেপা হয়ে যায়। এরকম ফোস্কা প্রায়ই মুখে বেরোয়। আবার অনেক সময় এই সকল ফোস্কা মুখ থেকে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই ওষুধে বিসর্প ডানদিক থেকে বাম দিকে চালিত হয় বেশী।

3) Apis Mel 200 : যদি বিসর্প রোগ মুখে হয় তবে এপিস মেলই শ্রেষ্ঠ ওষুধ। ডানচোখের নীচে প্রথম আক্রান্ত হয়ে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, তারপর ক্রমশঃ বামদিকে পরিচালিত হয়। আক্রান্ত স্থান ইষৎ বেগুনে-গোলাপী বর্ণের হয়ে থাকে। আক্রান্ত স্থানে প্রথম টাটানি, তারপর হুল ফোটানো ব্যাথা ও পরক্ষনেই জ্বালা অনুভব হয় এবং মুখখানা বেগুনে লালবর্ণে পরিনত হয়। আক্রান্ত স্থান টিপলে টোপ খেয়ে যাওয়া এই ওষুধের বিশিষ্ট লক্ষণ। চোখের পাতা ফুলে ওঠে, তারসঙ্গে প্রবল জ্বর, পায়ের চামড়া শুষ্ক, পিপাসার অভাব। মস্তিষ্কের আবরণ আক্রান্ত হলে রোগী ভয়ানক চিৎকার করে।

4) Euphorbinum 30 : এই ওষুধটি বিসর্পের এরটি নির্ভর যোগ্য ওষুধ। বিসর্প হয়ে ডানদিকের গণ্ড ঘোর লাল ও সেই স্থানে বহু ছোট ছোট ফোস্কা বার হয় এবং ঐ ফোস্কার মধ্য থেকে হলুদ বর্ণের রস নির্গত হতে থাকে। গ্যাংগ্রিন হবার উপক্রম হলে এই ওষুধটি বেশ ভালো খাটে। বিষপানের পর মানুষ যেরূপ ব্যাকুল হয়, রোগীর চোখের ভাব ঘোলা ঘোলা হয়ে তার সেরূপ আসন্ন অবস্থা উপস্থিত হচ্ছে বলে সে মনে করে, তৎসহ আক্রান্ত স্থানে চেছে ফেলার মত বা কেটে ফেলার মত বেদনা, বেদনা দাঁতের মাঢ়ী থেকে আরম্ভ হয়ে কানের মধ্য পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে, বেদনাস্থল চুলকায় ও সুড়সুড় করে ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত থাকলে ইউফর্বিয়ামই একমাত্র ওষুধ।

5) Cantheris 200 : এই ওষুধটিও ইরিসিপেলাসের একটি ভালো ওষুধ। এতে নাকের ওপর থেকে আরম্ভ করে উভয়গালে ছড়িয়ে পড়ে এবং ফোস্কা ফোস্কা হয়ে গলে গিয়ে রস পড়তে থাকে ও জ্বালা অনুভব করে। রোগীর পিপাসা খুব কিন্তু কোন প্রকার পানীয়ই তার মনঃপূত হয় না।

6) Comocladia Denteta 30 : এই ওষুধটির লক্ষণ হল আক্রান্ত স্থান ঘোর লালবর্ণ তথায় জ্বালা ও চুলকানি। জ্বালা ও বেদনা নড়াচড়ায় উপশম, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি। মুখমণ্ডল ও চোখে এরূপ জ্বালা যেন রোগী মনে করে যে তার ডানদিকের চোখ ঠিকরে বেড়িয়ে আসছে। মুখমণ্ডলের ভয়ংকর স্ফীতি, কষ্টদায়ক চুলকানি ও জ্বালা।

একাদশ অধ্যায়

ডায়েবেটিস রোগীর আনুসঙ্গিক চিকিৎসা ও পথ্য

বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং চিকিৎসাজ্ঞান অনুসারে বিশেষ বিবেচনা করলে এটা নিসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ডায়েবেটিস হল জীবনব্যাপী রোগ এবং এই রোগ একবার আক্রমন করলে আমৃত্যু তার চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। যদিও এটা সত্য নয় তথাপি যেহেতু বর্তমান প্রজন্মের ৯০ শতাংশ মানুষ এই মতের পক্ষপাতী তাই তাদের উপকারার্থে এই রোগের আনুসঙ্গিক চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যাপারে বিশেষ ভাবে উপদেশ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়, যার দ্বারা তারা উপকৃত হতে পারে। চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞান ও যথাযথ পথ্য বিধি পালনের দ্বারাই এই রোগকে নিয়ন্ত্রনে রাখা এবং যাদের এই রোগ হয়নি তাদের এই রোগে যে কষ্ট পেতে না হয় তার জন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু একটা কথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে এই রোগটি Constitutional disease হওয়ায় অর্থাৎ সাংবিধানিক বিকৃতি প্রসূত হওয়ায় রোগীর সংবিধানের সাম্যতা ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত তার রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করা সম্ভব নয়। আর রোগীর বিকৃত সাংবিধানিক সংগঠনকে সাম্যতা সম্পাদন হোমিওপ্যাথি ভিন্ন অন্য কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্বারা অসম্ভব। তাই এই যুগের অধিকাংশ মানুষ এই রোগটিকে আজীবন ব্যাপী রোগ (Life-time-disease) আখ্যায় ভূষিত করেছেন। তাই তারা সারাজীনই এর চিকিৎসা চালিয়ে যান। কিন্তু এতে উপকারের থেকে অপকারই হয়ে থাকে অধিক। ওষুধের পার্শ্বক্রিয়াতেই তারা অধিক উপসর্গের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এই সব রোগীগন যদি কোন প্রকার ওষুধ না খেয়ে এই অধ্যায়ে বর্ণিত আনুসঙ্গিক চিকিৎসা ও পথ্যবিধি মেনে চলেন তবে এটা নিশ্চিৎ যে ওষুধ খাওয়ার থেকে অন্তত ৮০ শতাংশ অধিক সুস্থ ও রোগমুক্ত থাকবেন।

বহুসংখ্যক ডায়েবেটিস রোগীকে দেখা যায় যে তারা দীর্ঘ্যকাল যাবৎ রোগের চিকিৎসা করাতে করাতে যখন দেখে যে রোগ কিছুতেই সারছে না তখন চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর বীতস্পৃহ হয়ে সবরকমের চিকিৎসা বন্ধ করে দিয়ে ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পন করে বসে থাকেন। এরূপ অবস্থায় রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে হতে এমন পর্য্যায়ে পৌছায় যার অবশ্যম্ভাবী পরিনতী হল অকালে মৃত্যু। তারা খাদ্যবিধি, পথ্যনীতি বা চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল প্রকার অনুশাসনই অমান্য করে চলেন এবং মনে মনে ভাবেন যে আর কয়েকদিন বাদে যখন মরতেই হবে তখন একটু আরাম করে মরাই ভালো। কিন্তু মৃত্যু তো আর শিশুর হাতের মোয়া নয় যে তাকে যখন খুশী চাইলেই পাওয়া যাবে। তাই এই সমস্ত লোকগুলো যখন পরবর্তীকালে রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থায় মৃত্যুর মুখোমুখী হয় তখন রোগের জটিল উপসর্গগুলি তাদের জীবনকে এত দুর্বিসহ ও ভয়ঙ্কর করে তোলে যে যন্ত্রনা চিৎকার ও

ক্রন্দনের ঠেলায় সে নিজেও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে আর পারিপার্শ্বিক সকলকেও অতিষ্ঠ করে তোলে। অথচ সামান্য কিছু বিধি নিষেধ এবং যথাযথ আরোগ্য সংক্রান্ত কিছু নিয়মানুষ্ঠান ও পথ্যবিধি মেনে চললে জীবিতাবস্থায় সুস্থ জীবনযাপন পূর্বক জীবনান্তে সহজ সরল ভাবে আনন্দের সঙ্গে মৃত্যু দেবীকে বরন করে নেওয়া সম্ভব হত।

পথ্য (Diet)

ডায়েবেটিস রোগীর চিকিৎসাতে পথ্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। যথাযথ পথ্য নির্বাচনই ডায়েবেটিস রোগের মূল চিকিৎসা। প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী Sun Semiao বলেন যথার্থ চিকিৎসক সর্বাগ্রে উপযুক্ত পথ্য নির্বাচনের মাধ্যমে রোগীর চিকিৎসা করবেন। তাতে রোগ নিরাময় না হলে ওষুধ ব্যবস্থা করবেন। এই আদর্শ অন্ততঃ ডায়েবেটিসের ক্ষেত্রে সকল চিকিৎসকেরই অবশ্যপালন যোগ্য।

ডায়েবেটিস রোগের সফলকাম চিকিৎসা প্রণালীর মধ্যে "উপযুক্ত পথ্য নির্বাচন" ও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রনালী। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এত উন্নতী হওয়া সত্বেও আদর্শ পথ্যনীতি রোগ আরোগ্যের ক্ষেত্রে এখনও তার আপন শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে। যদি দোষযুক্ত পথ্য গ্রহনের বদভ্যাস পরিত্যাগ না করা হয় তবে ওষুধও যথাযথ ভাবে আরোগ্যক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে না। অধিকন্তু মেদবহুল স্থূল বহুমূত্র রোগীগনের পক্ষে পথ্যের পরিবর্তন ও পরিবর্জনই একমাত্র চিকিৎসা।

খাদ্য নিয়ন্ত্রন এই রোগের সর্বপ্রধান চিকিৎসা। ডাঃ ডানকিন ডায়েবেটিস রোগীকে সরতোলা দুধ প্রত্যহ ৬ থেকে ৮ পাইট সেবন করতে পরামর্শ দিতেন। যে সকল খাদ্যে শর্করা বেশী বা যে খাদ্য সেবনের পর পাকযন্ত্রে শর্করায় পরিবর্তিত হয় এরূপ খাদ্য গ্রহন করা উচিৎ নয়। এই রোগীর পক্ষে সবুজ রঙের শাক সব্জী, মোচা, অম্লযুক্ত ফল, দুধ, ঘোল নারকেল ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমানে গ্রহন করা উচিৎ। বহুমূত্র রোগীকে মাছ, মাংস ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে কারন এতে শর্করা থাকে না, কিন্তু একটা কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে নিরামিষ আহারই সবচেয়ে ভালো। অনেকে এই রোগীকে র-মিটযুষ খেতে দেন, তাদের মতে এটা এই রোগীর পক্ষে একটি উপাদেয় টনিক। কাচা আম এই রোগে উপকারী। পাকা আমও এই রোগে হিতকর। প্রচুর দুধ ও আম যদি রোগীকে খাওয়ানো যায় তবে খুব উপকার হয়ে থাকে। ডায়েবেটিস রোগীকে শুধু আহার নির্বাচনই নয় তাকে আহারের পরিমান, গুনগতমান, নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধান হতে হবে এবং আহার গ্রহনের সময় সম্পর্কেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এরূপ আহার নিয়ন্ত্রন করলে শুধুমাত্র আহারের বন্দোবস্ত দ্বারাই প্রস্রাবের পরিমান, সুগারের পরিমান, পিপাসা ইত্যাদি কম হয়ে রোগী ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করবে।

ভাত, আলু, আটা ময়দা, সাবু, বার্লী ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেটস জাতীয় খাদ্য, চিনি বা

চিনি সংযুক্ত মিষ্ট দ্রব্য, ইত্যাদি থেকে লিভার সুগার প্রস্তুত করে থাকে। সেই জন্য এই খাদ্য সমুহ এবং যে সকল ফলমূল ও শাকশব্জীতে সুগারের অংশ অধিক পরিমানে আছে সেই ফলাদি আহার একেবারে পরিত্যাগ করতে হবে। সরবৎ, আইসক্রীম, বা যে সকল পানীয় পদার্থে চিনি মিশ্রিত রয়েছে তাও পান করা বন্ধ করে দিতে হবে। এই রোগীর পক্ষে মাটাতোলা ঘোল, দই, পনির, ছানা ইত্যাদি সুপথ্য। প্রচুর পরিমানে বিশুদ্ধ জল পান এই রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর। রোগীর চা-পানের অভ্যাস থাকলে চিনি ছাড়া চা পান করতে দিতে হবে। রোগীকে এই প্রকার আহার নিয়ন্ত্রনের ওপর রাখলে, রোগ যদি সামান্য প্রকারের হয় তবে শুধু এর দ্বারাই প্রস্রাবে সুগার নির্গমন বন্ধ হয়ে যাবে এবং রোগী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবে। আর রোগ যদি খুব বেশী জটিল আকার ধারন করে থাকে তবে প্রস্রাবের সঙ্গে সুগার নির্গমন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ না হলেও সুগারের পরিমান অনেকটা কম হয়ে আসবে এবং জল পিপাসা বা অন্যান্য উপসর্গ অনেকটা পরিমানে কম হয়ে আসবে।

রোগীর পথ্য নির্বাচন করার সময় একটা কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে, যে সকল রোগী কোন রোগে ভূগতে ভূগতে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিংবা যারা স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত দুর্বল বা কৃশ তাদের খাদ্য নিয়ন্ত্রন করতে গিয়ে হঠাৎ ভাত রুটী ইত্যাদি সবই বন্ধ করে দিলে হিতে আরও বিপরীত ফল হবে। তাই রোগীর স্বাস্থ্যের প্রতি শক্তির প্রতি মানসিকতার প্রতি সর্বপরি রোগের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তার পথ্য নির্বাচন করতে হবে। এই প্রকার রোগীর আহারে শর্করাজাতীয় খাদ্য হঠাৎ বন্ধ না করে ক্রমশঃ তা অতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে এনে অবশেষে পরিত্যাগ করাতে হবে। তবে অন্য যে সকল আহারের ব্যবস্থা করা হবে তা ওমুক রোগের পক্ষে ভালো তাই রোগীকে দিতেই হবে এরূপ বিবেচনা করা ঠিক নয়। খাদ্য সর্বদাই রোগীর সহ্য অনুসারে, সত্ব অনুসারে এবং রুচী অনুসারে নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু ডায়েবেটিস রোগীকে যতই রুচী থাক না কেন গুড় চিনি কখনই না দেওয়া উচিৎ। যে সকল শীর্ণকায় দুর্বল ব্যক্তি ডায়েবেটিসে আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে হঠাৎ ভাত রুটী বন্ধ করে দিলে অসুবিধা হবে বলে শর্করা জাতীয় দ্রব্যের পরিমান কমিয়ে দিতে হবে কিন্তু স্থূলকায় ডায়েবেটিস রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগনকে শর্করা জাতীয় খাদ্য একেবারে বন্ধ করে দিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না।

ডায়েবেটিস রোগীর উপকারী খাদ্য

মাছ-মাংস-টাটকা শাকসব্জী, ছাচিকুমড়া, লাউ, বেগুন, মুলো, মানকচু, কড়াইশুটি প্রভৃতির তরকারী, আম, জাম, ন্যাসপাতী জামরুল, কমলালেবু, বাতাপি লেবু এবং সমস্ত প্রকার টক ফল। প্রবল পিপাসার সময় পাতিলেবু কিংবা কাগজী লেবুর রসজলে দিয়ে পান করলে বিশেষ উপকার হয়। মদ্য, আফিং তামাক নস্যি এবং ধুমপান এই রোগে সর্বদাই বর্জনীয়। এই রোগে আক্রান্ত রোগীকে আজীবন আহারের বিষয়ে সতর্কতা পালন করে চলতে হয়।

লোভের বশবর্তী হয়ে কখন যদি শর্করা জাতীয় খাদ্য অধিক পরিমানে গ্রহণ করা হয় তবে কিন্তু প্রস্রাবে পুনরায় সুগার দেখা দেবে এবং অন্যান্য উপসর্গে কষ্ট পেতে হবে।

ডায়েবেটিস রোগীর আদর্শ পথ্য নির্বাচন

যে বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে একজন ডায়েবেটিস রোগীর যথাযথ পথ্য নির্বাচন করা উচিৎ সেই বৈশিষ্ট্য গুলো হল—

১) ঐ খাদ্য যেন একটি মানুষের প্রয়োজনীয় পুষ্টি পর্যাপ্ত পরিমানে যোগান দিতে পারে। যেমন কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও চর্বিজাতীয় খাদ্য।

২) ঐ খাদ্য যেন পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ লবন যোগান দিতে পারে যা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং ডায়েবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রনের পক্ষে জরুরী।

৩) পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্যের তাপমূল্য (ক্যালরী) যোগান দিতে পারে যা আদর্শ শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রন ও পরিপুরনকে সহযোগিতা করতে পারে।

৪) যা ডায়েবেটিস রোগের উপসর্গ সমূহকে নিয়ন্ত্রন করতে বা এড়িয়ে চলতে সহায়তা করতে পারে।

খাদ্যের মোট পরিমান

এটা সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়েছে যে একজন ডায়েবেটিস রোগীকে সারাদিনে ঠিক ততটুকু পরিমান খাদ্য খেতে দিতে হবে যা প্রতি আদর্শবান শরীর ওজন অনুযায়ী ৩০ ক্যালোরীমত খাদ্য তাপমূল্য বিতরন করতে পারে। কিন্তু যখন কোন রোগী অধিক দৈহিক শ্রমদানকারী হয় কিংবা একেবারেই শ্রমবিমুখ হয় নতুবা শীর্ণকায় ও অপেক্ষাকৃত হাল্কা ওজনের অথবা স্থূলকায় ও অপেক্ষাকৃত অধিক ওজনের হয় তবে সে ক্ষেত্রে এই ক্যালরী মূল্যের বিশেষ বিবেচনা পুর্বক হেরফের ঘটাতে হবে। তবে বহুপর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ করে দেখা গেছে যে যতটুকু খাদ্য সারাদিনে মোট ১৫০০ থেকে ১৮০০ ক্যালরী তাপমূল্য যোগান দিতে পারে ততটুকু পরিমান খাদ্যই একজন মাঝবয়সী বিলাসী ডায়েবেটিস রোগীর পক্ষে যথোপযুক্ত। কিন্তু খেলোয়াড়, বাড়ন্ত ছেলেমেয়েরা গর্ভবতী মা কিংবা স্তন্যদাত্রী মায়েরা যদি এই রোগে ভোগেন তবে তাদের ক্ষেত্রে আরও অধিক খাদ্য প্রয়োজন হবে।

একজন ডায়েবেটিস রোগীর জন্য নির্বাচিত খাদ্যের মোট পরিমানকে সারাদিনে খাবার জন্য মোট পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে নিতে হবে। এই পাঁচবারে বিভক্ত করা খাদ্য গ্রহণ করলে শরীরে যে Insulin ক্ষরণ হয় তা যথাযথ ভাবে তার নিজের সাধ্যমত স্বল্প পরিমিত খাদ্যকে জীর্ণ করতে সক্ষম হবে কিন্তু একইসঙ্গে অধিক পরিমান খাদ্য গ্রহণ করলে শরীরস্থ Insulin যথোপযুক্তভাবে খাদ্যকে জীর্ণ করতে না পারার ফলে ঐ Hormone ক্ষরণকারী

Gland, pancreas এর ওপর অধিক চাপ পড়বে, ফলে ঐ গ্রন্থিটি আরও অধিক দুর্বল হয়ে পড়বে। এর ফল স্বরূপ রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। এইজন্যই ডায়েবেটিস রোগীকে কখনও এক সঙ্গে অধিক খাদ্য ভোজন করতে দেওয়া উচিৎ নয়। তাতে রক্তে সুগারের পরিমান যথেচ্ছ ভাবে বৃদ্ধি হবার সুযোগ পায়। কারন Insulin তার ক্ষমতানুযায়ী যতটুকু খাদ্যকে Glucose পৃথক করে তা দহন করা যায় তা করবে, বাড়তি চিনি যথেচ্ছভাবে রক্তে বিচরণ করবে। অপরদিকে একই সঙ্গে অধিক পরিমান খাদ্য গ্রহণ করলে দেখা যায় যে শরীরের রক্ত Glucose দ্বারা ঘনীভূত হয় অধিক। কিন্তু বারে বারে স্বল্প পরিমান খাদ্য গ্রহনের ফলে দেখা যায় রক্তে চিনির পরিমান উল্লেখ যোগ্যভাবে কমে যায় এবং রক্ত অপেক্ষাকৃত ভাবে তরল হয়। ডায়েবেটিস রোগীর রক্ত Glucose দ্বারা অধিক ঘনীভূত হওয়া ভালো নয় এর দ্বারা Hypoglycemic coma নামক এক প্রকার কঠিন উপসর্গের সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রত্যেক ডায়েবেটিস রোগীরই উচিৎ তার সারাদিনের মোট খাদ্য নির্বাচন করে তা অন্তত ৫ ভাগে বিভক্ত করে ৫ বারে খাওয়া। মোট খাদ্যকে এই পাঁচভাগে বিভক্ত করে প্রতিভাগে কতটা পরিমান খাদ্যমূল্য গ্রহণ করা উচিৎ হবে সে সম্পর্কে খাদ্যবিজ্ঞানীদের অভিমত হল মোট খাদ্যের ২০ শতাংশ খাদ্য (তাপমূল্য) বা ক্যালরী সকালের জল খাবারে গ্রহণ করতে হবে। মোট খাদ্যের ৪০ শতাংশ ক্যালরী মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় গ্রহণ করতে হবে।

মোট খাদ্যের ১০ শতাংশ তাপ মূল্য (ক্যালরী) বৈকালের চা খাবার সময় গ্রহণ করতে হবে।

আর মোট খাদ্যের ১০ শতাংশ তাপমূল্য (ক্যালরী) সন্ধ্যায় দুধ পানের সময় গ্রহণ করতে হবে।

এবং সর্বশেষ খাদ্যের বাকী ২০ শতাংশ তাপমূল্য (ক্যালরী) গ্রহণ করতে হবে রাত্রের নৈশ আহারের সঙ্গে।

১৫০০ থেকে ১৮০০ তাপমূল্যের দৈনিক গ্রহণযোগ্য খাদ্য তালিকা

১) দৈনিক ৯০০ থেকে ১০৭৫ ক্যালরি মানের তাপমূল্য সংগ্রহ করতে হবে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য থেকে। এই জন্য দৈনিক খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের পরিমান থাকা উচিৎ ২২৫ থেকে ২৭৫ গ্রামের মত।

২) ৩২৫ থেকে ৪০০ ক্যালরী পরিমান তাপমূল্য সংগ্রহ করতে হবে চর্বিজাতীয় খাদ্য থেকে। তাই দৈনিক খাদ্য তালিকা Fat জাতীয় খাদ্যের পরিমান প্রয়োজন ৩৫ থেকে ৪৫ গ্রাম।

৩) ২৭৫ তেকে ৩২৫ ক্যালরী গ্রহণ করতে হবে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য থেকে। তাই দৈনিক খাদ্য তালিকায় এই পরিমান ক্যালরী সংগ্রহের জন্য প্রোটিন জাতীয় খাদ্য প্রয়োজন হবে ৭০ থেকে ৮০ গ্রাম।

একজন ডায়েবেটিস রোগীর দৈনিক খাবার মোটামুটি একটা রুটীন

১) সকাল ৬টাঃ ২টি ক্রিম ক্রেকার বিস্কুট এবং এককাপ চিনি ছাড়া চা (চায়ের বদলে দুধ পান করলে আরও ভালো যদি সহ্য হয়)

২) সকাল ৮ টাঃ ১টি হাতে গড়া আটা কিংবা সুজির রুটী, সামান্য পাকা ফল ও এক গ্লাস ঘোল।

৩) দুপুর ১২ টাঃ ২ টি হাতে গড়া রুটী ২ কাপ ভাত এককাপ ডাল, এক কাপ সবুজ তরকারী (আলুবাদ), টাটকা সবুজ শাক এক হাতা, কাঁচা সব্জীর স্যালাড্, এক গ্লাস ঘোল বা সামান্য দই।

৪) বৈকাল ৪ টাঃ এককাপ চা বা কফি (দুধ সহ্য হলে) কিন্তু চিনি ছাড়া, ২ টি মেরী বিস্কুট বা ক্রীমক্রেকার রিস্কুট।

৫) রাত্রি ৯টাঃ ২টি হাতে গড়া রুটী, ছানা ৫০ গ্রাম, ডাল এককাপ, সবুজ তরকারী এককাপ, কাঁচা ফলের স্যালাড্।

রাত্রি ১০টায় ঘুমোবার আগে সহ্য হলে এককাপ দুধ পান করে ঘুমোতে হবে। দুধ সহ্য না হলে এক গ্লাস শীতল জল। (প্রত্যেক ডায়েবেটিস রোগীর মোটামুটি একরকম একটা রুটীন তৈরী করে নিতে হবে। প্রত্যেক খাবার একটি নির্দিষ্ট সময় যথাযথ ভাবে পালন করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে যতই কাজ থাকুক না কেন কোন সময়ের খাবারই যেন বাদ না পড়ে কিংবা সময় পেরিয়ে না যায়। যারা আমিষ খাবার খান তারা রুটীনেতে দুপুরের খাবার সঙ্গে আমিষ খাবার (মাছ, মাংস ইত্যাদি ডিম নয়) যোগ করে অন্য খাবার পরিমানে কিছুটা কমিয়ে দেবেন।)

যোগব্যায়াম বা দৈহিক শ্রম

যোগব্যায়াম ডায়েবেটিস রোগের চিকিৎসায় গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয়। ব্যায়াম বা দৈহিক শ্রমে অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় বলে শরীরের মাংস পেশীকে শক্তি যোগান দিতে প্রচুর পরিমানে সুগার প্রয়োজন হয়। তাই শরীরস্থ অতিরিক্ত চিনির ব্যবহার শ্রমের দ্বারা হয়ে থাকে। এর ফলে Pancreas Gland অতিরিক্ত চিনি দহনের পরিশ্রম থেকে একটু বিশ্রামের সুযোগ পায়।

দ্বিতীয়তঃ দৈহিক শ্রমের দ্বারা শরীরের অতিরিক্ত চর্ব্বিরও সদব্যবহার হয় ফলে চর্বি কমে আসে। স্থূল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। ফলে ডায়েবেটিস ও হতে পারে না।

তৃতীয়তঃ যোগব্যায়াম বা দৈহিক শ্রমে হার্ট বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

ডায়েবেটিস রোগী হাল্কা ধরনের শরীর চর্চ্চা বা ব্যায়াম করতে পারেন—যেমন প্রাতঃভ্রমণ জগিং, সাতার কাটা, সাইকেল চালানো, বাগান করা ইত্যাদি। মধ্যবয়সী ডায়েবেটিস রোগীগনকে একটু অধিক দৈহিক শ্রম দান করতে হবে। বৃদ্ধদের ততটা অধিক শ্রম দান করলে একদিকে উপকার হলেও অপর দিক সামলাতে পারবেন কিনা তা আগে বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। এই জন্য সবচেয়ে ভালো হয় যদি দৈহিক শ্রম বা শরীর চর্চ্চার আগে কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে দিয়ে সম্পূর্ণ শরীর পুরোপুরি ভাবে চেক-আপ করে কোন কোন ধরনের ব্যায়াম বা শ্রম গুলি তার পক্ষে উপযুক্ত হবে সেই সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণ করা।

যদি কোন ব্যায়াম বা শ্রম করার সময় কিংবা পরে অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত বা ক্লান্ত হয়ে পড়ার অনুভূতি হয় কিংবা খুব দুর্বল বোধ হয়, অথবা বুকে কোনরকম ব্যাথা অনুভব হয় তবে বুঝতে হবে দৈহিক ক্ষমতার উর্দ্ধে শ্রম করা হয়েছে। সুতরাং মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে। কোন ডায়েবেটিস রোগী যদি বেশী হাটার ফলে কোমরে বা মাংসপেশীতে অধিক যন্ত্রনা অনুভব করেন তবে তৎক্ষণাৎ তাকে বিশ্রাম নিতে হবে।

এখানে ডায়েবেটিস রোগীদের করণীয় আসনমুদ্রার বিবরণ দিচ্ছি। ঠিক মত অনুসরন করলে নিশ্চিৎই সাফল্য লাভ হবে। তবে একটা কথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে সাময়িক উচ্ছাস বশতঃ কয়েকদিন আসনমুদ্রাদি পালন করে আবার বন্ধ করে দেওয়া কিংবা নিয়ম মত না করা, একেবারেই না করার থেকেও অধিক ক্ষতিকর। তাই নিয়মিত ভাবে এই অনুষ্ঠান গুলো পালন করে যেতে হবে।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক ডায়েবেটিস রোগীর শরীর চর্চ্চার তালিকা

১) সকাল—৫টা-৫,৩০ প্রাতঃভ্রমণ। এই ভ্রমনের সময় ১০ মিনিট ভ্রমণ প্রানায়াম করতে হবে। আদিতে ৩ মিনিট অন্তে ৩ মিনিট এবং মধ্যে ৪ মিনিট এই ১০ মিনিট ভ্রমণ প্রানায়াম করা অভ্যাস করতে হবে।

ভ্রমণ প্রানায়ামের নিয়ম হল ভ্রমণের সময় মেরুদণ্ড টান করে সোজা হয়ে হাটতে হবে। প্রথমে চারবার পদক্ষেপের তালে তালে ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ মনে মনে উচ্চারণ করে উচ্চারণের তালে তালে উভয় নাকের দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করতে হবে। শ্বাস গ্রহণ শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই আবার পদক্ষেপের তালে তালে শ্বাস ত্যাগ করতে হবে। প্রথম প্রথম শ্বাস নিতে যতটা সময় লাগে শ্বাস পরিত্যাগেও ঠিক ততটা সময়ই দিতে হবে অর্থাৎ চার পদক্ষেপে শ্বাস গ্রহণ করলে চার পদক্ষেপেই শ্বাস ত্যাগ করা শেষ করতে হবে।

কয়েক সপ্তাহ এরকম ভাবে অভ্যাস করার পর শ্বাস গ্রহন অপেক্ষা শ্বাস ত্যাগে দুই পদক্ষেপ করে বৃদ্ধি করতে হবে। অর্থাৎ চার পদক্ষেপে শ্বাস গ্রহণ এবং ছয় পদক্ষেপে শ্বাস ত্যাগ করতে হবে। এইভাবে চার ছয় পদক্ষেপ ভালভাবে অভ্যস্থ হয়ে গেলে ছয় আট পদক্ষেপ অভ্যাস করতে হবে অর্থাৎ ছয় পদক্ষেপ শ্বাস নিতে হবে এবং আট পদক্ষেপ স্বাস ত্যাগ করতে হবে। এর পরেও সাধ্যায়ত্ব হলে আট বারো, বারো চোদ্দ এরূপে বৃদ্ধি করা যায়,

এই ভ্রমণ প্রানায়াম করার সময় একটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। দেখতে হবে যে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া বা ছাড়ার সময় যেন হাঁপাতে না হয়। একটু কষ্ট অনুভূত হলেই দুই একটি শ্বাস প্রশ্বাস মাঝে মাঝে নিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিতে হবে। এরকমভাবে ভ্রমণের আদিতে অর্থাৎ ভ্রমণ শুরু করার সময় ৩ মিনিট, মধ্যে ৪ মিনিট এবং শেষে ৩ মিনিট (৩+৪+৩) মোট এই ১০ মিনিট প্রত্যহ এই প্রানায়ামটি অভ্যাস করতে হবে। ১০ মিনিট প্রানায়ামটি ভালভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলে ১৩ মিনিট (৪+৫+৪)প্রানায়ামটি অভ্যাস করতে হবে। ১৩ মিনিটের পর ১৬ মিনিট ১৯ মিনিট ২২ মিনিট এই পদ্ধতিতে প্রানায়ামের মাত্রা আধঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত অভ্যাস করা যায়।

আর একটি বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে যে প্রানায়াম অভ্যাসে কোনরূপ তাড়াহুড়ো করতে নেই। প্রানায়াম করার সময় নিজেই বোঝা যাবে কতটা বায়ু ধারন সহজভাবেই করা যাচ্ছে। তাই প্রানায়াম করতে গিয়ে বায়ুধারন শক্তি যে অনুপাতে বাড়বে সেই অনুপাতে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপও বাড়াতে হবে। আট, বারো পদক্ষেপ ভালোভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলে পদক্ষেপের মাত্রা বারো, আঠোরো পর্যন্ত বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। তবে বারো আঠারো এই প্রাণায়ামটির সর্বশেষ মাত্রা। এই মাত্রা ঠিক মত আয়ত্ব হয়ে গেলে আর পদক্ষেপের হিসাব রাখার প্রয়োজন হবে না। শ্বাস নিতে নিতে যতবার সম্ভব ততবার পদক্ষেপ করলেই হবে। আর এই পদক্ষেপের তালে তালে শ্বাস ত্যাগ করতে করতে হাটতে হবে।

এই ভ্রমণ প্রানায়ামটি দুই এক বছর নিয়মিত ভাবে অভ্যাসের পর প্রাতঃ ভ্রমণের পুরোটাই অর্থাৎ আধঘণ্টা বা একঘণ্টা সময় ধরেই এই প্রানায়ামটি অভ্যাস করা যেতে পারে।

ডায়েবেটিস রোগী ছাড়াও যে কোন ব্যক্তি এই প্রাণায়ামটি করতে পারেন। এটি একটি মহা উপকারী প্রানায়াম। যাদের ডায়েবেটিস নেই তারা এটি নিয়মিত অভ্যাস করতে পারলে আর ভবিষ্যতে ডায়েবেটিসের আক্রমনের সম্ভাবনা থাকবে না। এই প্রানায়ামটি অবিশ্রান্ত ভাবে আধ ঘণ্টা অনুষ্ঠানের ক্ষমতা আয়ত্ব হলে টাইফয়েড, টিবি, হাপানী, প্লুরিসি, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি কোনরোগ শরীরকে আক্রমন করতে পারবে না।

২) ৫, ৩০—৬টা

সহজ বস্তিক্রিয়া ঃ এ পদ্ধতিতে অন্ততঃ একলিটার শীতল জল দুইটি পরিষ্কার গ্লাসে ঢালাঢালি করে অতি ধীরে ধীরে তা পান করতে হবে। ঐ শীতল জল পান করা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ৩ মিনিট বিপরীত করনী মুদ্রা করতে হবে। বিপরীত করনী মুদ্রা কিভাবে করতে হয় তা এখানে জানানো হচ্ছে।

বিপরীত করনী মুদ্রা ঃ

প্রথমে মাথা মাটিতে রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। হাত দুটি উপুড় করে শরীরের দুই পাশে রাখতে হবে। পায়ের আঙুল গুলোকে উর্দ্ধমুখী রেখে পাদুটিকে সোজাভাবে বিন্যস্ত করতে হবে। এরকমভাবে শুয়ে এবার পা দুটিকে আস্তে আস্তে ওপরের দিকে তুলতে হবে। যখন ৩০ ডিগ্রীর মত উঠবে তখন একটু থেমে দুই হাতের কনুই ও কব্জীর ওপর শরীরের ভর রেখে কোমর এবং পা দুটোকে আরও উচুতে তুলতে হবে। এরপর হাতের কনুই এবং কব্জীকে স্তম্ভের আকারে স্থাপিত করে দুই হাতের ওপর কোমরের ভার রেখে পা দুটিকে উচুতে তুলে কোমরের সমান্তরালে স্থাপন করতে হবে। সাধ্যমত এইভাবে কিছুক্ষণ থেকে ধীরে ধীরে পা নামিয়ে শরীরকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। পা উচুতে তুলে অন্তত পাঁচ মিনিট সময় তুলতে যখন আর কষ্ট হবে না তখন বুঝতে হবে যে আসনটি ঠিকমত অভ্যস্ত হয়েছে। তার আগে পর্যন্ত সাধ্যমত ২মিনিট বা ৩ মিনিট পর্য্যন্ত পা তুলে থাকতে হবে।

(সহজ বিপরীত করনী মুদ্রার ছবি এই বইতে দেওয়া হয়েছে)

বিপরীত করনী মুদ্রার পর ৫/৬ বার শলভাসন করতে হবে। যারা ময়ুরাসন করতে সক্ষম তারা ময়ুরাসন ৪/৫ বার করলে আরও অধিক উপকার হবে। ময়ুরাসনে অসমর্থ ব্যক্তিগনই শলভাসন করবেন।

এখানে সংক্ষেপে ময়ুরাসন এবং শলভাসন করার প্রনালীটা উল্লেখ করছি।

শলভাসন ঃ

শলভাসন করতে হলে প্রথমে দেহটি সোজা রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। চিবুক মাটীতে ঠেকাতে হবে। এবার হাতদুটি মুঠো করে শরীরের পাশে উরু বরাবর স্থাপন করতে হবে। এখন পায়ের গোড়ালী ওপরের দিকে রেখে পা দুটিকে সোজা এবং টান ভাবে রাখতে হবে। এবার বাঁ পা সোজা ও সটান রেখে যতদুর পারা যায় ওপরের দিকে তুলতে হবে। দেখতে হবে যেন হাঁটুতে একটুও ভাঁজ না পড়ে কয়েক সেকেণ্ড এইভাবে পা রেখে ধীরে ধীরে পা নামিয়ে আগের মত মাটিতে নামিয়ে আনতে হবে। এরপর আবার ঠিক একই ভাবে ডান পা-টাকে উচুতে তুলতে হবে, কয়েক সেকেণ্ড পা-টাকে উচুতে তুলতে হবে, কয়েক সেকেণ্ড পা উচুতে রেখে আবার ধীরে ধীরে পা নামিয়ে নিতে হবে। এই ভাবে আলাদা আলাদা ভাবে দুই পা পর পর তিন চার পার ওঠাতে এবং নামাতে হবে। এর পর

চিবুক, বুক এবং মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের ওপর শরীরের ভর রেখে পা দুটোকে টান করে একসঙ্গে ওপরে ওঠাতে হবে। দেখতে হবে যেন পা দুটি কমকরেও যেন মাটি থেকে অন্তত আধহাত ওপরে ওঠে। অবশ্য কিছুদিন অভ্যাস করার পর পাদুটিকে মাটি থেকে এক হাত ওপরে তুলতেও কোন কষ্ট অনুভব হবে না। প্রথম প্রথম এই আসনটি করতে একটু অসুবিধা হতে পারে তার জন্য চিন্তার কোন কারন নেই। প্রথমে দুই পা তোলা যাদের পক্ষে কষ্টকর বলে মনে হবে, তারা কিছু দিন শুধু পর্যায়ক্রমে বাঁ পা ও ডান পা তুলে আসনটি করতে থাকবে। এতে অর্দ্ধশলভাসন করার পর পুর্নভাবে সহজেই শলভাসন করা সম্ভব হবে।

এই আসনটি নিয়মিত করলে ডায়েবেটিস তো হতেই পারে না হলেও সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে। তা ছাড়া এটি কটি ব্যাথা বা কোমরের বাতের একটি প্রতিষেধক ব্যবস্থা। বাত, সায়েটিকা, কোষ্ঠবদ্ধতা দুর করতেও এই আসনটির অসাধরণ ক্ষমতা।

(তবে যাদের হার্টের দোষ আছে বা ফুসফুস খুব দুর্বল তাদের এই আসনটি করা নিষেধ। কারন এই আসনটি করার সময় বুকের ওপর এবং ফুসফুসের ওপর বিশেষ ভাবে চাপ পড়ে)

ময়ুরাসন ঃ এই আসনটি ডায়েবেটিস রোগের একটি শক্তিশালী প্রতিষেধক বলা যায়। বাল্যকাল থেকে এই আসনটি ঠিকমত করতে পারলে আর ডায়েবেটিস যে হবেই না এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

প্রণালী ঃ ময়ুরাসন করতে হলে প্রথমে হাটু গেড়ে বসতে হবে। এর পর হাটু থেকে নিজ হাতের এক হাত দুরে হাতের কব্জী দুটি পরস্পর সংলগ্ন করে স্থাপন করতে হবে। হাতের আঙুল গুলো যেন হাটুর দিকে থাকে এর পর দুই হাতের কনুই নাভির স্থানে স্থাপন করে পাদুটিকে টানকরে উচুতে তুলতে হবে মাথা নাভিদেশের সঙ্গে সমসূত্রে মাটির ওপরে থাকবে, পা দুটি সমসূত্রে কিংবা কিছুটা ওপরে থাকবে। এইবারে শরীরের পেছনের অংশ সমান্তরালে উচুতে উঠলে শরীর কতকটা উর্দ্ধপুচ্ছধারী ময়ুরের মত হবে। এইভাবে ৪/৫ সেকেণ্ড থেকে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার ৪/৫ মিনিট অভ্যাস করতে হবে। এইভাবে ৩ বার করতে হবে। এই আসনটি ভালোভাবে আয়ত্ব হলে শ্বাসবন্ধ রেখে প্রতিবারে ১০ সেকেণ্ড পর্যন্ত আসনটিতে থাকতে পারা যায়।

এই আসনটি করার সময় ময়ুরের আকার ধারন করে বলে এই আসনটির নাম হয়েছে ময়ুরাসন। এটি একটি মহা উপকারী আসন। এই আসনটি ঠিকমত অভ্যাস করলে Liver এবং Pancreas সঠিকভাবে সুস্থসবল থেকে, সক্রিয় থেকে, সহজভাবে ও অনায়াসে নিজ কর্তব্য সুচারুরুপে পালন করার সুযোগ পায়। বৃহৎ অন্ত্র ক্ষুদ্রঅন্ত্র এবং পাকাশয় ও বস্তিপ্রদেশের যাবতীয় পেশী ও স্নায়ু সমূহ এই আসনটি অভ্যাসে সবলতর হয়ে ওঠে। এই জন্যই পাকস্থলীর যাবতীয় রোগ আরোগ্য করতে এবং ডায়েবেটিস রোগের মূল উৎপাটন করতে

এই আসনটি বিশেষ ভাবেই সাহায্য করে।

তাছাড়া এই আসনটি ঠিকমত অভ্যাস করলে বাত, পিত্ত ও কফের দোষ বিনষ্ট হয়। শরীরের আলস্য ও জড়তা দুর হয়। এই আসনে অগ্নিবল এতই বৃদ্ধি পায় যে অতিরিক্ত দোষ দুষ্ট আহার কিংবা বিষের মত অনিষ্টকারী আহার গ্রহণ করলেও তা পরিপাক হয়ে যায়, তা দেহের কোনরূপ অনিষ্ট করতে পারে না। এই আসনটি কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, ডায়েবেটিস, হাই বা লো ব্লাডপ্রেসার অর্শ প্রভৃতি রোগ হতে দেয়না আর হলেও তা আরোগ্যে সাহায্য করে কিন্তু অতিরিক্ত হাই প্রেসারের রোগীর পক্ষে এই আসনটি করা নিষেধ।

এইভাবে সহজ বস্তিক্রিয়া অর্থাৎ ঠাণ্ডা জল পান করে বিপরীত করনীমুদ্রা, এরপর ময়ুরাসন বা শলভাসন এবং তার পরে ৪/৫ বার পদহস্তাসন করতে হবে। পদহস্তাসনের নিয়মটা বলি—

পদহস্তাসন ঃ এই আসনটি করতে হলে প্রথমে হাতদুটোকে উরুর সঙ্গে সমান্তরাল রেখে সামনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সোজা হয়ে দাড়াতে হবে। পায়ের গোড়ালি দুটি পরস্পর যুক্ত থাকবে কিন্তু বুড়ো আঙুল দুটোর মধ্যে এক বিঘত মত ফাঁক থাকবে। এরপর বাঁ হাত টান রেখে ক্রমশঃ ওপরের দিকে তুলে হাতের কনুই মাথার সঙ্গে সংলগ্ন করতে হবে। হাত মাথার সংলগ্ন হলে ঐ ওপরে হাত তোলা অবস্থায়ই মাথাটিকে ডানদিকের কাঁধ বরাবর সাধ্যমত নীচু করতে হবে। পা যেন একটুও না নড়ে, কিংবা হাটু যেন একটুও না ভাঙে সেদিকে সচেতন থাকতে হবে। এখন ডান হাত আগের মতই টান থাকবে এবং মাথা নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটি জঙ্ঘাপ্রদেশে নেমে আসবে। যতদুর মাথা নত করা যায় ততটা নত করে কয়েক সেকেণ্ড এই অবস্থায় থাকতে হবে। হাত দুটিকে আগের মতই রেখে এইবার মাথাটিকে ধীরে ধীরে উত্তোলিত করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এরকম ভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় থেকেই উর্দ্ধে তোলা বাঁ হাতকে ক্রমশঃ নামিয়ে এনে আগের মত বাঁ উরুর সমান্তরালে রাখতে হবে। এইবার বিপরীতভাবে আবার ক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি করতে হবে। অর্থাৎ বাঁ হাতের বদলে এবার ডান হাত উর্দ্ধে ওঠাতে হবে। ডান হাতের কনুই প্রদেশ মাথার সঙ্গে সংলগ্ন করে ঐ হাত সহ মাথা বাঁ কাঁধ বরাবর নত করতে হবে। হাটু যেন না ভাঙে এবং মাথা নত করার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত ও জঙ্ঘাপ্রদেশের দিকে নামতে থাকবে। হাটু না ভেঙ্গে যতদুর সম্ভব নত হওয়া যায় ততদুর নত হয়ে কয়েক সেকেণ্ড আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। এর পর আগের মত পুনরায় ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাড়াতে হবে। এবার হাতদুটিকে কাঁধ পর্যন্ত সামনের দিকে প্রসারিত করে ক্রমশঃ ওপরের দিকে তুলে যতটা সম্ভব মাথার পেছনে নিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে হাত ওঠানামা করার সময় হাতের আঙুল সহ সমস্ত হাতই কিন্তু সটান থাকবে। কনুই প্রদেশে যেন কোন ভাজ না পড়ে। এরপর পেছনের দিকের প্রসারিত হাতদুটিকে সামনের দিকে এনে ক্রমশঃ

নিচু হয়ে দুই হাত দ্বারা দুই পায়ের আঙুল স্পর্শ করতে হবে। হাত দ্বারা পায়ের আঙুল স্পর্শ করার সময় হাটুও সোজা রাখতে হবে। হাটুতে যেন ভাজ না পড়ে। সম্ভব হলে কপাল যেন হাটুতে লাগে এরূপ চেষ্ট করতে হবে, কিন্তু না লাগলেও ক্ষতি নাই। এইভাবে কয়েক সেকেণ্ড থেকে হাত দুটোকে উচুতে তুলে সোজা হয়ে দাড়াতে হবে এবং উচুতে তোলা হাত নিচে নামাতে হবে।

ডানদিক, বাদিক, সামনে ও পেছনে পর্যায়ক্রমে নিচু হওয়ার এই চারপ্রকার ক্রিয়া মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ পদহস্তাসন হয়। এই ক্রিয়াটি সাধ্যমত দুইবার থেকে আরম্ভ করে ৫/৬ বার পর্যন্ত করা যেতে পারে।

এই পদহস্তাসন ক্রিয়াটি আরম্ভ করার প্রথম প্রথম পায়ের আঙ্গুল গুলি স্পর্শ করতে কষ্ট হলে যতদুর হাত যায় ততদূর পর্যন্ত হাত নামিয়ে ক্রিয়া সমাপ্ত করতে হবে। বারবার অভ্যাসে পা ছোয়া যখন সহজ হয়ে আসবে তখন শ্বাস প্রশ্বাস সহযোগে ক্রিয়াটি অভ্যাস করতে হবে। হাত তোলার সময় শ্বাস টেনে নিতে হবে এবং হাত নামাবার সময় শ্বাস ছাড়তে থাকতে হবে। এরকম ভাবে শ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালে করতে পারলে এই আসনে অধিকতর সুফল পাওয়া যায়

এই আসনটি ডায়েবেটিস ছাড়াও কিডনির দোষ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, সায়েটিকা অজীর্ণ, মেদবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ দুর করে Liver ও বেশ সবল ও পরিপুষ্ট হয়।

সহজ বস্তি ক্রিয়ার শেষে এই আসন করার সঙ্গে সঙ্গে পায়খানার বেগ আসবে তখন পায়খানা যেতে হবে।

৩) ৬—৬,৩০ মি

প্রাতঃকৃত্যাদি, টাববাথ।

এরপর প্রাতঃকৃতাদি সমাপন করে প্রথমে মাথায় ২/৩ ঘটি ঠাণ্ডা জল ঢেলে মাথাটা ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। অতঃপর একটি বড় পাত্রে শীতল জল রেখে তাতে ২/৩ মিনিট বসে থাকতে হবে। ঐ পাত্রে যে জল থাকবে তা এমন পরিমান হবে যাতে বসলে নাভি যেন জলের নীচে থাকে। এইবার ধীরে ধীরে হাত দিয়ে জল নাভি অভিমুখে সেচন করতে হবে।

এইরূপে রোজ সকালে নাভিপ্রদেশ জলে ডুবিয়ে রাখলে বস্তি প্রদেশের অন্তর্গত গ্রন্থিসমূহ, স্নায়ু ইত্যাদি সুস্থ ও সবল হয় এবং তারা দ্রুত স্বাস্থ্য বিধানে সহায়তা করে। ডায়েবেটিস রোগীগণ তো বটেই অন্য সকলেরও এই ক্রিয়াটি করা উচিৎ।

৪) অগ্নিসার ধৌতি ৬,৩০-৬,৪৫ মিঃ

যোগশাস্ত্রের ভাষায়, "নাভিগ্রন্থি মেরুপৃষ্ঠে শতবারঞ্চ কারয়েৎ"— অর্থাৎ "নাভিগ্রন্থিকে একশতবার মেরুদণ্ডে সংলগ্ন করতে হবে।" এই ক্রিয়াটি ঠিকমত করলে সূর্য্যগ্রন্থি অর্থাৎ Pancereas Gland টি এত সতেজ ও শক্তিশালী হয় যে Insulin এর ক্রিয়া বৈষম্য

হতেই পারে না। সুতরাং এই আসনটি ডায়েবেটিস, রোগের পক্ষে একটি মহা উপকারী ক্রিয়া, তাছাড়া এই ক্রিয়াটির নিয়মিত অভ্যাসে পরিপাক তন্ত্রের অন্তর্গত সকল গ্রন্থিই সবল ও সুস্থ হয়, Spleen, pancreas, Liver এবং Suprarenal gland প্রভৃতি এর দ্বারা অধিকতর শক্তিশালী ও কর্মক্ষম হয়ে ওঠে, তাই এর দ্বারা অম্বল, অজীর্ণ ডায়েবেটিস প্রভৃতি রোগ গুলি হতে পারে না আর হলেও তার মোকাবিলা করে।

প্রণালী ঃ অগ্নিসার ধৌতি ক্রিয়াটি করতে হলে প্রথমে যে কোন একটি আসনে বসে কিংবা বাবু হয়ে বসে যতটা পারা যায় শ্বাস পরিত্যাগ করে কুম্ভব অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ শ্বাস বন্ধ করে থাকতে হবে। এখন এই কুম্ভক অবস্থায় যতবার সম্ভব নাভিগ্রন্থি (সূর্যগ্রন্থিস্থান) অর্থাৎ নাভিদেশকে আকুঞ্চিত করে মেরুদণ্ডে সংলগ্ন করতে হবে। যখন দেখা যাবে যে আর শ্বাস বন্ধ রাখা সম্ভবপর হচ্ছে না তখন আকুঞ্চন শিথিল করে দিয়ে শ্বাস গ্রহণ করতে হবে। এরপর আবার শ্বাস ত্যাগ করে কুম্ভক অবলম্বনে আগের মতই ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করতে হবে। এইভাবে ১০০ বার আকুঞ্চন ও প্রসারন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতে হবে।

৫) প্রানায়াম ৭—৭,৩০ মিনিট

ক) প্রথমে যে কোন একটি আসনে বসে অতি ধীরে ধীরে উভয় নাসিকা দ্বারা দমভর বায়ু আকর্ষন করতে হবে। মেরুদণ্ড যেন সর্বদা সটান ও সোজা থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এর পর একনাগাড়ে মুখ দ্বারা ক্রমাগত বায়ু ত্যাগ করে যেতে হবে। মুখ দ্বারা সম্পূর্ণ বায়ু ত্যাগ হলে পুনরায় উভয় নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করে আবার মুখ দ্বারা তা পরিত্যাগ করতে হবে। এরূপভাবে এই ক্রিয়াটি তিনমিনিট ধরে করতে হবে।

ডায়েবেটিস রোগীদের পক্ষে এই প্রানায়ামটি অতি উপকারী। পাকস্থলী ও যকৃতের দোষ ত্রুটিও বহুলাংশে এই প্রানায়ামটি অভ্যাসে দূরীভূত হয়। অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়েদের খোস পাঁচড়া, ফোঁড়া প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের ক্ষেত্রেও এটি অদ্বিতীয়। তাছাড়া এই প্রানায়ামটি ফুসফুসের যাবতীয় দোষ ত্রুটি দূরকরে ফুসফুসে সঞ্চিত ধূলাবালি পরিষ্কার করে ফুসফুসকে এমন সুস্থসবল করে রাখে, যাতে যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ বীজানু ফুসফুসকে আক্রমণ করতে পারে না।

এর পর পাঁচ মিনিট বিশ্রাম করে দ্বিতীয় প্রানায়ামটি ৪ মিনিট করতে হবে।

খ) দ্বিতীয় প্রানায়াম ঃ

একটি চেয়ারে মেরুদন্ড সোজা ও সরল রেখে বসতে হবে, এরপর দুই নাক দিয়ে বেশ জোরের সঙ্গে সশব্দে দমভর বায়ু আকর্ষণ করতে হবে। এখন বায়ু আকর্ষন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বেশ ধীরের সঙ্গেই অথচ সজোরে এবং সশব্দে নাক দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করতে হবে। এই বায়ু পরিত্যাগের সময় চিবুক আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামিয়ে কণ্ঠে সংলগ্ন করতে হবে। পূরকের সময় অর্থাৎ শ্বাস গ্রহনের সময় আবার চিবুককে উচুতে নিয়ে

যথাস্থানে সংস্থাপন করতে হবে। এইভাবে এই প্রানায়ামটি ক্রমাগত ৪ (চার মিনিট কাল) করতে হবে। শ্বাস গ্রহনের সময় যতক্ষন ধরে শ্বাস নেওয়া হবে শ্বাস পরিত্যাগের সময় তার থেকে একটু বেশীক্ষন ধরে শ্বাস ত্যাগ করতে হবে।

ডায়েবেটিস রোগী ছাড়াও অন্য সকলের পক্ষেও এই প্রানায়ামটি অপরিহার্য। এই প্রানায়ামটি ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগাক্রমণ প্রতিরোধ করে। সর্দিকাশিও ভালো করে।

এই প্রানায়ামটি করার পর আবার পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে তৃতীয় প্রানায়ামটি করতে হবে ৫+৫=১০ মোট ১০ মিনিট।

গ) তৃতীয় প্রানায়াম ঃ

প্রথমে সোজা হয়ে পা দুটি সংলগ্ন করে শুয়ে পড়তে হবে। হাত দুটি শরীরের দুই পাশে টান করে স্থাপন করতে হবে। এখন শ্বাস নিতে নিতে হাত দুটিকে উঁচুতে তুলতে তুলতে মাথার পেছনে নিয়ে যেতে হবে এবং মাথার সমান্তরালে স্থাপন করতে হবে। এরপর শ্বাসত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটিকে আগের মতই শরীরের দুইপাশে স্থাপন করতে হবে, এই ক্রিয়াটি ২ মিনিট করে ১ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় ২ মিনিট করতে হবে। এর পর আবার হাতকে বিশ্রাম দিয়ে পায়ের দ্বারা এই ক্রিয়াটি শুরু করতে হবে। শ্বাস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডানপা টান রেখে যথাসাধ্য উচুতে তুলে শ্বাস ত্যাগ করতে করতে পা নামিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে। লক্ষ্য করতে হবে যেন হাটুতে কোনরূপ ভাঁজ না পড়ে। এইভাবে পর পর এক এক পায়ে এক মিনিট এই ক্রিয়াটি করে মাঝে এক মিনিট করে বিশ্রাম নিতে হবে এবং শেষে এক সঙ্গে উভয় পা তুলে ক্রিয়াটি এক মিনিট করতে হবে।

এই ক্রিয়াটিতে হার্ট ও লাংসকে যথোচিত সবল ও স্বাস্থ্যবান হতে সহায়তা করে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের হাত পায়ে বাত হতে দেয় না হলেও তা সারাতে সাহায্য করে। ডায়েবেটিস রোগী ছাড়া সুস্থ মানুষেরও এই আসনটি উপকারী।

৬) ৭,৩০—৮

বমন ধৌতি বা বারিসার ধৌতি

বমন ধৌতি—প্রথমে ১/২ লিটার গরম জল পান করতে হবে। তারপর তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলিকে মুখের ভিতর ঢুকিয়ে আলজিভকে আস্তে আস্তে নাড়া দিতে হবে। তার ফলে সহজেই বমির উদ্রেক হবে। এইভাবে বার বার মুখে আঙ্গুল দিয়ে সমস্ত জল বের করার ব্যবস্থা করতে হবে। যাদের সহজে বমি হয় না তারা জলের পরিবর্তে লবনাক্ত জল পান করলেই হবে।

এর উপকারিতা হল—পাকস্থলীতে সঞ্চিত দূষিত অম্ল, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা প্রভৃতি এই ধৌতির ফলে দেহ থেকে বের হয়ে যায়। সুতরাং অজীর্ণ, অম্ল, ও সর্দি কাশির পক্ষে বমন

ধৌতি বিশেষ সহায়ক।

বারিসার ধৌতি—অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী লোকের পক্ষে বারিসার ধৌতি বিশেষ ফলপ্রদ। দুই হাত লম্বা এবং আধ ইঞ্চি ব্যাসের ছিদ্রসমন্বিত একটি রাবারের মোলায়েম নল কিনে তাকে রোগসংক্রামক দোষ মুক্ত করার জন্য গরম জলে ৩/৪ মিনিট ফুটিয়ে নিতে হবে। এরপর ১ থেকে ২ লিটার জল (ঈষদুষ্ণ) পান করে দাঁড়ান অবস্থায় একটু ঝুঁকে ঐ রাবারের নলটি মুখের ভিতর দিয়ে গলার নীচে খানিকটা নামিয়ে দিতে হবে। নলের বর্হিমুখ বামউরুর কাছাকাছি জায়গায় থাকবে। কয়েকদিন নল প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জল সজোরে মুখ দিয়ে বমি হবে। ২/৪ দিন অভ্যাসের পর ধীরে ধীরে নলটি গিলবার চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেকদিন অল্প অল্প করে গিলবার মাত্রা বাড়াতে হবে। নলের সমস্ত অংশ না গিলে ২ ইঞ্চি নল মুখগহরের বাইরে রাখতে হবে। নল গেলা অভ্যস্ত হলে ক্রমশঃ অভ্যাসে ঐ জল আর মুখ দিয়ে বের হবে না। ঐ নলের ভিতর দিয়ে অবিরল ধারায় বের হয়ে আসবে। ঐ জলের সঙ্গে দূষিত পিত্ত, শ্লেষ্মা এবং অজীর্ণ খাদ্য ও উদরের অনান্য যাবতীয় বিযাক্ত জিনিস বের হয়ে যাবে। যখন জল নির্গমন শেষ হবে তখন কিছুসময় ক্রিয়াটির অভ্যাস করলে তলপেটে অর্থাৎ সূর্যগ্রন্থি প্রদেশে যে সমস্ত দূষিত পিত্ত, শ্লেষ্মা ও রোগজীবানু সঞ্চিত থাকে তাও নলের ভিতর দিয়ে বাইরে চলে আসবে। তারপর নলটিকে পেট থেকে বের করে সাবান জল দিয়ে পরিষ্কার করে ছায়াতে ঝুলিয়ে শুষ্ক করতে হবে।

উপকারিতা ঃ—ডায়াবেটিস রোগী ছাড়াও অনান্য রোগে যেমন কোষ্ঠ বদ্ধতা, পিত্তশূল, অম্লশূল, স্নায়ুশূল, সর্দি, কাশি, যক্ষ্মা, শ্বেতকুষ্ঠ ও গলিত কুষ্ঠ প্রতিরোধ করে। দেহের ভিতরের ভাগকে নির্মল রাখতে, রোগজীবানু মুক্ত রাখতে এই ধৌতি ক্রিয়াটি বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

৭) সহজ অগ্নিসার ধৌতি ঃ—

মধ্যাহ্ন ১১-৩০ থেকে ১২ টা,

মধ্যাহ্নে স্নানের সময় সহজ অগ্নিসার ২৫ বার। নিম্নে এই প্রণালী দেওয়া হল।

(১)

প্রণালী—শ্বাস গ্রহণ করতে করতে উদরের নিম্নাংশ ও নাভিদেশকে আকুঞ্চিত করে মেরুদণ্ডে সংলগ্ন করবার চেষ্টা করতে হবে। শ্বাস গ্রহণ শেষ হলে শ্বাস ত্যাগ করতে করতে আকুঞ্চন শিথিল করতে হবে। কমপক্ষে ১০/১৫ বার এবং উর্দ্ধপক্ষে ১০০ বার এইভাবে ক্রিয়াটি করা যেতে পারে।

উপকারিতা—জঠরাগ্নি বৃদ্ধি পায়, প্লীহা ও যকৃত রোগমুক্ত হয়ে সরলতর হয়। অজীর্ণ রোগাদি ক্রমশঃ আরোগ্য হয়। পেটের অসুখ উদরাময় প্রভৃতি রোগারোগ্যে এটি বিশেষ সহায়তা করে।

(২)

শ্বাসপরিত্যাগ করে কুম্ভক অবলম্বন করতে হবে। এইরকম অবস্থায় যতবার সম্ভব নাভিগ্রন্থি বা সূর্যগ্রন্থি স্থানকে আকুঞ্চিত করে মেরুদণ্ডে সংলগ্ন করতে হবে। যখন আর শ্বাস বন্ধ রাখা সম্ভবপর হবে না তখন আকুঞ্চন শিথিল করে প্রাণবায়ু টানতে হবে। তারপর শ্বাস ত্যাগ করে কুম্ভক অবলম্বন করতে করতে আগের মতন ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করতে হবে। এইভাবে কমপক্ষে ১০/১২ বার এবং উর্দ্ধপক্ষে ১০০ বার আকুঞ্চন প্রসারন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতে হবে।

উপকারিতা—এই ক্রিয়াটির অভ্যাসে অগ্নিগ্রন্থিগুলি সবলতর হয়। প্লীহা, যকৃৎ সূর্যগ্রন্থি, শুক্রগ্রন্থি প্রভৃতি সবল ও সুস্থ হয়। সুতরাং অজীর্ণ, অম্ল, প্রভৃতি রোগারোগ্যে এই ধৌতিটি বিশেষভাবে সহায়ক।

৮) সন্ধ্যা ৬ টা ৬-৩০ মি.

ভ্রমণ প্রানায়াম

পূর্বেই ভ্রমণ প্রানায়াম বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ নিয়মেই সন্ধ্যাবেলায় ৬-৩০ পর্যন্ত মুক্ত বায়ুতে এবং পরিচ্ছন্ন রাস্তায় ভ্রমন সহ আদিতে, অন্তে ও মধ্যে মোট ১০ মিনিট প্রানায়াম করতে হবে আর বাকিটা সাধারন ভাবে ভ্রমণ করলেই হবে। সাধারন ভাবে ভ্রমনের সময় শ্বাসপ্রশ্বাসে কোনরূপ নিয়ন্ত্রন রাখা চলবে না।

৯) **যোগমুদ্রা**—৬-৩০ থেকে ৭-৩০মিঃ পর্যন্ত ক্রমাগত—যোগমুদ্রা ৫ মিনিট পশ্চিমউত্থান ৫ মিনিট সহজ অগ্নিসার ১০ মিনিট এবং সহজ প্রানায়াম ১০ মিনিট বিপরীত করনী আসন (মুদ্রা) ৩ মিনিট পবনমুক্তাসন ৫ মিনিট এই ক্রিয়াগুলি অনুষ্ঠান করতে হবে। এই ক্রিয়াগুলি কিভাবে অনুষ্ঠিত হবে তা আগেই বর্নিত হয়েছে তবে এদের মধ্যে যেগুলির বর্ণনা দেওয়া হয় নি সেগুলি এখানে জানান হচ্ছে।

যোগমুদ্রা—

প্রণালী—যোগমুদ্রা করতে হলে প্রথমে পদ্মাসনে উপবেশন করতে হবে। যারা পদ্মাসনে বসতে অক্ষম তারা বীরাসনে বা আসনপিঁড়ি হয়ে ও বসতে পারে। প্রথমে হাত দুটি পিছনে নিয়ে বাঁ হাতের দ্বারা কব্জি ধারন করতে হবে। তারপর শ্বাসত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মাথা নামিয়ে কপাল মাটিতে স্পর্শ করতে হবে। ৫ সেকেণ্ড শ্বাস রুদ্ধ করে আবার শ্বাস গ্রহন করতে করতে মাথা ও দেহকে সরল করে পূর্বাবস্থায় উপনীত হতে হবে। একাসনে বসে অন্ততঃ ৭ থেকে ১০ বার মাত্র ক্রিয়াটি অভ্যাস করতে হবে।

উপকারিতা—এই মুদ্রাটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্লীহা ও যকৃতের রুগ্নাবস্থা দূর করে সেই দেহকে সুস্থ সবল করতে, স্বাভাবিক আকৃতিতে পরিনত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। মুদ্রাটি দেহের স্নায়ু ও গ্রন্থিগুলিকে কিছুটা সবলতর করে রোগারোগ্যে সহায়তা করে।

পবনমুক্তাসন—এই আসন করতে হলে প্রথমে মেরুদন্ড সোজা করে হাত-পা টান করে শুতে হবে। এখানে ডান পা গুটিয়ে হাঁটু টা ধীরে ধীরে ডানবুকের সংলগ্ন করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বাঁ পা-টি যেন সটান থাকে ও ভাঁজ না পড়ে। এভাবে ১ মি. কাল থেকে আবার ধীরে ধীরে ডান পাটি যথাস্থানে স্থাপন করতে হবে। এইরূপ ভাবে তিনবার করে একই ভঙ্গিতে বাঁ পাটিকে ভাজ করে বাঁ বুকে হাঁটু সংলগ্ন করতে হবে। হাঁটু সংলগ্ন করার সময় ২ হাত দিয়ে পাটিকে বুকের দিকে চাপ দিলেই অতিসহজে হাঁটু বক্ষ সংলগ্ন হবে। এইভাবেই কিছুক্ষণ থাকার পরেই আবার দুপায়েই টান করে একসঙ্গে ধীরে ধীরে বক্ষ সংলগ্ন করতে হবে এবং ২ হাঁটুর মাঝখানে মাথাটা ধীরে ধীরে তুলে চিবুক সংলগ্ন করতে হবে। এই অবস্থায় ১৫ সে. থেকে পুনরায় শবাসন করতে হবে। এই প্রক্রিয়াটি পর পর ৩ বার করতে হবে।

উপকারিতা—এর উপকারিতা হল অজীর্ণ, অম্ল, পেটফাঁপা, উদরের চর্বি হ্রাস করে। উদরের স্নায়ুপেশীগুলিকে সবলতর করে অগ্নিগ্রন্থিগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়ায় অর্থাৎ জঠরাগ্নি বৃদ্ধিতে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দোষ দূর করতে এই আসনটি সহায়তা করে। শুধু ডায়েবেটিস রোগই নয় উপরিউক্ত রোগগুলিও এতে আরোগ্য হয়।

সহজ অগ্নিসার ধৌতি—

প্রণালী—দক্ষিণ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি কোমরের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত খাঁজের ফাঁকে স্থাপন করতে হবে। বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি একইভাবে কোমরের বাম পার্শ্বে অস্থির খাঁজের ফাঁকে স্থাপন করতে হবে। উভয় হাতের মধ্যমাঙ্গুলি নাভির উপর স্থাপন করতে হবে। তারপর বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বয়কে স্ব-স্থানে সদৃঢ় রেখে সমস্ত আঙ্গুলগুলি দ্বারা নাভিদেশকে সঙ্কুচিত করে মেরুদণ্ডের সঙ্গে সংলগ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাভির উপর থেকে আঙ্গুলগুলির চাপ মুক্ত করতে হবে। পুনরায় আঙ্গুলগুলি দ্বারা নাভিদেশকে সংকুচিত করে মেরুদণ্ডে সংলগ্ন করতে হবে। আবার সংলগ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আঙ্গুলের চাপ শিথিল করে নাভিদেশ কে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিতে হবে।

মাত্রা—কমপক্ষে অনুরূপভাবে ২৫/৩০ বার ক্রিয়াটি অনুষ্ঠান করতে হবে। উর্দ্ধপক্ষে ১০০ বার পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি করা যেতে পারে।

উপকারিতা—বস্তিপ্রদেশের যে স্থানে আমাশয় রোগজীবানু এবং উদরে রোগ সৃষ্টিকারি দুষ্ট কৃমি সঞ্চিত হয়ে সুদৃঢ় দুর্গ নির্মান করে, এই ক্রিয়াটির প্রভাবে বস্তিপ্রদেশে সেই রোগাক্রান্ত স্থানে প্রচুর রক্তপ্রবাহ নেমে আসে এবং রোগবীজানুর ঐ সুদৃঢ় দুর্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। রোগ বীজানুগুলি তখন আশ্রয়চ্যুত হয়ে অসহায়ভাবে রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, দেহরক্ষী শ্বেতরক্তানুরা তখন মনের আনন্দে এই রোগ বীজানুগুলিকে ধ্বংস করতে থাকে। এই জন্যেই এই মুদ্রাটির দ্বারা আমাশয়, কোষ্ঠ, তারল্য, ও উদরাময় প্রভৃতি বস্তি প্রদেশের যাবতীয় রোগ দ্রুত আরোগ্য হয়। এই ক্রিয়াটি কলেরা ও অজীর্ণ রোগে আরোগ্যের সহায়ক।

নিষেধ—ঋতুমতী ও সন্তানসম্ভাবিতা মেয়েদের পক্ষে এই ক্রিয়া অনুষ্ঠানটি নিষিদ্ধ।

পশ্চিমোত্তাসন ঃ

প্রথমে পা দুটিকে সরলভাবে সামনের দিকে বিস্তৃত করতে হবে। পায়ের আঙুল গুলো যেন উর্দ্ধমুখী থাকে, গোড়ালী দুটো পরস্পর সংলগ্ন হবে। এবার ডানহাত দ্বারা ডান পায়ের বুড়ো আঙুল এবং বাঁ হাত দ্বারা বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ধরতে হবে। এরপর শ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ধীরে ধীরে নীচু করতে হবে। মাথা-নীচু হতে হতে কপাল মাটিতে স্থাপিত হাটুর সংলগ্ন হবে। প্রথম অভ্যাসের সময় হাটু যদি মাটি থেকে কিছুটা ওপরে ওঠে, তাতে কোন ক্ষতি নেই। ক্রমশঃ অভ্যাস করতে করতে হাটু মাটিতে লাগবে। শ্বাস বন্ধ করে কপাল সাধ্যমত ৫ থেকে ১০ সেকেণ্ড পর্যন্ত হাটুর সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। এরপর শ্বাস নিতে নিতে আবার সোজা হয়ে বসতে হবে। শ্বাস গ্রহণ করতে করতে সোজা হবার সময় হাতকে আঙ্গুলীবদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত করে নিতে হবে। প্রথম প্রথম এই আসনটি ২ বার অভ্যাস করতে হবে। ভালোভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলে ৫/৬ বার করলেও চলবে। কপাল হাঁটুর সঙ্গে ঠেকানোর সময় হাত দুটিকে টান করে মাথার উপরিভাগেও রাখা যায়, অথবা হাতের কনুই দুইটি ভাজ করে মাথার দুইপাশে নামিয়েও রাখা যেতে পারে।

এই আসনে মেরুদণ্ড নমনীয় হয়। মেরুদণ্ড যত নমনীয় থাকবে যৌবন ততই দীর্ঘস্থায়ী হবে। মেরুদণ্ড কঠিন এবং অনমনীয় হয়ে পড়লে জড়া ও বার্দ্ধক্য এসে দেহকে গ্রাস করে। এই জন্যই মেরুদণ্ডকে সরল ও নমনীয় রাখা সকলের কর্তব্য। তাতে দেহ আমরণ সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকে। শুধু ডায়েবেটিসই নয়, সায়োটিকা বাত, অর্শ, কোষ্ঠবদ্ধতা কোষ্ঠতারল্য, স্বপ্নদোষ প্রভৃতিরোগ আরোগ্য করতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে।

তবে যাদের Spleen, liver, Apendicytes ও Hernia খুব বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের পক্ষে এই আসনটি উপযোগি নয়।

ডায়েবেটিস রোগিদের এই রুটীন অনুযায়ী আসন মুদ্রাদি পালন এবং দুইবেলা আহারের পর ৩ মিনিট বজ্রাসন, প্রত্যহ আহারের পর দক্ষিণ নাসায় এক ঘণ্টা শ্বাস প্রবাহ অব্যাহত রাখা এবং উপযুক্ত পথ্য মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য। **মনে রাখতে হবে কোন ওষুধেই ডায়েবেটিস রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয় না।** তবে যৌগিক ক্রিয়া অভ্যাসে শতকরা ৯৫ শতাংশ ভাগ রোগীই সুস্থ থাকে। এই নিয়মমত চললে নুতন রোগ খুব দ্রুত আরোগ্য হবে। রোগ পুরাতন হলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হতে একটু সময় লাগে তবে আরোগ্য যে হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং প্রত্যেক ডায়েবেটিস রোগীরই প্রথম থেকে এই ব্যবস্থার ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে এগিয়ে চলা কর্তব্য।

একাদশ অধ্যায়

ডায়েবেটিস রোগে কিছু মুষ্টিযোগ

১) ডায়েবেটিস রোগে কলাগাছের মোচার রস খুব উপকারী। ২/৩ চা চামচ মোচার রস ৮/১০ ফোঁটা মধুসহ প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে ২ বার সেবন করলে প্রস্রাব বারে ও পরিমানে কমে। তবে মধুটা আসল হওয়া চাই। মধুতে গুড় বা চিনি মেশানো থাকলে ফল হবে উল্টো।

২) ডায়েবেটিসে আকনাদির পাতাও বেশ কাজ করে। ৫/৬ টি আকনাদি পাতা বেটে এক কাপ জলে গুলে ছেঁকে সেই জলে একটু মিছরী মিশিয়ে সরবতের মত সকালে খালিপেটে খেলে ৫/৭ দিনের মধ্যেই বহুমূত্র ব্যাধির অসুবিধাগুলো দূর হতে থাকে।

৩) ডায়েবেটিসে আর একটি নির্ভর যোগ্য মুষ্টিযোগ হল অড়হরের পাতা এবং মূল। অড়হড় পাতার রস গরমকরে খেলে এই রোগে বিশেষ উপকার হয়। আর যদি পাওয়া যায় তবে অড়হড় গাছের মূল ৮/১০ গ্রাম মাত্রায় একটু থেঁতো করে ২ কাপ জলে সিদ্ধ করে আধকাপ থাকতে নামিয়ে খেতে পারলে আরও বেশি উপকার পাওয়া যায়। এর সঙ্গে খাঁটি মধু ১/২ চামচ দিতে পারলে আরও ভালো হয়।

৪) তেলাকুচাও ডায়েবেটিস রোগের একটি বিশিষ্ট ওষুধ। তেলাকুচার পাতা ও মূলের রস ৩ চা-চামচ করে সকালে ও বিকালে একটু গরম করে খেলে ৩/৪ দিন পর থেকেই এর কার্যকারীতা বোঝা যায়।

৫) ডায়েবেটিসে যবের আটার রুটি বা যবপ্রধান দ্রব্য খেলে এই রোগের অনেক উপশম হয়।

৬) শ্বেত নয়নতারা গাছের পাতা ও ডায়েবেটিস রোগে বেশ কার্যকারী। পর পর ৭ দিন ৩ টি করে শ্বেত নয়নতারা গাছের পাতা বেশ ভালো করে ধুয়ে চিবিয়ে সকালে খালিপেটে খেলে ভালো উপকার পাওয়া যায়।

রেপার্টারি

(যে সব ওষুধের পূর্বে তারকা চিহ্ন * আছে সেই ওষুধগুলি সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বুঝতে হইবে।)

মন

একাকী থাকিতে ইচ্ছা বা লোকসংসর্গে অনিচ্ছা— আলো, অ্যাগ্রা, *অ্যানাকার্ডিয়াম, অরাম, *ব্যারাইটা কার্ব, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, ক্যাপসিকাম, চায়না, কার্বো অ্যানিম্যালিস, *ক্যামোমিলা, কিউপ্রাম মেট, *জেলসিমিয়াম, *হেলেবোরাস, হেলোনিয়াস, *হায়োসায়ামাস, ইগনেসিয়া, কেলিব্রোম, ম্যাগ-মিউর, *নেট্রাম মিউর, নাক্স ভমিকা, পিকরিক অ্যাসিড, প্ল্যাটিনা, পালসেটিলা, রাস টক্স, সেলেনিয়াম, *সিপিয়া, *সালফার, ট্যারেন্টিউলা হিস।

একাকী থাকিতে অনিচ্ছা—*আর্সেনিক, *বিসমাথ, বোভিস্টা, কোনিয়াম, *কেলি কার্ব, *ল্যাকেসিস, লাইকো, লিলিয়াম টিগ, মেজেরিয়াম, *ফসফরাস, রেডিয়াম ব্রোম, সিপিয়া, *স্ট্র্যামোনিয়াম, ভার্বাসকাম, জিঙ্কাম মেট।

উদ্বেগ—*অ্যাকোনাইট, ইথিউসা, অ্যালুমিনা, *অ্যামোন-কার্ব, অ্যানাকার্ডিয়াম, আর্নিকা, আর্সেনিক, *অরাম মেট, ব্যারাইটা কার্ব, *বেলেডোনা, বার্বেরিস, ব্রায়োনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া, কার্বোভেজ, কস্টিকাম, *ক্যামোমিলা, চায়না, *ককিউলাস, *কফিয়া, কলোসিস্থ, সিক্লামেন, গ্র্যাফাইটিস, হেলেবোরাস, ইগনেসিয়া, কেলি কার্ব, কেলি ফস, *মস্কাস, নাক্স ভমিকা, ফসফরাস, *পালসেটিলা, রাসটক্স, স্ট্র্যামোনিয়া, *ট্যাবেকাম, ভেরেট্রাম অ্যালবাম।

ভীতিজনক --- *অরাম মেট, *ক্যাল্কে-কার্ব, *কস্টিকাম, কফিয়া, ডিজিটেলিস, কেলি কার্ব, কেলি আয়োড, *ম্যাগসালফ, সালফার, *ভেরেট্রাম অ্যালবাম।

প্রাতঃকালে—অ্যালুমিনা, অ্যানাকার্ডিয়াম, আর্সেনিক, কার্বো ভেজ, কস্টিকাম, *গ্র্যাফাইটিস, *ইগনেসিয়া, নাক্স ভমিকা, পালসেটিলা, সিপিয়া, সালপার ভেরেট্রাম অ্যালবাম।

সন্ধ্যাকালে—*অ্যাম্ব্রা গ্রিজিয়া, *আর্সেনিক, ক্যালেডিয়াম, *ক্যাল্কে-কার্ব, কার্বোভেজ, ডিজিটেলিস, গ্র্যাফাইটিস, হিপার সালফ, কেলি আয়োড, *লরোসেরাসাস, ম্যাগ কার্ব, *নাক্স ভমিকা, ফসফরাস, *রাসটক্স, *সিপিয়া, সালফার।

উদ্বেগ, রাত্রিকালে—অ্যাকোনাইট, আর্নিকা, *আর্সেনিক, *বেলেডোনা, ক্যাল্কে-কার্ব, কার্বোভেজ, কস্টিকাম, *ক্যামোমিলা, চায়না, গ্র্যাফাইটিস, হিপার সালফার, *ইগনেসিয়া, মার্কিউরিয়াস, নেট্রাম মিউর, নাক্সভমিকা, *ফসফরাস, পালসেটিলা, *রাসটক্স, সালফার, ভেরেট্রাম অ্যালবাম।.

একাকী থাকিলে—*ড্রসেরা মেজেরিয়াম, *ফসফরাস।

ঝঞ্ঝাবাতে— নেট্রাম কার্ব, নেট্রাম মিউর, নাইট্রিক অ্যাসিড, ফসফরাস।

অমনোযোগিতা—অ্যাগনাস ক্যাস্টাস, অ্যালুমিনা, *এপিস, অরাম মেট, *ব্যারাইটা কার্ব, *ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, *কস্টিকাম, ইগনেসিয়া, কেলি কার্ব, কেলি ফস, *ল্যাকেসিস, মেজেরিয়াম, *নেট্রাম মিউর, নাক্স মশ্চেটা, *নাক্স ভমিকা, *প্ল্যাটিনাম, *পালসেটিলা, *সিপিয়া ভেরেট্রাম অ্যালবাম।

মনের বিশৃঙ্খলা—*অ্যানাকার্ডিয়াম, আর্জেন্টাম নাইট, আর্সেনিক, অরাম মেট, *বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, *ক্যাল্কেরিয়া কার্ব, *কার্বোভেজ, ফেরাম মেট, জেলসিমিয়াম, *গ্লোনইন, *ল্যাকেসিস, মার্কিউরিয়াস, মস্কাস *নেট্রাম মিউর, নাক্স মশ্চেটা, *নাক্স ভমিকা, *ওপিয়াম, পেট্রোলিয়াম, *ফসফরাস, পালসেটিলা, *রাসটক্স, *সিপিয়া, *স্ট্র্যামোনিয়াম, সালফার, ভ্যালেরিয়ানা, জিঙ্কাম মেট।

বিষণ্ণতা—অ্যাকোনাইট, অ্যানাকার্ডিয়াম, আর্সেনিক, অরাম মেট, ব্যারাইটা কার্ব, *ব্রায়োনিয়া, *ক্যাল্কেরিয়া কার্ব, কস্টিকাম, *চায়না, কলোসিস্থ, কিউপ্রাম, সিক্লামেন, ইলাপ্স, ইলাটেরিয়াম, গ্র্যাফাইটিস, লাইকো, মার্ক-আয়োড, *নেট্রাম কার্ব, *নেট্রাম মিউর, নাইট্রিক অ্যাসিড, *নাক্স ভমিকা, পেট্রোলিয়াম, ফসফরাস, প্ল্যাটিনা, প্লাম্বাম, সিপিয়া, *সালফার, ভেরেট্রাম্ অ্যালবাম।

সন্ধ্যাকালে—ক্রিয়োজোট, ম্যাগ-কার্ব, পালসেটিলা, জিঙ্কামমেট।

গর্ব—অ্যার্সেনিক, ক্যান্থারিস, *ক্যামোমিলা, চায়না, সিকিউটা, হায়োসায়ামাস, ইগনেসিয়া, ল্যাকেসিস, লাইকোপোডিয়াম, নেট্রাম মিউর, নাইট্রিক অ্যাসিড, প্ল্যাটিনা, সাইলিসিয়।

নৈরাশ্য—অ্যাকোনাইট, অ্যালো, অ্যালুমিনা, আর্নিকা, আর্সেনিক, অরাম মেট, ব্রায়োনিয়া, *ক্যাল্কেরিয়া কার্ব, কস্টিকাম, চেলিডোনিয়াম, কিউপ্রাম, হিপার সালফ, *ইগনেসিয়া, কেলিবাই, *ল্যাকেসিস, নাইট্রিক অ্যাসিড, পেট্রোলিয়াম, *পালসেটিলা, *সালফার, *ভেরেট্রাম অ্যালবাম।

মৃত্যুভয়—*অ্যাকোনাইট, অ্যাগনাস, অ্যানাকার্ডিয়াম, *আর্সেনিক, অ্যাসাফিটিডা, ব্যাপটিসিয়া, *বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া, ককিউলাস, কফিয়া, গ্র্যাফাইটিস, *হেলেবোরাস, *হিপার সালফ, *ল্যাকেসিস, মস্কাস, নেট্রাম মিউর, প্ল্যাটিনা, পালসেটিলা, স্ট্র্যামোনিয়াম, ট্যাবেকাম, ভেরেট্রাম অ্যালবাম।

দুর্ঘটনার জন্য ভয়—অ্যান্টিম-টার্ট, ক্যাল্ক-কার্ব, ফ্লুওরিক অ্যাসিড, গ্র্যাফাইটিস, ল্যাকেসিস নাক্স ভমিকা।

রাত্রিতে ভয়—অ্যামোন-কার্ব, *আর্সেনিক, বেলেডোনা, কস্টিকাম, *চায়না, কোনিয়াম, ড্রসেরা, গ্র্যাফাইটিস, হিপার, ইপিকাক, ল্যাকেসিস, লাইকো, নেট্রাম কার্ব, নেট্রাম মিউর, ফসফরাস, পালসেটিলা, রাসটক্স, *সালফার, *জিঙ্কাম মেট।

নির্বোধের ন্যায় আচরণ—বেলেডোনা, সিকিউটা, ক্রোকাস, কিউপ্রাম, হায়োসায়ামাস, ইগনেসিয়া, ল্যাকেসিস, মার্কিউরিয়াস, নাক্স মশ্চেটা, ওপিয়াম, স্ট্র্যামোনিয়াম,

ভেরেট্রাম অ্যালবাম।

নির্বোধের ন্যায় অঙ্গভঙ্গি—বেলেডোনা, সিকিউটা, *হায়োসয়ামাস, *মস্কাস, *নাক্স মশ্চেটা, *সিপিয়া, *স্ট্র্যামোনিয়াম, ভেরেট্রাম অ্যালবাম।

সহজেই ভীত হওয়া—আর্জেন্টাম নাইট, আর্সেনিক, ব্যারাইটা কার্ব, *বোরাক্স, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব, কস্টিকাম, *গ্র্যাফাইটিস, ইগনেসিয়া, *কেলি কার্ব, *লাইকো, নেট্রাম আর্স, *নেট্রাম কার্ব, *নেট্রাম মিউর, ওপিয়াম, ফসফরাস, *পালসেটিলা, স্ট্র্যামোনিয়াম, ভেরেট্রাম অ্যালবাম।

সান্ত্বনায় বৃদ্ধি—আর্সেনিক, বেলেডোনা, ক্যামোমিলা *ইগনেসিয়া, কেলিকার্ব, *নেট্রাম মিউর, প্ল্যাটিনা, *সিপিয়া, সাইলিসিয়া, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, ট্যার‍্যান্টুলা।

উপশম—*পালসেটিলা।

নিজের আত্মীয় স্বজনকে চিনিতে পারে না—অ্যাসেটিক অ্যাসিড, অ্যাগারিকাস, *অ্যানাকার্ডিয়াম, *বেলেডোনা, ক্যালেডিয়াম, *গ্লোনইন, *হায়োসায়ামাস, ল্যাকেসিস, মার্কিউরিয়াস, *ওপিয়াম, ফসফরাস, *স্ট্যামোনিয়াম, ভেরেট্রাম অ্যালবাম।

নিজের বাড়ি চিনিতে পারে না—মেলিলোটাস, মার্কিউরিয়াস, সোরিনাম।

পরিচিত রাস্তা চিনিতে পারে না—ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, *গ্লোনইন, ল্যাকেসিস, *নাক্স মশ্চেটা, *পেট্রোলিয়াম।

জীবনে বিতৃষ্ণা—অ্যান্টিম-ক্রুড, *আর্সেনিক, *অরাম মেট, কস্টিকাম, চায়না, হায়োসয়ামাস, *কেলি ফস, ল্যাকেসিস, *নেট্রাম মিউর, নাইট্রিক অ্যাসিড, *নাক্স ভমিকা, *ফসফরাস, *পালসেটিলা, রাসটক্স, সিপিয়া, স্ট্র্যামোনিয়াম, সালফার, ভেরেট্রাম অ্যালবাম।

মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা—*অ্যালো, অ্যানাকার্ডিয়াম, *অরাম মেট, *ব্যাপটিসিয়া, ক্যাল্কেরিয়া, চেলিডোনিয়াম, চায়না, চিনিনাম আর্স, *জেলস, হায়োসায়ামাস, *কেলি ফস, ল্যাকেসিস, লাইকো, *নেট্রাম মিউর, 'নাক্স ভমিকা, ফসফরিক অ্যাসিড, *ফসফরাস, *পিকরিক অ্যাসিড, পালসেটিলা, *সিপিয়া, সাইলিসিয়া, সালফার, ভ্যালেরিয়ানা।

বিবাদপ্রিয়তা (ঝগড়াটে)—*অ্যানাকার্ডিয়াম, আর্সেনিক, *অরাম, ব্রায়োনিয়া, কস্টিকাম, *ক্যামোমিলা, কিউপ্রাম, হায়োসায়ামাস, *ইগনেসিয়া, কেলি কার্ব, লাইকো, মার্কিউরিয়াস, *নেট্রাম মিউর, *নাক্স ভমিকা, *পেট্রোলিয়াম, *ফসফরাস, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, *স্ট্যামোনিয়াম, সালফার, *ট্যারেন্টিউলা, জিঙ্কাম মেট।

একগুঁয়েমী—অ্যাকোনাইট, অ্যাগারিকাস, অ্যালুমিনা, *অ্যানাকার্ডিয়াম, আর্জেন্টাম নাইট, *বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব, *ক্যামোমিলা, *সিনা, কেলি ফস, লাইকো, *নাক্স ভমিকা, স্ট্যরামোনিয়াম, *সালফার, ট্যারেন্টিউলা।

গৃহবিরহার্ততা (homesickness)—*অরাম মেট, বেলেডোনা, *ক্যাপসিকাম, *কার্বো

অ্যানি, হেলেবোরাস, ইগনেসিয়া, মার্কিউরিয়াস, নাইট্রিক অ্যাসিড, ফসফরিক অ্যাসিড, সাইলিসিয়া।

জড়তা—অ্যালো, *অ্যাম্ব্রা গ্রিজিয়া, *অ্যানাকার্ডিয়াম, আর্জেন্টাম নাইট, *ব্যারাইটা কার্ব, ব্যারাইটা মিউর, বেলেডোনা, *বিউফো, কার্বোনিয়াম সালফ, *কোনিয়াম, হায়োসায়ামাস, ল্যাক ক্যান, *লাইকো, *নাক্স মশ্চেটা, *নাক্স ভমিকা, *ওপিয়াম, ফসফরিক অ্যাসিড, সাইলিসিয়া, *স্ট্র্যামোনিয়াম, সালফার, ভেরেট্রাম অ্যালবাম, জিঙ্কাম মেট।

বাচালতা—অরাম মেট, *বেলেডোনা, *ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, ক্রোকাস, কিউপ্রাম, *হায়োসায়ামাস, কেলি ব্রোম, *ল্যাকেসিস, ল্যাকন্যান্থিস, মিউরিয়েটিক অ্যাসিড, নাক্স ভমিকা, *ফসফরাস, *পডোফাইলাম, *স্ট্র্যামোনিয়াম, *ভেরেট্রাম অ্যালবাম।

মাথা

মাথাধরা—*অ্যাকোনাইট, অ্যামোন-কার্ব, *এপিস, *আর্জেন্টাম নাইট, আর্নিকা, আর্সেনিক, অরাম মেট, ব্যাপটিসিয়া, *বেলেডোনা, *ব্রায়োনিয়া, ক্যাল্কে-কার্ব, ক্যাল্কে-ফস, কার্বোভেজ, ককিউলাস, ডিজিটেলিস, *ফেরাম ফস, জেলস, *গ্লোনইন, *হেলেবোরাস, *হায়োসায়ামাস, ইগনেসিয়া, *আইরিস ভার্সি, কেলি বাই, কেলি কার্ব, *কেলি আয়োড, *কেলি ফস, *ল্যাকেসিস, *ম্যাগ্নে ফস, *মার্কিউরিয়াস, নেট্রাম কার্ব, *নেট্রাম মিউর, *নাক্স ভমিকা, ওপিয়াম, *স্যাঙ্গুইনেরিয়া, সিপিয়া, *সাইলিসিয়া, *স্পাইজিলিয়া, *সালফার, ভেরেট্রাম অ্যালবাম, *ভেরেট্রাম ভিরিডি, জিঙ্কাম মেট।

কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত—ল্যাকেসিস, মার্কিউরিয়াস, পালসেটিলা, রাসটক্স।

চক্ষুর উপরে বেদনা—অ্যাগারিকাস, এপিস, আর্নিকা, আর্সেনিক, সিমিসিফিউগা, ব্যারাইটা কার্ব, বেলেডোনা, বার্বেরিস, কার্বোভেজ, *ক্রোকাস, কেলি বাই, *নেট্রাম মিউর, নাক্স ভমিকা, ফসফরিক অ্যাসিড, পালসেটিলা, রাসটক্স, সিপিয়া, সালফার।

মাথাধরা, বাম চক্ষুর উপরে বেদনা—অ্যাকোনাইট, আর্সেনিক, ব্রোমিন, কেলি কার্ব, ল্যাক ক্যানিনাম, নাক্স মশ্চেটা, নাক্স ভমিকা, অক্সালিক অ্যাসিড, ফসফরিক অ্যাসিড, ফসফরাস, সিপিয়া, স্পাইজিলিয়া, টেলিউরিয়াম, ভেরেট্রাম অ্যালবাম।

ডানচক্ষুর উপরে বেদনা—বেলেডোনা, স্যাঙ্গুইনেরিয়া।

ঘাড় পর্যন্ত বিস্তৃত—ব্যারাইটাকার্ব, বার্বেরিস, মস্কাস, নাইট্রাম, স্যাবাইনা।

ঘাড় হইতে আরম্ভ—বেলেডোনা, বার্বেরিস, কার্বোভেজ, ফেরাম মেট, ফ্লুওরিক অ্যাসিড, জেলসিমিয়াম গ্লোনইন, পালস, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, সাইলিসিয়া।

নাসিকা পর্যন্ত বিস্তৃত বেদনা—আর্সেনিক, বিসমাথ, বোরাক্স, ক্রোটন, ডিজিটেলিস, ফেরাম মেট, গ্লোনইন, ল্যাকেসিস, লাইকো, মেজেরিয়াম, নেট্রাম কার্ব, স্ট্যানাম।

পশ্চাৎ মস্তকে বেদনা—অ্যালুমিনা, অ্যানাকার্ডি, ব্যারাইটা কার্ব, কার্বো অ্যানি, ইলাপ্স, ফেরাম মেট, ইপিকাক, কেলি বাই, মস্কাস, সিকেল কর, সিপিয়া, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, স্পাইজিলিয়া, সাইলিসিয়া।

একপার্শ্বিক—অ্যাকোনাইট, এপিস, *অ্যাসারাম, *বেলেডোনা, *ক্যাপসিকাম, *ক্যামোমিলা, *সিকিউটা, *কফিয়া, *কলোসিন্থ, কোনিয়াম, ইগনেসিয়া, কেলিকার্ব, নেট্রাম মিউর, *নাক্স ভমিকা, পেট্রোলিয়াম, *পালসেটিলা, *স্যাঙ্গুইনেরিয়া, *সিপিয়া, সাইলিসিয়া, ভ্যালেরিয়ানা, জিঙ্কাম।

মাথাধরা, বাম পার্শ্বিক—অ্যাকোনাইট, অ্যাগারিকাস, এপিস, আর্জেন্টাম নাইট ব্রোমিন, সিনাবারিস, কেলি বাই, ল্যাকক্যান, মার্কিউরিয়াস, নেট্রাম মিউর, পালসেটিলা, সেলেনিয়াম, সিপিয়া, টেলুরিয়াম।

ডান পার্শ্বিক—অ্যাগারিকাস, এপিস, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, বিউফো, ক্যাকটাস, কোনিয়াম, জেলসিমিয়াম, হিপার, কেলিবাই, লাইকোপোডিয়াম, মার্কিউরিয়াস আয়োড, স্যাবাডিলা, স্যাবাইনা, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, সাইলিসিয়া।

এক পার্শ্বে বন্ধ হইলে অপর পার্শ্বে প্রবল হয়—নেট্রাম মিউর।

ছিন্নকর বেদনা—অ্যাগারিকাস, অ্যাম্ব্রা গ্রিজিয়া, *অ্যানাকার্ডিয়াম, *ক্যামোমিলা, ককিউলাস, কলচিকাম, *মার্কিউরিয়াস, ফসফরাস, সিপিয়া সাইলিসিয়া, থুজা।

সূচ বা হুল ফোটানবৎ বেদনা—অ্যাকোনাইট, আর্নিকা, অ্যাসাফিটিডা, বেলেডোনা, *ব্রায়োনিয়া, ক্যান্থারিস, ক্যাম্ফর, ককিউলাস, কোনিয়াম, ডিজিটেলিস, হায়োসায়ামাস, ইগনেসিয়া, নেট্রাম মিউর, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, স্পাইজিলিয়া, *সালফার, ভ্যালেরিয়ানা, জিঙ্কাম।

মোহ বা অচৈতন্যকর—অর্জেন্টাম নাইট, আর্নিকা, অ্যাসাফিটিডা, *বেলেডোনা, সিকিউটা, *হায়োসায়ামাস, লরোসেরাসাস, নেট্রাম কার্ব, ফসফরাস, রুটা, স্যাবাডিলা, স্ট্যানাম, ভ্যালেরিয়ানা।

মাথাধরা, অন্ধকারক বা চোখে অন্ধকার দেখা—অ্যাস্টেরিয়াস, বেলেডোনা, *সাইক্লামেন, *জেলস, *আইরিস, নেট্রাম মিউর, পেট্রোলিয়াম, ফসফরাস, *সাইলিসিয়া।

হাতুড়ি মারার ন্যায়—অ্যামোন-কার্ব, *বেলেডোনা, চায়না, *চিনিনাম সালফ, সিমিসিফিউগা, ককিউলাস, *ফেরাম আর্স, *ফেরাম মেট, *গ্লোনইন, আইরিস, *ল্যাকেসিস, *নেট্রাম মিউর, *সাইলিসিয়া, *সালফার ট্যারেন্টুলা।

ফাটিয়া যাইবার ন্যায়—*অ্যামোন-মিউর, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, *ক্যাপসিকাম, ক্যামোমিলা, *চায়না, ইগনেসিয়া, ল্যাকেসিস, *মার্কিউরিয়াস, *নেট্রাম মিউর, ফসফরাস, পালসেটিলা, সিপিয়া, স্পাইজিলিয়া, স্পঞ্জিয়া।

মস্তিষ্কে যেন পেরেক বিদ্ধ হইতেছে—অ্যাগারিকাস আর্স, কফিয়া, *ইগনেসিয়া, লাইকো, *নাক্স ভমিকা, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, থুজা।

মাথাধরার উপশম, ঠাণ্ডা প্রয়োগে—অ্যাকোনাইট, *অ্যালো, অ্যামোন-কার্ব, *আর্সেনিক, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব, *ইউফ্রেসিয়া, ফেরাম ফস, *গ্লোনইন, কেলি বাই, *ল্যাকেসিস, *নেট্রাম মিউর, *ফসফরাস, *পালসেটিলা, স্ট্র্যামোনিয়াম, *সালফার।

মুক্ত বায়ুতে—অ্যালুমিনা, *এপিস, *আর্সেনিক, বেলেডোনা, কার্বোভেজ, গ্লোনইন, কেলি বাই, কেলি আয়োড, কেলি ফস, *কেলি সালফ, ম্যাঙ্গেনাম, নেট্রাম মিউর, *ফসফরাস, *পালসেটিলা, স্যাঙ্গুনেরিয়া, *সিপিয়া, সালফার, *জিঙ্কাম মেট।

মাথাধরার উপশম, মস্তক বন্ধনে—এপিস, আর্জেন্টাম মেট, *আর্জেন্টাম নাই, আর্নিকা, বেলেডোনা, *ব্রায়োনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া, *হিপার সালফ, ম্যাগ-মিউর, পিকরিক অ্যাসিড, *পালসেটিলা, সাইলিসিয়া।

চক্ষু মুদিলে—অ্যাকোনাইট, অ্যাগারিকাস, *বেলেডোনা, *ব্রায়োনিয়া, চেলিডোনিয়াম, কফিয়া, কোনিয়াম, ইগনেসিয়া, নেট্রাম মিউর, নাক্স ভমিকা, রাসটক্স,সিপিয়া, সাইলিসিয়া, *স্পাইজিলিয়া, *সালফার, জিঙ্কাম।

নাসিকা হইতে রক্তপাত—অ্যান্টিম ক্রুড, বিউফো, ফেরাম ফস, হ্যামামেলিস, হায়োসায়ামাস, কেলিবাই, *মেলিলোটাস, মিলিফোলিয়াম, পেট্রোলিয়াম, *সোরিনাম।

সঞ্চালনে—অ্যাগারিকাস, আর্সেনিক, *ক্যাপসিকাম, ইগনেসিয়া, *আইরিস, লাইকো, ম্যাগ্নে-মিউর, *মিউর অ্যাসিড, নাক্স মশ্চেটা, *পালসেটিলা, *রাস টক্স, স্ট্যানাম, ভ্যালেরিয়ানা।

চাপে—অ্যামোন-কার্ব, অ্যানাকার্ডিয়াম, এপিস, আর্জেনাইট, *বেলেডোনা, *ব্রায়োনিয়া, চায়না, কলোসিন্থ, *ফেরাম মেট, *ফেরাম ফস, *গ্লোনইন, কেলি বাই, *ল্যাকেসিস, *ম্যাগ্নে-মিউর, *ম্যাগ্নে-ফস, নেট্রাম মিউর, পিকরিক অ্যাসিড, *পালসেটিলা, রাসটক্স, *স্যাঙ্গুইনেরিয়া, *সাইলিসিয়া, *স্পাইজিলিয়া, *স্ট্যানাম, সালপার।

নিদ্রায়—বেলেডোনা, চিলিডোনিয়াম, কলচিকাম, ফেরাম মেট, *জেলসিমিয়াম, *গ্লোনইন, গ্র্যাফাইটিস, হায়োসায়ামাস, *ফসফরাস, পালসেটিলা, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, সিপিয়া।

মাথাধরার উপশম, মস্তক আবৃত করিলে—আর্জেন্টাম নাইট, আর্সেনিক, অরাম মেট, *বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, জেলসিমিয়াম, *হিপার সালফ, *ম্যাগ্নেসিয়া মিউর, ম্যাগ-ফস, *নাইট্রিক অ্যাসিড, নাক্স মশ্চেটা, *নাক্স ভমিকা, সোরিনাম, *রডোডেনড্রন, *রাস টক্স, সিপিয়া, *সাইলিসিয়া, স্কুইলা।

মাথা উঁচু করিয়া শয়নে—ক্যাপসিকাম, নেট্রাম মিউর, স্পাইজিলিয়া, স্ট্রনটিয়ানা, সালফার।

শকট আরোহণে—নাইট্রিক অ্যাসিড, নাইট্রাম।

ঘন ঘন মূত্রত্যাগে—জেলসিমিয়াম।

ভ্রমণ কালে—অ্যামোন-কার্ব, সিক্লামেন, জেলসিমিয়াম, *গুয়েকাম, *লাইকোপোডিয়াম, নেট্রাম কার্ব, নেট্রাম মিউর, *ফসফরাস, পালসেটিলা, *রডোডেনড্রন, *রাসটক্স, সিপিয়া, সালফার, ট্যারাক্সাকাম, থুজা।

মাথাধরার বৃদ্ধি, আহারের পরে—*অ্যালুমিনা, আর্সেনিক, ব্রায়োনিয়া, *ক্যাল্কে-ফস, কার্বোভেজ, *ককিউলাস, *ফেরামফস, জেলস, গ্লোনইন, *গ্র্যাফাইটিস, *লাউকোপোডিয়াম, *নেট্রাম কার্ব *নেট্রাম মিউর, *নাক্স ভমিকা, ফসফরিক অ্যাসিড, *পালসেটিলা, *সালফার, জিঙ্কাম মেট।

টুপির চাপে—অ্যাগারিকাস, ক্যাল্কে-ফস, *কার্বো ভেজ, ফেরাম আয়োড, *গ্লোনইন, কেলি নাইট, ল্যাকেসিস, লরোসেরাসাস, লাইকো, *নাইট্রিক অ্যাসিড, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, ভ্যালেরিয়ানা।

উষ্ণ পানীয়ে—এরাম ট্রাই, *ফসফরাস, *পালসেটিলা, সালফার।

মাথাধরার বৃদ্ধি, গোলমালে—*বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া কার্বো ভেজ, চায়না, ফেরাম ফস, *জেলসিমিয়াম, *গ্লোনইন, কেলি কার্ব, ল্যাকেসিস, *লিডাম, নেট্রাম মিউর, *নাইট্রিক অ্যাসিড, নাক্স ভমিকা, *ফসফরিক অ্যাসিড, *ফসফরাস, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, সিপিয়া, *সাইলিসিয়া, স্পাইজিলিয়া, থুজা।

সঞ্চালনে—অ্যানাকার্ডিয়াম, অ্যান্টি-ক্রুট, এপিস, *বেলেডোনা, *ব্রায়োনিয়া, *কার্বোভেজ, চায়না, সিমিসি-ফিউগা, কফিয়া, কোনিয়াম, *ফেরাম ফস্, *জেলসিমিয়াম, গ্লোনইন, কেলিবাই, ক্রিয়োজেডাট, ল্যাকেসিস, *লিডাম, *ম্যাগ্নে-স, মেলিলোটাস, *মেজেরিয়াম, নেট্রাম মিউর, নাইট্রিক অ্যাসিড, নাক্স ভমিকা, ফসফরাস, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, সিপিয়া, স্পাইজিলিয়া, সালফ, থেরিডিয়ন।

গৃহ মধ্যে—আর্নিকা, আর্সেনিক, কোবাল্ট, ক্রোটন, জ্যাট্রোফা লরোসেরাসাস, *ম্যাঙ্গানাম, মস্কাস, নেট্রাম কার্ব, প্ল্যাটিনা, সিপিয়া, জিঙ্কাম মেট।

উষ্ণ গৃহে—অ্যালিয়াম সিপা, এপিস, আর্নিকা, ব্যারাইটা কার্ব, ক্রেকাস, নেট্রাম কার্ব, ফসফরাস, পালসেটিলা, সালফার, জিঙ্কাম মেট।

তামাক সেবনে—অ্যাকোনাইট, অ্যান্টিম টার্ট, জেলিসিময়াম, ইগনেসিয়া, ম্যাগ্নে-কার্ব।

মদ্যপানে—আর্সেনিক, বেলেডোনা, কার্বো অ্যানিম্যালিস, *কার্বো ভেজ, *জেলসিমিয়াম *গ্লোনইন, লিডাম, নেট্রাম কার্ব, *নাক্স ভমিকা, অক্সালিক অ্যাসিড, রডোডেনড্রন, *সেলেনিয়াম, সাইলিসিয়া, *জিঙ্কাম মেট।

মাথাধরার বৃদ্ধি, ভ্রমণকালে বা চলিবার সময়ে—অ্যালো, আর্নিকা, ক্যাপসিকাম, চায়না, গ্লোনইন, আয়োডিন, লাইকো, নাইট্রিক অ্যাসিড, নাক্স ভমিকা, ফসফরাস, পালসেটিলা, সিপিয়া, সালফার, স্ট্রনটিয়ানা, থিয়া, ভায়োলা ট্রাইকলর।

মস্তকের স্ফুটন অনুভব—*অ্যাকোনাইট, কফিয়া, ডিজিটেলিস, গ্র্যাফাইটিস, হেলেবোরাস, কেলি কার্ব, লাইকো, ম্যাগ-মিউর, মার্কিউরিয়াস, সাইলিসিয়া, সালফার।

মস্তক বৃহৎ অনুভব—অ্যাগারিকাস, এপিস, *আর্জেন্টাম নাইট, *আর্নিকা, আর্সেনিক, *বেলেডোনা, বার্বোরিস, *সিমিসিফিউগা, ডালকামারা, জেলসিমিয়াম, *গ্লোনইন, কেলি আয়োড, নেট্রাম মিউর, *নাক্স মশ্চেটা, *নাক্স ভমিকা, *র‍্যানানকিউলাস বালব, স্পাইজিলিয়া, সালফার, ভেরেট্রাম।

মস্তকে পূর্ণতা অনুভব, মনে হয় ফাটিয়া যাইবে—অ্যামোনকার্ব, অ্যাস্টিরিয়াস, *ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, *গ্লোনইন, ইপিকাক, লিলিয়াম টিগ, মার্কিউরিয়াস, নাইট্রিক অ্যাসিড।

মস্তকে রক্তাধিক্যে—*অ্যাকোনাইট, এপিস, *আর্জেণ্টাম নাইট, *আর্নিকা, অরাম মেট, *বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, *ক্যাকটাস, ক্যাল্কেরিয়া, ক্যানাবিস স্যাট, ক্যান্থারিস, *কার্বোভেজ, চায়না, সিমিসিফিউগা, *কিউপ্রাম, *ফেরাম মেট, *ফেরাম ফস, *জেলসিমিয়াম, *গ্লোনইন, হেলেবোরাস, *হায়োসায়ামাস, *কেলি ব্রোমেটাম, কেলি কার্ব, *ল্যাকেসিস, লাইকো, *মেলিলোটাস, নেট্রাম কার্ব, *নেট্রাম মিউর, নাক্স ভমিকা, *ওপিয়াম, *ফসফরাস, পিকরিক অ্যাসিড, রাসটক্স, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, সিপিয়া, স্ট্রামোনিয়াম, *সালফার, ভেরেট্রাম অ্যালবাম, ভেরেট্রাম ভিরিডি।

ভ্রমি বা মাথাঘোরা—অ্যাকোনাইট, *অ্যাগারিকাস, এপিস, আর্জেন্টাম মেট, আর্জেণ্টাম নাইট, অরাম মেট, *ব্রায়োনিয়া, বেলেডোনা, *ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, চেলিডোনি য়াম, *চায়না, চিনিনাম সালফ, *ককিউলাস, *কোনিয়াম, সিক্লামেন, জেলসিমিয়াম, *কেলি ফস, *লাইকোপোডিয়াম, নেট্রাম কার্ব, *নেট্রাম মিউর, ওপিয়াম, *পেট্রোলিয়াম, *ফসফরিক অ্যাসিড, *ফসফরাস, *পিকরিক অ্যাসিড, *পালসেটিলা, *রাসটক্স, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, *সাইলিসিয়া, স্ট্রামোনিয়াম, সালফার, *ট্যাবেকাম, থুজা, ভ্যালেরিয়ানা, ভেরেট্রাম অ্যালবাম, ভেরেট্রাম ভিরিডি, জিঙ্কাম মেট।

প্রাতঃকালে—অ্যামোন-কার্ব, আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম, ব্রায়োনিয়া, *কার্বো অ্যানিম্যালিস, চায়না, জেলসিমিয়াম, *কেলি কার্ব, কেলি ফস, *ল্যাকেসিস, *লাইকো, *নেট্রাম মিউর *নাক্স ভমিকা, পেট্রোলিয়াম, ফসফরিক অ্যাসিড, ফসফরাস, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, সালফার, ভেরেট্রাম জিঙ্কাম মেট।

মধ্যাহ্নে—ইথিউসা, আর্নিকা *ক্যাল্কে-ফস, *কস্টিকাম, চায়না, ডালকামেরা, ক্যালমিয়া, লাইকোপোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়া মিউর, মার্কিউরিয়াস, ট্রোম সালফ, নাক্স ভমিকা, ফসফরাস, স্ট্যামোনিয়াম, সালফার, জিঙ্কাম মেট।

অপরাহ্নে—*এসকিউলাস, অ্যাগারিকাস, অ্যালুমিনা, *অ্যামব্রা গ্রিজিয়া, ব্রায়োনিয়া, চেলিডোনিয়াম, *চায়না, ফেরাম মেট, ফেরাম ফস, *গ্লোনাইন, কেলিকার্ব, কেলি ফস, *লাইকো, মার্কিউরিয়াস, নেট্রাম মিউর, নাক্স ভমিকা, *ফসফরাস, পালসেটিলা, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, সালফার, থুজা।

সন্ধ্যাকালে—অ্যালুমিনা, অ্যামোন-কার্ব, এপিস, *আর্সেনিক, *ক্যাল্কেরিয়া, *কার্বোনিয়াম সালফ, চায়না, *সিক্লামেন, ডায়াস্কোরিয়া, আইরিস, কেলি কার্ব, *কেলি ফস, কেলি সালফ, *ল্যাকেসিস, ম্যাগ-কার্ব, নেট্রাম মিউর, *নাইট্রিক অ্যাসিড, নাক্স মশ্চেটা, নাক্স ভমিকা, *ফস অ্যাসিড, *ফসফরাস, *পালসেটিলা, সেলেনিয়াম, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, *সালফার, থুজা, জিঙ্কাম মেট।

রাত্রিতে—*অ্যামোন-কার্ব, বেলেডোনা, ক্যাল্কেরিয়া, কস্টিকাম, *চায়না, *সিক্লামেন, ডিজিটেলিস, ল্যাক ক্যানা, *ল্যাকেসিস, নেট্রাম কার্ব, *নাক্স ভমিকা, *ফসফরাস,

*ফেরাম মেট, *গ্লোনইন, গ্র্যাফাইটিস, কেলি বাই, *কেলি ফস, ল্যাকেসিস, *লোবেলিয়া, নেট্রাম মিউর, নাইট্রিক অ্যাসিড, *নাক্স ভমিকা, পেট্রোলিয়াম, ফসফরাস, *পালসেটিলা, সিপিয়া, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, ট্যাবেকাম, ভেরেট্রাম ভিরিডি, জিঙ্কাম মেট।

বমনসহ—আর্সেনিক, ক্যাল্কেরিয়া, চেলিডোনিয়াম, গ্লোনইন, *গ্র্যাফাইটিস, *কেলি বাই, কেলি কার্ব, ল্যাকেসিস, ম্যাগ-কার্ব, নেট্রাম সালফ, *নাক্স ভমিকা, পেট্রোলিয়াম, *পালসেটিলা, ভেরেট্রাম অ্যালবাম।

বস্তুসকল চক্রাকারে ঘুরিতে দেখা যায়—অ্যাগারি, *ব্রায়োনিয়া, *চেলিডোনিয়াম, ককিউলাস, কোনিয়াম, সিক্লামেন, কেলি ফস, নেট্রাম মিউর, *নাক্স ভমিকা, সোরিনাম, সাইলিসিয়া, অ্যাসিড সালফ।

দোলায়িত হওয়াসহ—অ্যাল্যান্থাস, *আর্জেন্টাম নাইট, *অরাম মেট, ব্রায়োনিয়া, কার্বোভেজ, চায়না, 'কোনিয়াম, *জেলসিমিয়াম, নাক্স মস্চেটা, *নাক্স ভমিকা, ফসফরাস, ষ্ট্র্যামোনিয়াম, থুজা।

মাথাঘোরা, মুর্চ্ছাসহ—আর্সেনিক, *ব্রায়োনিয়া, কার্বোভেজ, গ্লোনইন, *ল্যাকেসিস, মস্কাস, *নাক্সভমিকা, ফসফরাস, সালফার।

ঠাণ্ডা ঘামসহ—মার্ক-কর, *থেরিডিয়ন, *ভেরেট্রাম অ্যালবাম।

নিদ্রালুতাসহ—ইথিউসা, আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম, ক্রোটন টিগ, লরোসেরাসাস, পালসেটিলা, ষ্ট্র্যামোনিয়াম।

চক্ষুতে অন্ধকার দেখাসহ—অ্যাকোনাইট, অ্যানাকার্ডিয়াম, বেলেডোনা, ক্যাল্কেরিয়া, কার্বো অ্যানিম্যালিস, সিকিউটা, *সিক্লামেন, *ফেরাম আর্স, *ফেরাম মেট, *জেলস, *গ্লোনইন, কেলি বাই, নাইট্রিক অ্যাসিড, *নাক্স ভমিকা, *ফসফরাস, ফাইটোলক্কা, পালসেটিলা, *স্যাবাইনা, *ষ্ট্র্যামোনিয়াম, টেরিবিন্থ, জিঙ্কাম মেট।

চক্ষু

অস্পষ্ট দৃষ্টি—অরাম, ক্যাল্কেরিয়া, *কোনিয়াম, ক্রোটেলাস, *জেলস, *গ্লোনইন, কেলি ফস, ল্যাক ক্যান, লিলিয়াম, লাইকো, *নেট্রাম মিউর, ফসফরাস, *ফাইসসটিগমা, সোরিনাম, *রুটা, টিউক্রিয়াম।

দ্বিত্ব দৃষ্টি—অ্যাগারিকাস, আর্জেন্টাম নাইট, *অরাম, *বেলেডোনা, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, কস্টিকাম, চেলিডোনিয়াম, *কোনিয়াম, সিক্লামেন, ডিজিটেলিস, *জেলসিমিয়াম, *হায়োসায়ামাস, কেলি সায়ানিক, লাইকো, *নেট্রাম মিউর, নাইট্রিক অ্যাসিড, নাক্স ভমিকা, প্লাম্বাম, *ষ্ট্র্যামোনিয়াম, সালফার, থেরিডিয়ন, থুজা।

আলোকের চারিদিকে নানাবর্ণের মণ্ডল দেখা যায়—অ্যানাকার্ডিয়াম, *বেলেডোনা, কার্বো ভেজ, চায়না, সিক্লামেন, জেলসিমিয়াম, অসমিয়াম, ফসফরিক অ্যাসিড,

*সিক্লামেন, জেলসিমিয়াম, অসমিয়াম, ফসফরিক অ্যাসিড, *ফসফরাস, *পালসেটিলা, সিপিয়া, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, *সাল ফার

চক্ষুর শুষ্কতা—আর্সেনিক, অ্যাসাফিটিডা, বেলেডোনা ব্রায়োনিয়া, কেলি কার্ব, লাইকোপোডিয়াম, *ম্যঙ্গানাম, নেট্রাম মিউর, নাক্স মস্চেটা, *পালসেটিলা, *রডোডেনড্রন, রিউমেক্স, *স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, সালফার।

আলোকাতঙ্ক—*অ্যাকোনাইট, অ্যালুমিনা, অ্যামোন-কার্ব, এপিস, আর্সেনিক, *বেলেডোনা, বার্বেরিস, *ব্রায়োনিয়া, *ক্যাম্ফর, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, কস্টিকাম, চায়না, ইউফ্রেসিয়া, *গ্র্যাফাইটিস, *হিপার সালফ, *ইগনেসিয়া, কেলি কার্ব কেলি আয়োড, *মার্কিউরিয়াস, *নেয়ট্রাম কার্ব, নেট্রাম মিউর, *নেট্রাম সালফ, ফসফরিক অ্যাসিড, *ফসফরাস, পালসেটিলা, *সিপিয়া, সাইলিসিয়া, *সালফার, থেরিডিয়ন।

সন্ধ্যাকালে—বোর‍্যাক্স, ক্যাল্কেরিয়া, কোনিয়াম, ড্রসেরা, জেলসিমিয়াম, মার্কিউরিয়াস, *ফসফরাস।

প্রাতঃকালে—অ্যামোন-কার্ব, অ্যামোন-মিউর, নেট্রাম সালফ, *নাইট্রাম, নাক্স ভমিকা।

কনীনিকা সঙ্কুচিত—অ্যানাকার্ডিয়াম, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ক্যাম্ফর, টেলিডোনিয়াম, সিকিউটা, ইগনেসিয়া, ম্যাঙ্গাম, মার্ক-কর, নাক্স মস্চেটা নাক্স ভমিকা, পালসেটিলা, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, সালফার, থুজা, *ভেরেট্রাম।

প্রসারিত—অ্যাকোনাইট, ব্যারাইটা কার্ব, বেলেডোনা, ব্রোমিন, *ক্যাল্কেরিয়া, *কার্বো অ্যানি, সিনা, *ক্রোকাস, *সিক্লামেন, জেলসিমিয়াম, হেলেবোরাস, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, *হায়োসায়ামাস, *লরোসেরাসাস, লিডাম, *ওপিয়াম, পালসেটিলা, স্পাইজিলিয়া, *স্ট্যামোনিয়াম, *ভেরেট্রাম।

কর্ণ

কর্ণে শব্দ—আর্জেন্টাম নাইট, অরাম মেট, *বেলেডোনা, বোর‍্যাক্স, *ক্যাল্কেরিয়া, *ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, *চায়না, *চিনিনাম সালফ, ফেরাম ফস, *গ্র্যাফাইটিস, কেলি কার্ব, কেলি আয়োত, ল্যাকোসিস, *লাইকো, মার্কিউরিয়াস, নেট্রাম মিউর, নেট্রাম সালফ, *পেট্রোলিয়াম, ফসফরাস, *পালসেটিলা, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, সাইলিসিয়া, স্পাইজিলিয়া, *সালফার, *টিউবারকুলিনাম।

শুষ্কতা—কলচিকাম, *গ্র্যাফাইটিস, ল্যাকেসিস, নাইট্রিক অ্যাসিড, পেট্রোলিয়াম।

নাসিকা

নাসিকার আরক্ততা—*অ্যালুমিনা, আর্সেনিক, অরাম মেট, *বেলেডোনা, বোর‍্যাক্স, ক্যাল্কেরিয়া, *চায়না, কেলি বাই, *কেলি কার্ব, *ল্যাকেসিস, ম্যাগ-মিউর, মার্ক-

কর, *নেট্রাম কার্ব, *ফসফরাস, *সালফার।

রক্তাধিক্য—অ্যামোন কার্ব, *ক্যাল্কেরিয়া, *কিউপ্রাম, স্যামবিউকাস, *সালফার।

শাতলতা—অ্যালো, চায়না, সিক্লামেন, ড্রসেরা, ইগর্নেসিয়া, ম্যাঙ্গানাম, মিউরেক্স, নাক্স ভমিকা, *ভেরেট্রাম অ্যালবাম।

রক্তস্রাব—*অ্যাকোনাইট, অ্যাগারিকাস, অ্যাম্ব্রা, গ্রিজিয়া, *অ্যামোন-কার্ব, *আর্নিকা, আর্সেনিক, ব্যাপটিসিয়া, *বেলেডোনা, *বোভিস্টা, ব্রায়োনিয়া, ক্যাক্টাস, ক্যাল্কেরিয়া, কার্বোনিয়াম, সালফ, *কার্বো ভেজ, কস্টিকাম, চায়না, *ক্রোকাস, *ক্রোটেলাস, ড্রসেরা, ইলাপ্স, গ্লোনইন *হ্যামামেলিস, *ইপিকাক, কেলি আয়োড, *ল্যাকেসিস, *মেলিলোটাস, *মার্কিউরিয়াস, *মিলিফোলিয়াম, *নাইট্রিক অ্যাসিড, নাক্স ভমিকা, ফসফরাস, *পালসেটিলা, রাস টক্স, স্যাবাইনা, *সিকেল কর, *সালফার, *টিউবারকুলিনাম, ভেরেট্রাম অ্যলবাম।

প্রাতকালে—অ্যাগারিকাস, অ্যাম্বারা গ্রিজিয়া, *অ্যামোন কার্ব, বেলেডোনা, বোভিস্টা, *ব্রায়োনিয়া, ক্যালকেরিয়া, কার্বো ভেজ, ক্রোকাস, কেলি কার্ব, ল্যাকেসিস, মার্কিউরিয়াস, *নাইট্রিক অ্যাসিড, *নাক্স ভমিকা, পালসেটিলা।

সন্ধ্যাকালে—কলচিকাম, ড্রসেরা, ফেরাম, গ্র্যাফাইটিস, *ফসফরাস, সালফার।

গর্ভাবস্থায়—সিপিয়া।

পচুর পরিমাণ ঋতুস্রাব সহ—অ্যাকোনাইট।

মুখমণ্ডল ও মুখ

মুখমণ্ডল আরক্ত—অ্যাকোনাইট, আর্জেন্টাম নাইট, আর্জেন্টাম নাইট, *এমিল নাইট, *ব্যাপটিসিয়া, *বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, ক্যাপসিকাম, চায়না, সিকুটা, *ফেরাম ফস, গ্লোনইন, ল্যাকেসিস, মেলিলোটাস, মেজেরিয়াম, নাক্স ভমিকা, *ওপিয়াম, ফসফরাস, *স্যাঙ্গুইনেরিয়া *স্ট্রামোনিয়াম, সালফার।

মলিন—অ্যানাকার্ডিয়াম, *অ্যান্টিম-টার্ট, *আর্জেন্টাম মেট, আর্সেনিক, এপিস, বার্বেরিস ক্যাল্কেরিয়া, *ক্যালাঙ্কে-ফস, *ক্যাম্ফর, কার্বোনিয়াম সালফ, *কার্বো ভেজ, চায়না, *সিনা, *ডিজিটেলিস, *ফেরাম মেট, *গ্যাফাইটিস, কেলি কার্ব, লোবেলিয়া, নেট্রাম আর্স, নেট্রাম কার্ব,*নেট্রাম মিউর, *ফসফরিক অ্যাসিড, পালসেটিলা, *সিকেল, *সিপিয়া, সালফার, *ট্যাবেকাম, *ভেরেট্রাম অ্যালবামস, *জিঙ্কাম মেট।

মুখ, নীলবর্ণ—অ্যাকোনাইট, অ্যাগারিকাস, আর্জেন্টাম নাইট, *আর্সেনিক, অরাম, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, *ক্যাম্ফর, *সিনা, *কিউপ্রাম, ড্রসেরা, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, হায়োসায়ামাস, ইপিক্যাক,. ল্যাকেসিস, মার্কিউরিয়াস, নাক্স ভমিকা, ওপিয়াম, পালসেটিলা, *স্যামবিউকাস, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, স্পঞ্জিয়া, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, ভেরেট্রাম।

মুখমধ্যে জ্বালা—আর্সেনিক, এরাম ট্রাই, অ্যাসাফিটিডা, ক্যাল্কেরিয়া, *ক্যামোমিলা, কিউপ্রাম, জেলসিমিয়াম, হাইপেরিকাম, *আইরিস, জ্যাট্রোফা, মার্ক-সালফ, *নেট্রাম সালফ, নাক্স ভমিকা, সিনা, সেনেগা, *সালফার, ভেরেট্রাম অ্যালবাম।

শুষ্ক—*অ্যাকোনাইট, ইথিউসা, অ্যালো, অ্যামো-কার্ব, আর্নিকা, আর্সেনিক, *ব্যারাইটা কার্ব, *বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া, *কার্বো ভেজ, *কস্টিকাম, ক্যামোমিলা, চেলিডোনিয়াম, *চায়না, কোনিয়াম, গ্রাফাইটিস, *হায়োসায়ামাস, *ইগনেসিয়া, কেলি বাই, কেলি কার্ব, *ল্যাকেসিস, *লরোসেরাসাস, লাইকো, মার্কিউরিয়াস, *মিউরিয়েটিক অ্যাসিড, নেট্রাম সালফ, নাইট্রিক অ্যাসিড, *নাক্স মশ্চেটা, নাক্স ভমিকা, ফসফরাস, *প্লাম্বাম, পালসেটিলা, *রাসটক্স, সেনেগা, সাইলিসিয়া, *সালফার, *ভেরেট্রাম, জিঙ্কাম মেট।

মুখ, আস্বাদ তিক্ত—অ্যাকোনাইট, অ্যালো, *অ্যামোন-কার্ব, অ্যামোন-মিউর, আর্জেন্টাম নাইট, *আর্নিকা, আর্সেনিক, ব্যারাইটা কার্ব, বেলেডোনা, *ব্রায়োনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া, কার্বো অ্যানি, *কার্বো ভেজ, *ক্যামোমিলা, চেলিডোনিয়াম, *চায়না, কলচিকাম, কলোসিন্থ, ডিজিটেলিস, ড্রসেরা, *গ্র্যাটিওলা, হিপার সালফ, ইপিকাক, আইরিস, *কেলি কার্ব, ল্যাকেসিস, লাইকোপোডিয়াম, ম্যাগ-কার্ব, *মার্কিউরিয়াস, *নেট্রাম মিউর, *নাইট্রিক অ্যাসিড, *নাক্স ভমিকা, ফসফরাস, *পডোফাইলাম, *পালসেটিলা, রাসটক্স, স্যাবাডিলা, স্যাবাইনা, *সাইলিসিয়া, *সালফার, ভেরেট্রাম।

প্রাতঃকালে—অ্যামোন-কার্ব, *অ্যামোন-মিউর, আর্নিকা, *ব্যারাইটা কার্ব, *ব্রায়োনিয়া, কার্বো অ্যানিম্যালিস, কার্বো ভেজ, ক্যামোমিলা, ইপিক্যাক, লাইকোপোডিয়াম, মার্কিউরিয়াস, নাক্স ভমিকা, *পালসেটিলা, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, সালফার।

রুটির আস্বাদ—আর্সেনিক, *অ্যাসারাম, চিনিনাম সালফ, সিনা, ড্রসেরা, ফেরাম মেট, মার্কিউরিয়াস, নাক্স ভমিকা, পালসেটিলা, রাসটক্স, সালফিউরিক অ্যাসিড, থুজা।

খাদ্যের আস্বাদ—অ্যাকোনাইট, আর্সেনিক, অ্যাসারাম, *ব্রায়োনিয়া, *ক্যাম্ফর, ক্যামোমিলা, *চায়না, কলোসিন্থ, ফেরাম, ইগনেসিয়া, হিপার, নাক্স ভমিকা, পালসেটিলা, *রাস টক্স, স্যাবাইনা, স্ট্যানাম, সালফার, ভ্যালেরিয়ানা।

মুখ, বিস্বাদ বা নীরস—অ্যাকোনাইট, অ্যাগারিকাস, অ্যাম্ব। গ্রিজিয়া, আর্সেনিক, অ্যাসাফিটিডা, বেলেডোনা, *ব্রায়োনিয়া, চেলিডোনিয়াম, চায়না, ডিজিটেলিস, ইপিক্যাক, আইরিস, কেলি কার্ব, লাইকোপোডিয়াম, *নেট্রাম মিউর, *পেট্রোলিয়াম, ফসফরাস, *পালসেটিলা, *রিউম, *স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, সালফার, থুজা।

ধাতব—অ্যাগনাস, ক্যাল্কেরিয়া, চেলিডোনিয়াম, *ককিউলাস, কিউপ্রাম, হিপার সালফার, *ল্যাকেসিস, লাইকোপোডিয়াম, *মার্কিউরিয়াস, মার্ক-কর, *নেট্রাম কার্ব, *রাস টক্স, *সেনেগা, সালফার, জিঙ্কাম মেট।

প্রাতঃকালে পচা ডিমের ন্যায়—অ্যামোন-কার্ব, গ্রাফাইটিস, হিপার, ফসফরাস, থুজা।

লবণাক্ত—অ্যামোন-কার্ব, আর্সেনিক, আর্স-আয়োড, ব্যারাইটা কার্ব, *ক্যাল্কেরিয়া, *কার্বো

ভেজ, চায়না, কিউপ্রাম, আয়োড, লাইকোপোডিয়াম, *মার্কিউরিয়াস, মার্ক-কর, *নাক্স মশ্চেটা, নাক্স ভমিকা, নাইট্রিক অ্যাসিড়, *নেট্রাম মিউর, ফসফরাস, *পালসেটিলা, সালফার, থেরিডিয়ন, জিঙ্কাম মেট।

জলের মতো—ব্রোমিন।

টক—আর্সেনিক, *ব্যারাইটা কার্ব, বেলেডোনা, *ক্যাল্কেরিয়া কার্ব, *ক্যাপসিকাম, কার্বো অ্যানি, *চায়না, *ককিউলাস, কিউপ্রাম, হিপার, আয়োডিন, ইগনেসিয়া, কেলি কার্ব, *লাইকো, *ম্যাগ-কার্ব, *নেট্রাম মিউর, *নাইট্রিক অ্যাসিড, *নাক্স ভমিকা, *ফসফরাস, *পালসেটিলা, সিপিয়া, *সালফার।

মুখ, আহারের পরে—বার্বেরিস, *কার্বো ভেজ, ককিউলাস, *লাইকোপোডিয়াম, নেট্রাম মিউর, *নাক্স ভমিকা, *ফসফরাস, পালসেটিলা, সিপিয়া, *সাইলিসিয়া।

মিষ্ট—অ্যাকোনাইট, অ্যালুমিনা, *আর্সেনিক, অরাম, *বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, *চায়না, *কিউপ্রাম, *ডালকামেরা, কেলি কার্ব, কেলি আয়োড, *লাইকোপোডিয়ামম, মার্কিউরিয়াস, নাক্স ভমিকা, ফসফরাস, পডোফাইলাম, *পালসেটিলা, পাইরোজেন, স্ট্যানাম, *সালফার, থুজা।

শ্বাস প্রশ্বাস

শ্বাস প্রশ্বাস, আক্ষেপবিশিষ্ট—অ্যাসাফিটিডা, কস্টিকাম, কিউপ্রাম, *ইপিক্যাক, কেলি কার্ব, ল্যাকেসিস, লরোসেরাসাস, লিডাম, *লোবেলিয়া, *মস্কাস, *ওপিয়াম, ফসফরাস, *প্লাম্বাম, *পালসেটিলা, *সিকেলিকর, সালফার, জিঙ্কাম মেট।

অনিয়মিত—*অ্যান্টিম-টার্ট, বেলেডোনা, ক্যামোমিলা, সিনা, ককিউলাস, কিউপ্রাম, *ড্রসেরা, ইগনেসিয়া, আয়োড, *লরোসেরাসাস, *মস্কাস, নাক্স ভমিকা, ওপিয়াম, পালসেটিলা, সিপিয়া।

দ্রুত—অ্যাকোনাইট, আর্সেনিক, *অ্যাসাফিটিডা, *বেলেডোনা, কার্বো ভেজ, *কিউপ্রাম, হেলি, হিপার, ইপিক্যাক, লাইকোপোডিয়াম, নেট্রাম মিউর, ফসফরাস, রাসটক্স, *স্যামবিউকাস, সেনেগা, সিপিয়া, স্পঞ্জিয়া, স্ট্যানাম।

শ্বাস প্রশ্বাস, শ্লথ—অ্যাকোনাইট, *ইথিউসা, অ্যাগারিকাস, আর্সেনিক, *বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, ক্যাম্ফর, ক্যানাবিস, কার্বো ভেজ, হেলেবোরাস, হিপার, ইপিক্যাক, ল্যাকেসিস, লোবেলিয়া, মার্কিউরিয়াস, মস্কাস, ফসফরাস, পালসেটিলা, সিপিয়া, সালফার, থুজা।

কখনও দ্রুত, কখনও শ্লথ—অ্যাকোনাইট, বেলেডোনা, ইগনেসিয়া, নাক্স ভমিকা, ওপিয়াম, স্পঞ্জিয়া।

মৃদু—অ্যাকোনাইট, আর্নিকা, *বেলেডোনা, ব্রোমিন, ব্রায়োনিয়া, কোনিয়াম, কিউপ্রাম, হেলেবোরাস, হিপার, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, হায়োসায়ামাস, ইগনেসিয়া,

ইপিক্যাক, *লরোসেরাসাস, মার্ক-কর, ওপিয়াম, স্পঞ্জিয়া।

শ্বাসকৃচ্ছ্র—অ্যাকোনাইট, আর্নিকা, ক্যাম্ফর, কার্বো অ্যানি, চায়না, সিনা, ককিউলাস, ইপিক্যাক, লরোসেরাসাস, লোবেলিয়া, ওপিয়াম, ফসফরাস, স্পঞ্জিয়া, স্ট্রামোনিয়াম।

ঘড়ঘড় শব্দযুক্ত—*অ্যান্টিম-টার্ট, ব্রোমিন, ব্রায়োনিয়া, ক্যাকটাস, ক্যানাবিস, কার্বো অ্যানি, কার্বো ভেজ, চায়না, ককিউলাস, কিউপ্রাম, হিপার, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, হায়োসায়ামাস, ইপিক্যাক, লরোসেরাসাস, লোবেলিয়া, নাক্স মশ্চেটা, *ওপিয়াম, স্ট্যানাম, স্ট্রামোনিয়াম, সালফার।

নাক ডাকার ন্যায়—অ্যান্টিম-টার্ট, আর্নিকা, ক্যাম্ফর, *ক্যামোমিলা, চায়না, *হিপার, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, হায়োসায়ামাস, ল্যাকেসিস, লরোসেরাসাস, লাইকোপোডিয়াম, নেট্রাম মিউর, *ওপিয়াম, পেট্রোলিয়াম, স্ট্যানাম, *সালফার।

বক্ষঃস্থল ও হৃৎপিণ্ড

বক্ষঃস্থলে, উৎকণ্ঠাবোধ—*অ্যাকোনাইট, অ্যানাকার্ডিয়াম, আর্নিকা, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, কার্বো ভেজ, গ্র্যাফাইটিস, হায়োসায়ামাস, লাইকোপোডিয়াম, নেট্রাম মিউর, *নাক্স ভমিকা, পেট্রোলিয়াম, ফসফরাস, রাসটক্স, সেনেগা, সিপিয়া, স্পাইজিলিয়া, স্ট্যানাম, সালফার, টিউক্রিয়াম।

রক্তাধিক্য—অ্যাকোনাইট, অ্যালো, অ্যামোন-কার্ব, *অরাম, *বেলেডোনা, কার্বো ভেজ, *চায়না, কিউপ্রাম, ডিজিটেলিস, ফেরাম ফস, গ্লোনইন, কেলি কার্ব, মার্কিউরিয়াস, *নাইট্রিক অ্যাসিড, *ফসফরাস, *রডোডেনড্রন, রাসটক্স, *সেনেগা, সিপিয়া, *স্পঞ্জিয়া, *সালফার।

শীতলতাবোধ—অ্যামোন-কার্ব, আর্নিকা, আর্সেনিক, বার্বেরিস, ক্যাম্ফর, কার্বো অ্যানি, গ্র্যাফাইটিস, ল্যাকেসিস, পেট্রোলিয়াম, রাস টক্স, রুটা, স্পঞ্জিয়া, সালফার, থুজা, *জিঙ্কাম মেট।

কর্তনবৎ বেদনা—*অ্যাঙ্গস্টুরা, আর্জেন্টাম, অরাম, বেলেডোনা, *ব্রায়োনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া, ডালকামেরা, ইণ্ডিগো, *কেলি কার্ব, মিউরিয়েটিক অ্যাসিড, নেট্রাম কার্ব, নেট্রাম মিউর, পালসেটিলা, রুটা, স্ট্যানাম, সালফার।

শোথ—অ্যামোন-কার্ব, *এপিস, *আর্সেনিক, কার্বো ভেজ, চায়না, *কলচিকাম, *ডিজিটেলিস, ডালকামেরা, *হেলেবোরাস, *কেলি কার্ব, লাইকোপোডিয়াম, মার্কসল, *সেনেগা, *স্পাইজিলিয়া, *স্ট্যানাম।

বক্ষঃস্থলে, আক্ষেপ—আর্সেনিক, বেলেডোনা, *ককিউলাস, *কলচিকাম, *কিউপ্রাম, *ফেরাম মেট, গ্র্যাফাইটিস, *হায়োসায়ামাস, ইপিক্যাকগ, *কেলি কার্ব, ল্যাকেসিস, লরোসেরাসাস, মার্কিউরিয়াস, *মস্কাস, *নাক্স ভমিকা, *ফসফরাস, পালসেটিলা, স্যামবিউকাস, স্পাইজিলিয়া, স্পঞ্জিয়া, *স্ট্যামোনিয়াম, *সালফার, *ভেরেট্রাম,

জিঙ্কাম মেট।

হুলবিদ্ধবৎ বা সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা—*অ্যাকোনাইট, অ্যাগারিকাস, অ্যামোন-কার্ব, *অ্যাঙ্গাস্টুরা, *আর্নিকা, আর্সেনিক, ব্যারাইটা কার্ব, বেলেডোনা, বার্বেরিস, *ব্রায়োনিয়া, *ক্যান্থারিস, কার্বোভেজ, কস্টিকাম, ক্যামোমিলা, চেলিডোনিয়াম, *চায়না, কোনিয়াম, *ডালকামেরা, ফেরাম, হিপার, ইপিক্যাক, কেলি বাই, কেলি কার্ব, *লরোসেরাসাস, লাইকোপোডিয়াম, *মার্কিউরিয়াস, মার্ক-কর, নেট্রাম মিউর, *নাইট্রিক অ্যাসিড, নাক্স ভমিকা, *ফসফরাস, প্লাম্বাম, পালসেটিলা, *রানান কিউলাস বালব, *রাটানহায়া, *রাস টক্স, *রূটা, *সিনা, *সেনেগা, *সিপিয়া, *সাইলিসিয়া, *স্পাইজিলিয়া, *স্ট্যানাম, *স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, *সালফার, *সালফিউরিক অ্যাসিড, থেরিডিয়ন, *থুজা, *ভ্যালেরিয়ানা, *ভারব্যাসকাম, জিঙ্কাম মেট।

টান বা প্রসারণ বোধ—আর্সেনিক, বেলেডোনা, ব্রোমিন, ককিউলাস, *কলচিকাম, *ইউফ্রেসিয়া, ফেরাম, লোবেলিচা, লাইকোপোডিয়াম, ম্যাগ-মিউর, মার্কিউরিয়াস, নেট্রাম মিউর, নাক্স ভমিকা, *ফসফরাস, প্ল্যাটিনা, *পালসেটিলা, রাসটক্স, স্ট্যানাম।

বক্ষঃস্থলে, দুর্বলতাবোধ—বোর‍্যাক্স, ব্রোমিন, কার্বোভেজ, সিক্লামেন, ডিজিটেলিস, হিপার, কেলি কার্ব, *ফসফরিক অ্যাসিড, ফসফরাস, *স্ট্যানাম, *সালফার, সালফিউরিক অ্যাসিড।

হৃৎপিণ্ডে যান্ত্রিক রোগ—অ্যাডোনিস, *ক্যাকটাস, ক্যাল্কেরিয়া, কস্টিকাম, ক্রোটেলাস, *ক্র্যাটিগাস, *ডিজিটেলিস, ল্যাকেসিস, *নেজা, *স্টিগমেটা মেডিস, স্পারটিয়াম স্কোপারিয়াম, *স্পাইজিলিয়া, *স্ট্রোফ্যান্থাস।

হৃৎকম্পন বা বুকধড়ফড়ানি—*অ্যাকোনাইট, *অ্যামোনকার্ব, অ্যাঙ্গাস্টুরা, অ্যাম্বা গ্রিজিয়া, *এমিল নাইট্রেট, আর্সেনিক, আর্সেনিক আয়োড, অ্যাসাফিটিডা, অরাম মেট, *ব্যারাইটা কার্ব, বেলেডোনা, বার্বেরিস, বিসমাথ, ব্রায়োনিয়া, *ক্যাকটাস, ক্যাল্কেরিয়া, ক্যানাবিস, কস্টিকাম, ককিউলাস, ক্রোটেলাস, সিক্লামেন, *ডিজিটেলিস, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, *আয়োডিন, কেলিকার্ব, *ক্যালমিয়া, ল্যাকেসিস, মস্কাস, *নেজা, নাক্স মশ্চেটা, *ফসফরাস, প্ল্যাটিনা, *স্পাইজিলিয়া, *স্ট্রোফ্যান্থাস।

হৃৎপিণ্ডস্থানে অস্বস্তিবোধ—*অ্যাকোনাইট, অ্যাম্বা গ্রিজিয়া, *এমিল নাইট্রেট, আর্জেণ্টাম নাইট, *আর্সেনিক, অরাম মেট, ব্রোমিন, *ক্যাকটাস, কার্বোভেজ, চায়না, *ডিজিটেলিস ফেরাম ফস, জেলসিমিয়াম, গ্লোনইন, *হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, *ইগনেসিয়া, *ক্যালমিয়া, ল্যাকেসিস, *নেজা, নাক্স ভমিকা, *ফসফরাস, প্ল্যাটিনা, পালসেটিলা, *স্পাইজিলিয়া, ট্যাবেকাম, ট্যারাণ্টুলা, *থেরিডিয়ন, ভেরেট্রাম অ্যালবাম।

হৃৎশূল—*অ্যাকোনাইট, *আর্সেনিক আয়োড, *ক্যাকটাস, *ক্যাল্কেরিয়া আর্স, *ক্র্যাটিগাস, *ডিজিটেলিস, গ্লোনইন, জেলসিমিয়াম, হিমাটকসাইল, ল্যাকেসিস, ল্যাট্রোডেকটাস ম্যাক, ম্যাগনোলিয়া, *নেজা, *স্ট্রোফ্যান্থাস, *স্পাইজিলিয়া।

হৃৎপিণ্ডের প্রাসারণ—*অ্যামোন কার্ব, অ্যান্টিম টার্ট, *আর্সেনিক, অরাম মেট, *ক্যাকটাস, *ক্র্যাটিগাস, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, আয়োডিন, *কেলি আয়োড, *ল্যাকেসিস, লরোসেরাসাস, লাইকোপোডিয়াম, *নেজা, নেট্রাম মিউর, নাক্স ভমিকা, *ফসফরাস, সোরিনাম, পালসেটিলা, *স্পাইজিলিয়া, স্ট্রোফ্যান্থাস, ট্যাবেকাম।

হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি—* অ্যাকোনাইট, *অ্যাবিস নাই, এমিল নাইট্রেট, আর্নিকা, *আর্সেনিক, *আর্সেনিক আয়োড, অরাম মেট, ব্রোমিন, *ক্যাকটাস, *ক্র্যাটিগাস, ডিজিটেলিস, *গ্লোনইন, গ্র্যাফাইটিস, *আইবেরিস, *আয়োডিন, কেলি কার্ব, *ক্যালমিয়া, *ল্যাকেসিস, লাইকোপোডিয়াম, লাইকোপাস, *নেজা, নেট্রাম মিউর, *ফসফরাস, পালসেটিলা, *স্পাইজিলিয়া, *স্ট্রোফ্যান্থাস, *স্পঞ্জিয়া, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া।

পাকস্থলী

পাকস্থলীতে বেদনা—*অ্যাকোনাইট, অ্যালুমিনা, আর্নিকা, আর্সেনিক, অ্যাসাফিটিডা, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া, *কার্বো অ্যানি, চেলিডোনিয়াম, ককিউলাস, *ইউপ্রেসিয়া, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, কেলি বাই, কেলি কার্ব, লোবেলিয়া, *লাইকোপোডিয়াম, ম্যাগ-কার্ব, মার্কিউরিয়াস, *নাক্স ভমিকা, ফসফরাস, *প্লাম্বাম, পালসেটিলা, *র‍্যাটানহিয়া, সিপিয়া, স্পঞ্জিয়া, *সালফার, সালফিউরিক অ্যাসিড।

জ্বালা—অ্যাসেটিক অ্যাসিড, অ্যাকোনাইট, অ্যামোন কার্ব *আর্সেনিক, অ্যাসাফিটিডি বার্বেরিস, বিসমাথ, ব্রোমিন, ব্রায়োনিয়া, *ক্যালেডিয়াম, ক্যাল্কেরিয়া, *ক্যাম্ফর, *ক্যান্থারিস, *ক্যাপসিকাম, কার্বোভেজ, চেলিডোনিয়াম, সিকিউটা, কলচিকাম, ক্রোকাস, ডালকামেরা, লেসিমিয়াম, গ্র্যাফাইটিস, *জ্যাট্রোফা, কেলি বাইক্রম, কেলি কার্ব *লরোসেরাসাস, ম্যাঙ্গানাম, মার্কিউরিয়াস, *মিলিফোলিয়াম, নাইট্রিক অ্যাসিড, নাক্স ভমিকা, *ফসফরাস, রাসটক্ *স্যাবাডিলা, *সিকেলি কর, সিপিয়া, *সালফার, *টেরিবিন্থ, ভেরেট্রাম অ্যালবাম।

প্রাদাহ—*অ্যাকোনাইট, অ্যান্টিম-টার্ট, আর্সেনিক, এপিস, অ্যাসাফিটিডা ব্যারাইটা কার্ব, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, বিসমাথ, *ক্যাম্ফর, *ক্যান্থারিস, চেলিডোনিয়াম, হেলেবোরাস, আয়োডিন ইপিক্যাক, কেলি আয়োড, ল্যাকেসিস, লরোসেরাসাস, *নাক্স ভমিকা, ফসফরাস, পালসেটিলা স্যাবাডিলা, স্যাঙ্গুনেরিয়া, স্ট্রামোনিয়াম, *ভেরেট্রোম।

শূন্যতা, খালি বোধ—অ্যামোন-কার্ব, অ্যান্টিম-টার্ট, ব্রায়োনিয়া, বিউফো, ক্যালোডিয়াম, ক্রোকাস, ডিজিটেলিস, জেলসিমিয়াম, *ইগনেসিয়া, ইপিক্যাক, কেলি আয়োড, ল্যাক ক্যান, মার্ক-আয়োজ, নেট্রাম মিউর, ফসফরাস, প্লাম্বাম, সেনেগা, সিপিয়া, সালফার, টিউক্রিয়াম।

স্ফীতি—*অ্যাকোনাইট, ইথিউসা, *অ্যাগারিকাস, *অ্যালো, অ্যান্টিম-ক্রুড, আর্জেন্টাম নাইট, *আর্সেনিক, *অ্যাসাফিটিডা, অরাম, ব্যাপটিসিয়া, *কার্বোভেজ, ক্যামোমিলা, *চায়না, ককিউলাস, কলোসিন্থ, *কলচিকাম, গ্র্যাফাইটিস, *কেলি কার্ব, ল্যাকেসিস, *লাইকোপোডিয়াম, মার্কিউরিয়াস, নেট্রাম কার্ব নেট্রাম ফস, *নেট্রাম সালফ, *নাক্স মশ্চেটা, *নাক্স ভমিকা, ফসফরিক অ্যাসিড, *ফসফরাস, পডোফাইলাম, পালসেটিলা, *র‍্যাফেনাস, সিপিয়া, সাইলিসিয়া, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, স্ট্র্যামোনিয়াম, *সালফার, টেরিবিন্থ, ভ্যালেরিয়ানা, *ভেরেট্রাম অ্যালবাম।

বুকজ্বালা—অ্যালুমিনা, *অ্যাম্বা গ্রিজিয়া, *অ্যামোন-কার্ব, অ্যানাকার্ডিয়াম, *আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম, *আর্সেনিক, ব্রায়োনিয়া, *ক্যাল্কেরিয়া কার্ব, ক্যাল্কেরিয়া আর্স, *কার্বোভেজ, চেলিডোনিয়াম, *চায়না, সিকিউটা, কেনিয়াম, *ক্রোকাস, *ফেরাম ফস, গ্র্যাফাইটিস, *আইরিস, কেলিকার্ব, ল্যাকেসিস, *লাইকো, *ম্যাগনেসিয়া কার্ব, *নেট্রাম ফস,*নাক্স ভমিকা, *ফসফরাস, পালসেটিলা, রোবিনিয়া, সিপিয়া, *সালফার, *সালফিউরিক অ্যাসিড।

মুখপ্রসেক বা মুখ দিয়া জল উঠা—অ্যালুমিনা, অ্যামোন-মিউর, *আর্সেনিক, *ব্যারাইটা কার্ব, বিসমাথ, *ব্রায়োনিয়া, *ক্যাল্কেরিয়া, কার্বোভেজ, চায়না, ককিউলাস, ফেরাম, গ্র্যাফাইটিস, কেলি বাইক্রোম, *কেলি কার্ব, *লাইকোপোডিয়াম, 'মেজেরিয়াম, নেট্রাম কার্ব, *নাক্সভমিকা, *পেট্রোলিয়াম, ফসফরাস, *পালসেটিলা, *স্যাবাডিলা, *স্যাঙ্গুইনেরিয়া, *সাইলিসিয়া, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া *সালফার, সালফিউরিক অ্যাসিড।

মূত্র এবং মূত্রযন্ত্র

মূত্র, রক্তাক্ত—*আর্নিকা, *আর্সেনিক, বেলেডোনা, বার্বেরিস, *ক্যাল্কেরিয়া, *ক্যাম্ফর, *ক্যানাবিস, *ক্যান্থারিস, ক্যাপসিকাম, কার্বোভেজ, চায়না, *কোনিয়াম, হ্যামামেলিস, *হিপার, ইপিক্যাক, লাইকো, মার্ক-কর, *মেজেরিয়াম, *মিলিফোলিয়াম, নাক্স ভমিকা, *ফসফরাস, পালসেটিলা, রাসটক্স, *সিনা, টেরিবিন্থ, ইউভা উর্সি, জিঙ্কাম মেট।

লাল—*অ্যাকোনাইট, অ্যাগারিকাস, অ্যালিয়াম সিপা, অ্যালো, *বেলেডোনা, বার্বারিস, *ব্রায়োনিয়া, ক্যাল্কেরিয়া, ক্যাম্ফর, ক্যানাবিস, *ক্যান্থারিস, ক্যাপসিকাম, কার্বোভেজ, চিনোপোডিয়াম, কিউপ্রাম, *ডিজিটেলিস, ফেরাম মেট, *হিপার, আয়োডিয়াম, ইপিক্যাক, কেলি বাই, কেলি আয়োড, ল্যাকেসিস, *মার্কিউরিয়াস, *নাক্স ভমিকা, ফসফরাস, *পালসেটিলা, সিনা, সিপিয়া *সাইলিসিয়া, থুজা, ভেরেট্রাম, জিঙ্কাম মেট।

রক্তের ন্যায়—বেলেডোনা, বার্বোরিস, ক্যাল্কেরিয়া, কার্বো ভেজ, ক্রোটন, মার্কিউরিয়াস, রাসটক্স, সিপিয়া।

মূত্র, কালোরক্ত—*আর্সেনিক, কার্বলিক অ্যাসিড, *ক্রোটেলাস, ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুওর, ল্যাকেসিস, *মার্ক-কর, *ফসফরাস।

দুগ্ধবৎ—এপিস, আর্নিকা, চিনিনাম সালফ, সিনা, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব, *ডালকামেরা, মার্কিউরিয়াস, মিউররিয়েটিক অ্যাসিড, ফসফরিক অ্যাসিড।

কালো—*আর্সেনিক, ক্যান্থারিস, *কার্বলিক অ্যাসিড, *কলচিকাম, ডিজিটেলিস, হেলেবোরাস, কেলি কার্ব, *ল্যাকেসিস, *মার্ক-কর, নেট্রাম মিউর, ফসফরাস, *টেরিবিন্থ।

কটা বা পাটকিলে রংয়ের—অ্যাম্বা গ্রিজিয়া, *আর্নিকা, *আর্সেনিক, বেলেডোনা, *বেঞ্জয়িক অ্যাসিড, *ব্রায়োনিয়া, কার্বলিক অ্যাসিড, *চেলিডোনিয়াম, কলচিকাম, ডিজিটেলিস, হেলেবোরাস, ক্রিয়োজোট, ল্যাকেসিস, *মার্ক-কর, নাইট্রিক অ্যাসিড, ফসফরাস, পালসেটিলা, সালফার, ভ্যালেরিয়ানা।

সবুজ রং—আর্সেনিক, অরাম, বার্বেরিস, *ক্যাম্ফর, চেলিডোনিয়াম, *চায়না, চিমাফিলা, *কলচিকাম, ক্রোটেলাস, ডিজিটেলিস, ম্যাগনে-কার্ব, *মার্ক-কর, নাইট্রিক অ্যাসিড, ফসফরাস, রুটা, ইউরেনিয়াম, ভেরেট্রাম।

হলদে রং—অ্যালো, অ্যামোন-মিউর, আর্সেনিক, *অরাম, ব্যারাইটা মিউর, *বেলেডোনা, বার্বোরিস, ক্যানাবিস স্যাট, *চেলিডোনিয়াম চায়না, *কলচিকাম, *ড্যাফনি ইণ্ডিকা, হায়োসায়ামাস, *ল্যাকেসিস, নেট্রাম কার্ব, *সিপিয়া।

মূত্র, মলিন—অ্যামোন-কার্ব, আর্জেন্টাম মেট, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, *ক্লিমেটিস, *কোনিয়াম, ডিজিটেলিস, *জেলসিমিয়াম, ইগনেসিয়া, কেলি নাইট, ল্যাক ডিফ্লো, *লিডাম, লাইকো পোডিয়াম, মার্ক-কর, *নেট্রাম মিউর, নেট্রাম সালফ, নাক্স ভমিকা, *ফসফরিক অ্যাসিড, ফসফরাস, সার্সা প্যারিলা, সালফার।

অ্যালবুমেনযুক্ত—*এপিস, আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম, *আর্সেনিক, অরাম, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব, *ক্যাল্কেরিয়া আর্স, *ক্যানাবিস স্যাট, ক্যান্থারিস, কলচিকাম, ডিজিটেলিস, ফেরাম ফস, জেলসিমিয়াম, *গ্লোনইন, *হেলেবোরাস, আয়োড, *কেলি কার্ব, ল্যাক ডিফ্লো, *ল্যাইকোপোডিয়াম, *মার্ক-কর, নেট্রাম আর্স, *নেট্রাম কার্ব, *ফসফরিক অ্যাসিড, *ফসফরাস, রাসটক্স, সালফার, *টেরিবিন্থ, ইউরেনিয়াম জিঙ্কাম মেট।

শর্করাযুক্ত—অ্যাসেটিক অ্যাসিড, *আর্জেন্টাম মেট, আর্সেনিক, বেঞ্জয়িক অ্যাসিড, *বোভিস্টা, ক্যাল্কেরিয়া ফস, *কার্বলিক অ্যাসিড, *টেলিডোনিয়াম, চায়না, *কলচিকাম, *ফেরাম মেট, *হেলোনিয়াস, হিপার, আইরিস, *কেলি ফস, ল্যাক ডিফ্লো, *লাইকোপোডিয়াম, মার্কিউরিয়াস, নেট্রাম সালফ, *ফসফরিক অ্যাসিড, *ফসফরাস, পিকরিক অ্যাসিড, *প্লাম্বাম, সালফার, *ট্যারেন্টিউলা, *টেরিবিন্থ, *ইউরেনিয়াম, *জিঙ্কাম মেট।

জ্বালাযুক্ত—অ্যাকোনাইট, অ্যালো, এপিস, *আর্সেনিক, *আর্জেন্টাম, বেঞ্জয়িক অ্যাসিড,

বোর‍্যাক্স, ব্রায়োনিয়া, *ক্যাম্ফর, ক্যানাবিস, *ক্যান্তারিস, *ক্যাপসিকাম, কলচিকাম, ডালকামেরা, ইরিজিরন, *হিপার, ল্যাকেসিস, লাইকোপোডিয়াম, *মার্ক-কর, লিলিয়াম, পারেরা, পেট্রোলিয়াম, প্রুনাস, সিনা, সালফার।

মূত্রনাশ—*অ্যাকোনাইট, *এপিস, আর্নিকা, *আর্সেনিক, বেলেডোনা, ক্যাম্ফর, *ক্যান্তারসি, কার্বোভেজ, সিকিউটা, কিউপ্রাম, ডিজিটেলিস, হেলেবোরাস, *হায়োসায়ামাস, কেলি বাই, *ল্যাকেসিস, *লরোসেরাসাস, *লাইকোপোডিয়াম, মার্ক-কর, *ওপিয়াম, ফসফরাস, প্লাম্বাম, *সিকেলি, *স্ট্র্যামোনিয়াম, সালফার, *টেরিবিন্থ, *ভেরেট্রাম।

মূত্ররোধ বা মূত্রস্তম্ভ—*অ্যাকোনাইট, *আর্নিকা, *আর্সেনিক, অরাম, বেলেডোনা, *ক্যান্থারিস, ক্যাপসিকাম, কস্টিকাম, চায়না, সিকিউটা কলচিকাম, কোনিয়াম, কিউপ্রাম, ডিজিটেলিস, গ্র্যাফাইটিস, হিপার, হায়োসায়ামাস, লরোসেরাসাস, *লাইকোপোডিয়াম, নাক্স, *ওপিয়াম, *প্লাম্বাম, *পালসেটিলা, *রুটা, সিকেলি কর, *স্ট্র্যামোনিয়াম, সালফার।

অনৈচ্ছিক—*অ্যাকোনাইট, এপিস, আর্নিকা, আর্সেনিক, *বেলেডোনা, ক্যাম্ফর, ক্যান্থারিস, কার্বোভেজ, *কস্টিকাম, ক্যামোমিলা, সিকিউটা, সিনা, কলচিকাম, কোনিয়াম, *ডালকামেরা, গ্র্যাফাইটিস, *হায়োসায়ামাস, ইগনেসিয়া, লরোসেরাসাস, মস্কাস, মিউরিয়েটিক অ্যাসিড, নেট্রাম মিউর, ফসফরাস, ফসফরিক অ্যাসিড, পালসেটিলা, রুটা, সেনেগা, সিপিয়া, স্পাইজিলিয়া, ভেরেট্রাম *জিঙ্কাম মেট।

কাশিবার সময়ে—*অ্যান্টিম-টার্ট, *কস্টিকাম, *জেলস, নেট্রাম মিউর, ফসফরাস, *পালসেটিলা, *সিপিয়া, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, সালপার, থুজা, *ভেরেট্রাম, জিঙ্কাম মেট।

পথ চলিবার সময়ে—আর্সেনিক, ব্রায়োনিয়া, *কস্টিকাম, *ম্যাগনেসিয়া কার্ব, ম্যাগনে-মিউর, নেট্রাম মিউর, *পালসেটিলা, রুটা, সেলেনিয়াম, জিঙ্কাম মেট।

মূত্রাশয় প্রদাহ—*অ্যাকোনাইট, এপিস, *বেলেডোনা, বেঞ্জয়িক অ্যাসিড, *ক্যান্থারসি, *চিমাফিলা, কস্টিকাম, ডিজিটেলিস, কেলি আয়োড, নাইট্রিক অ্যাসিড, স্যাব্যাল সেরু, *টেরিবিন্থ।

মূত্রাশয় প্রদাহ—*অ্যাকোনাইট, এপিস *বেলেডোনা, বেঞ্জয়িক অ্যাসিড, *ক্যান্থারিস, *চিমাফিলা, কস্টিকাম, ডিজিটেলিস, কেলি আয়োড, নাইট্রিক অ্যাসিড, স্যাব্যাল সেরু, *টেরিবিন্থ।

মূত্রমার্গ প্রদাহ—*অ্যাকোনাইট, *আর্সেনিক, *বেলেডোনা, ক্যান্থারিস, জেলসিমিয়াম, রাসটক্স।

মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ—*অ্যাকোনাইট, এপিস, আর্জেন্টাম নাই, আর্সেনিক, *ক্যান্তারিস, *ডিজিটেলিস, ডালকামেরা, হেলোনিয়াস, লাইকোপোডিয়াম, *মার্ক-কর, ফসফরাস, *রাসটক্স, সিপিয়া, সালফার।

জননেন্দ্রিয়

পুরুষ, ধ্বজভঙ্গ—*অ্যাগনাস, *ক্যালোডিয়াম, *ক্যাল্কেরিয়া, ক্যাম্ফার, *ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, ক্যাপসিকাম, কস্টিকাম, চায়না, কফিয়া, কলোসিস্থ, *কোনিয়াম, আয়োড, কোবালট, ক্রিয়োজোট, ল্যাকেসিস, *লাইকোপোডিয়াম, *মস্কাস, মিউরিয়েটিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, নাক্স মশ্চেটা, *নাক্স ভমিকা, ফসফরাস, *ফসফরিক অ্যাসিড, *সেলেনিয়াম, সালফার, টাসিলেগো।

সঙ্গমে অনিচ্ছা—অ্যাগারিকাস, *অ্যাগনাস, ক্যানবিস স্যাট, *গ্র্যাফাইটিস, কেলি কার্ব, *লাইকোপোডিয়াম, নেট্রাম মিউর, পেট্রোলিয়াম, *ফসফরাস, সোরিনাম, সালফার।

সঙ্গমেচ্ছা হ্রাস—*অ্যাগনাস, অরাম, *ব্যারাইটা কার্ব, ক্যাল্কেরিয়া ফস, ক্লিমেটিস, *ডায়োস্কোরিয়া, *গ্র্যাফাইটিস, *ইগনেসিয়া, কেলি কার্ব, কেলি আয়োড়, *কেলি ফস, *লাইকোপোড়িয়াম, মিউরিয়েটিক অ্যাসিড, নেট্রাম মিউর, ওপিয়াম, *ফসফরিক অ্যাসিড, সোরিনাম, *সিপিয়া, *সাইলিসিয়া, *স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, সালফার।

সঙ্গমেচ্ছা বর্ধিত—অ্যাগারিকাস, অ্যানাকার্ডিয়াম, *অ্যানাস্থি, অ্যান্টিম-ক্রুড, *অরাম মেট, *ব্যারাইটা মিউর, *বুফো, *ক্যাল্কেরিয়া, *ক্যাম্ফর, *ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, *ক্যানাবিস স্যাটাইভা, *ক্যান্থারিস, চায়না, ককিউলাস, কফিয়া, *কোনিয়াম, ডায়োস্কোরিয়া, জেলসিমিয়াম, গ্র্যাফাইটিস, *ইগনেসিয়া, কেলি বাই, *লাইকোপডিয়াম, *নেট্রাম মিউর, *নাক্স ভমিকা, ওপিয়াম, ফসফরিক অ্যাসিড, *ফসফরাস, *পিকরিক অ্যাসিড, *প্ল্যাটিনাম, সোরিনাম, *পালসেটিলা, সাইলিসিয়া, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, স্ট্র্যামোনিয়াম, সালফার, ট্যারাণ্টুলা, টিউবার কিউলিনাম, ভেরেট্রাম, *জিঙ্কাম মেট।

পুরুষ, সঙ্গমকালে নিদ্রা এবং নিদ্রালুতা—ব্যারাইটা কার্ব *লাইকোপোডিয়াম।

বীর্যপাতের সময়ে জ্বালা—ক্রিয়োজোট।

হুলবিদ্ধ বেদনা—ক্যাল্কেরিয়া।

উপভোগের অভাব—অ্যানাকার্ডিয়াম, ক্যালেডিয়াম, নেট্রাম মিউর, প্ল্যাটিনা।

সঙ্গমের পরে পৃষ্ঠে জ্বালা—ম্যাগনে-মিউর।

পদদ্বয়ের শীতলতা—গ্র্যাফাইটিস।

হাঁটুর দুর্বলতা—সিপিয়া।

রাত্রিকালীন ঘর্ম—অ্যাগারিকাস।

দুর্বলতা—অ্যাগারিকাস, বার্বেরিস, ক্যাল্কেরিয়া, কোনিয়াম, গ্র্যাফাইটিস, কেলি কার্ব, *লাইকোপেডিয়াম, নাইট্রিক অ্যাসিড, পেট্রোলিয়াম, সেলেনিয়াম, সিপিয়া, সাইলিসিয়া।

স্ত্রী, জননেন্দ্রিয়ে রক্তাধিক্য—অ্যালেট্রিস, অ্যাম্বা গ্রিজিয়া, *বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, *চায়না, *ক্রোকাস, *হিপার, ল্যাক ক্যান, *মার্কিউরিয়াস, *নাক্স ভমিকা, প্ল্যাটিনা, সালপার।

সঙ্গমে অনিচ্ছা—অ্যাগনাস, বোভিস্টা, ক্যানাবিস স্যাটাইভা, *কস্টিকাম, ক্লিমেটিস,

*গ্র্যাফাইটিস, ইগনেসিয়া, *কেলি ব্রোম, কেলি ফস, ল্যাকেসিস, মেডোরিনাম, *নেট্রাম মিউর, *ফসফরাস, সোরিনাম, *সিপিয়া, স্ট্যানাম, সালপার।

সঙ্গমেচ্ছা বর্ধিত—অ্যান্টিম-ক্রুড, *এপিস, আর্সেনিক, অরাম, ব্যারাইটা মিউর, বেলেডোনা, ক্যালোডিয়াম, *ক্যাল্কেরিয়া, *ক্যাল্কে-ফস, *ক্যাম্ফর, *ক্যান্থারিস, কার্বোভেজ, কফিয়া, *কোনিয়াম, *ফ্লুওরিক অ্যাসিড, জেলসিয়াম, গ্র্যাটিওলা, *হায়োসায়ামাস, ইগনেসিয়া, কেলি বেরাম, *কেলি ফস, ক্রিয়োজোট, *ল্যাকেসিস, *লিলিয়াম টিগ, লাইকোপোডিয়াম, মস্কাস, *মিউরেক্স, নাক্সভমিকা, *ওরিগেনাম, *ফসফরাস, *পিকরিক অ্যাসিড, প্ল্যাটিনা, *পালসেটিলা, সাইলিসিয়া, স্ট্যানাম, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, ট্যার‍্যান্টুলা, ভেরেট্রাম।

সঙ্গমকালে উপভোগের অভাব—*বার্বেরিস, *ব্রোমিন, ক্যাল্কেরিয়া, ক্যানাবিস স্যাটাইভা, *কস্টিকাম, *ফেরাম, গ্র্যাফাইটিস, কেলি ব্রোম, মেডোরিনাম, নেট্রাম মিউর, ফসফরাস, পালসেটিলা, সিপিয়া।

যোনিতে বেদনা—বার্বেরিস, ফেরাম মেট, কেলি কার্ব, ক্রিয়োজোট, লাইকোপোডিয়াম।

কামোন্মাদতা—*বেলেডোনা, ক্যাল্কেরিয়া, ক্যান্থারিস, কার্বোভেজ, চায়না, কফিয়া, গ্র্যাফাইটিস, *গ্র্যাটিওলা, ল্যাকেসিস, মার্কিউরিয়াস, মস্কাস, *মিউরেক্স, নেট্রাম মিউর, *নাক্স ভমিকা, ওপিয়াম, *ফসফরাস, *প্ল্যাটিনাম, *পালসেটিলা, স্যাবাডিলা, সাইলিসিয়া, স্ট্র্যামোনিয়াম, ভেরেট্রাম, জিঙ্কাম মেট।